আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনমূলক বয়ান সংকলন

ইসলাহী মাজালিস

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড

শাইখুল ইসলাম

মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

সূচিপত্র

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনমূলক বয়ান সংকলন

ইসলাহী মাজালিস

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদীআরব

শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ [পঞ্চম খণ্ড]

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

খতীব : আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা

মুহাদ্দিস : টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসা, গাজীপুর

অনুবাদ [ষষ্ঠ খণ্ড]

মাওলানা ফযলুদ্দীন শিবলী

শিক্ষক, তাহফীজুল কুরআন অনুষদ

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

ইসলাহী মাজালিস

মূল ঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদকমণ্ডলী
মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
মাওলানা ফযলুদ্দীন শিবলী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মুমতায লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, ৬ষ্ঠ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
শাবান ১৪৩০ হিজরী
আগস্ট ২০০৯ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0014-8

মূল্য ঃ তিনশত ত্রিশ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ই ন তে সা ব

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর
বিশিষ্ট খলীফা, আরেফ বিল্লাহ্, হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী রহ.।

যার দূরদর্শি তারবিয়াত ও মহব্বতপূর্ণ নেগরানীতে শাইখুল ইসলাম
মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতহুম-এর
মতো ইলম ও আমলের জীবন্ত নমুনা তৈরী হয়েছে।
যারা তাদের জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে উম্মতের
রাহনুমায়ীর কাজ করে যাচ্ছেন।

ইয়া আল্লাহ! এ সকল মহান ব্যক্তিত্বের ছায়াকে আমাদের
উপর দীর্ঘায়িত করুন। যে সকল মুরুব্বীর নেগরানী ও রাহনুমায়ীর
বরকতে উম্মাহ এমন রাহবার পেয়েছে তাঁদের কবরকে
জান্নাতো টুকরো বানিয়ে দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
– প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন, সংস্কার ও তা বাস্তবায়নের সফল রূপকার; শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতহুম এর "স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা" শীর্ষোক একটি অন্য ধরনের বয়ান গত ২৭ শে মে ২০০৯ ঈসায়ী তারিখে পাকিস্তানের বিখ্যাত দ্বীনী ওয়েব সাইট "দরসে কুরআন- ডটকম" থেকে সংগ্রহ করি। এ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার কথা হযরতের ভক্তদের মধ্যে বেশ কিছুদিন যাবত আলোচিত হচ্ছিল, যার ফলে পূর্ব হতেই আমি এর প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি এ বয়ান বার বার মনযোগ দিয়ে শোনে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি। এতে আমার মনে হয়েছে যদিও এ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা পাকিস্তানের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এর চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। সমগ্র পৃথিবীর ভূখণ্ডই আজ প্রকৃত ঈমানদারের জন্য সংকীর্ণ। নিজদেশে তারা পরবাসী। যে অস্ত্র ও শক্তি কাফের মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিলো তা আজ স্বয়ং মুসলমানই নিজের মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। এ ভয়াবহ অবস্থায় একজন দায়িত্বশীল ঈমানদারের করনীয় কি? সে কথাটি এ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যায় বিবৃত হয়েছে।

হযরত স্বপ্নের কথা তার বয়ানে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

> একজন পূণ্যময়ী নারী স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করলেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারায় দুশ্চিন্তা ও বেদনার চিহ্ন দেখলেন। তিনি (জিজ্ঞেস করে অথবা অন্য কোন উপায়ে) জানতে পারলেন এ বেদনা ও দুশ্চিন্তা পাকিস্তানের উপর আযাব আপতিত হওয়ার আশংকায়। স্বপ্নে তাকে এ আসন্ন আযাব থেকে মুক্তির উপায় বলা হলো "সূরায়ে শামস" অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করা। একাত্তর হাজার বার এ সূরা তেলাওয়াতের কথা বলেছেন।
>
> বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হয় যে, সবাই মিলে হলেও একাত্তর হাজার-এর সংখ্যা পূর্ণ করবে।
>
> স্বপ্ন শরীয়তের কোন দলীল নয়। অবশ্য নবীদের স্বপ্ন 'অহী' হওয়ার কারণে শরীঅতের দলীল। সাধারণ মানুষের স্বপ্ন শরয়ী দলীল নয়। অর্থাৎ, স্বপ্নের দ্বারা কোন অবৈধ বিষয়ের বৈধতা

প্রমাণিত হয় না এবং কোন বৈধ জিনিষ অবৈধও হয় না। স্বপ্ন দ্বারা নতুন কোন জিনিষ শরীঅতের বিধান বলে সাবেত হয় না। অবশ্য স্বপ্ন যদি শরী'অত সম্মত হয় তাহলে তার উপরে আমল করা যায়।

এ স্বপ্নের কথা জানার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগালো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এ সূরা তেলাওয়াতের নির্দেশ কেন দিলেন? চিন্তা-ভাবনা করার পর আমার মনে হলো, সম্ভবত বর্তমান ভয়াবহ এই পরিস্থিতি সম্পর্কে এ সূরায় মুমিনদের জন্য বিশেষ কোন পয়গাম আছে।

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন...

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ০ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ০ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا .... الخ

(তরজমা) কসম সূর্য ও তার আলোকের, ০ কসম চাঁদের যখন (তা) সূর্যের পিছে পিছে আসে, ০ কসম দিনের যখন (সূর্য) তাকে ভালভাবে আলোকিত করে, ০ কসম রাতের যখন সে তাকে (পৃথিবীকে) সমাচ্ছন্ন করে, এবং ০ কসম আকাশের এবং যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ০ কসম পৃথিবীর এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন, ০ কসম মানুষের আত্মার এবং যিনি তা যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, ০ অতপর তার অন্তরে অপকর্ম ও পরহেযগারীর বিষয়টি নিক্ষেপ করেছেন, ০ নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে যে তাকে (স্বীয় আত্মাকে) পরিশুদ্ধ করেছে, ০ আর ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ (বিফল হলো) যে তাকে পাপে কলুষিত করেছে। (সূরা শামস ১-১০ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহপাক এগারটি বিষয়ের কসম খেয়ে একটি মহান বাক্য ইরশাদ করেছেন মূলত সেটাই হলো, সমগ্র উম্মাহ্‌র জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মহান পয়গাম। আর তাহলো–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ০ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

[নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে যে স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ যে তাকে পাপে কলুষিত করেছে।]

আল্লাহ পাক কোন জায়গায় একটি, কোন জায়গায় দুইটি, কোন জায়গায় তিনটি কসম খেয়েছেন। কিন্তু এখানে পর পর এগারটি জিনিষের কসম কেন খেয়েছেন? চিন্তা-ভাবনার পর দু'টি বিষয় এ থেকে বুঝে আসে (১) প্রথম বিষয়টি হলো, আল্লাহপাক এ

জগতের নিয়ম এমন বানিয়েছেন যে, এখানে ভালও আছে মন্দও আছে, সুখও আছে আবার দুঃখও আছে, আলোও আছে, আবার আঁধারও আছে।

অন্ধকার ও দুরঅবস্থা দেখে ভয় পেওনা, হতাশ হয়ো না। কাফেরদের আস্ফালন দেখে অনেকে ভয় পায়, হতাশ হয়। অনেক সময় এ হতাশা তাকে তাকদীরের প্রতি আপত্তি উস্থাপনকারী বানিয়ে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্ এ সকল জিনিষের আলোচনা পাশাপাশি করে বলে দিয়েছেন বিপদ দেখে, অন্ধকার দেখে ভয় পেও না। কারণ এর পরই আছে আলোর ঝলকানী, সুখের ও শান্তির সম্ভার। বরং বিপদের আগেও সুখ এর পরেও সুখ। কাজেই অবস্থা এক রকম থাকবে না পরিবর্তন আসবেই।

জগত তিনটি (১) কেবলই সুখের জগত। এখানে শুধু সুখই সুখ, শান্তিই শান্তি। অসুখ, অশান্তি ও দুশ্চিন্তার কিছুই নেই এখানে। এটার নাম জান্নাত-বেহেশত।

(২) দুঃখ ও কষ্টের জগত। এখানে শুধু কষ্টই কষ্ট, অশান্তিই অশান্তি। সুখ-শান্তির ছায়াও নেই এখানে। এটা জাহান্নাম-দোযখ।

(৩) সুখ ও দুঃখের সম্মিলিত জগত। কখনো সুখ, কখনো দুঃখ। কখনো শান্তি, কখনো অশান্তি। কিছু সময় এখানে আরামে কাটলে কিছু সময় কাটে দুঃখে। এটাই দুনিয়া। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। এখানে ধনী থেকে বড় ধনী, ক্ষমতাশালীর চেয়ে বড় ক্ষমতাশালীও সব সময় নিরংকুশ সুখ ও শান্তিতে থাকতে পারে না। তাকেও প্রতি নিয়ত কষ্ট সহ্য করতে হয়।

(২) দ্বিতীয় বিষয়টি উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে যেটা বুঝে আসে তাহলো, মানুষের মধ্যে সৎগুণাবলীর প্রতি আকর্ষণ যেমন আছে, ঠিক তেমনি মন্দ প্রবনতাগুলোও তাকে মারাত্মকভাবে আকর্ষণ করে। সে যদি গোনাহের আকর্ষণকে প্রতিরোধ করে তাকওয়ার পথে চলে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে – আলোকিত করে। গোনাহের অন্ধকারে আত্মাকে কলুষিত না করে। তাহলে সে মর্যাদায় ফেরেশতার চেয়েও উর্ধে চলে যাবে। তার জীবন হবে সফলতায় পরিপূর্ণ।

[এ ছিলো হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা শীর্ষোক বয়ানের সারাংশ।]

উপরোক্ত আলোচনার সারাংশ হলো, মানব জীবনের সফলতার ভিত্তিই হলো আত্মশুদ্ধির উপর। আর মানব জীবন ব্যর্থ হয় নিজ আত্মাকে গোনাহের দ্বারা কলুষিত করার কারণে। কাজেই যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে সফল করে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি লাভ করতে চায় তার জন্য আবশ্যক হলো কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে তাকওয়া অবলম্বন করা, তথা আত্মার গুণাবলী অর্জন করা এবং আত্মার দোষসমূহ হতে আত্মাকে পবিত্র করা।

আমাদের বর্তমান আয়োজন "ইসলাহী মাজালিস" মূলত আত্মার গুণাবলী অর্জনের পন্থা বাতলে দেওয়ার জন্য এবং আত্মাকে দোষমুক্ত করার উপায় বলে দেওয়ার জন্যই সংকলিত করা হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড আমাদের পাঠকসমাজ যেভাবে হাতে হাতে নিয়েছেন এবং আমাদেরকে দু'আ দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন, পরবর্তি খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারে তাগাদা দিয়েছেন তাতে আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। আল্লাহপাক সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

বর্তমান পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের মধ্য হতে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ করেছেন হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন ছাহেব। আর ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন জনাব মাওলানা ফযলুদ্দীন শিবলী ছাহেব। যেহেতু অতি অল্প সময়ে তাকে এর অনুবাদ কর্ম সমাপন করতে হয়েছে তাই কিছুটা অসংগতি এতে ছিলো, কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধে মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ছাহেব অনেক কষ্ট করে তা মূলের সাথে মিলিয়ে সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ খণ্ডটিকেও সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোন অসংগতি বা ভুল-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে ইন্‌শাআল্লাহ সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে।

আমরা আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহ আমাদের সামর্থের সবটুকু ব্যয় করে হলেও উন্নত কাগজে সর্বাধুনিক পন্থায় দৃষ্টি নন্দন ও আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এতে পাঠক সমাজের কাঁধে অতিরিক্ত মূল্যের সামান্য বোঝা চাপালেও সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

তারিখ ঃ ১০ শাবান ১৪৩০ হিজরী
২রা আগস্ট, ২০০৯ ঈসায়ী

সংক্ষিপ্ত সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম খণ্ড

সংক্ষিপ্ত সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ খণ্ড

৫ম খন্ড

৬ষ্ঠ খন্ড

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

পঞ্চম খণ্ড

ছেষট্টিতম মজলিস

অধিক কথা বলার প্রতিকার

সাতষট্টিতম মজলিস

অধিক কথা বলার প্রবণতা ও তার প্রতিকার

আটষট্টিতম মজলিস

কৃপণতা ও তার প্রতিকার

উনসত্তরতম মজলিস

সব কৃপণতাই নিন্দনীয় নয়

সত্তরতম মজলিস

সুদ নেওয়ার দ্বারা কার্পণ্য বৃদ্ধি পায়

একাত্তরতম মজলিস

অপচয় ও তার প্রতিকার

বাহাত্তরতম মজলিস
অপচয় থেকে বাঁচার উপায়

তেহাত্তরতম মজলিস

ঘর থেকে অতিরিক্ত আসবাবপত্র বের করে ফেলো

চুয়াত্তরতম মজলিস
ব্যয় সংকুচিত করুন

পঁচাত্তরতম মজলিস
অহংকার ও লজ্জার পার্থক্য

ছিয়াত্তরতম মজলিস

গোনাহের প্রতিষেধক : তাওবা

সাতাত্তরতম মজলিস
ইস্তিগফারের জন্যে সময় নির্ধারণ করুন

আটাত্তরম মজলিস

অতীত গোনাহসমূহ মনে রাখার অর্থ

ঊনাশিতম মজলিস

গোনাহের প্রতিষেধক তাওবা

আশিতম মজলিস

তাওবার পরিপূর্ণতার জন্যে গোনাহ ছাড়ার সংকল্প করা

সূচিপত্র ❖ ষষ্ঠ খণ্ড

একাশিতম মজলিস

অতীতের গোনাহ স্মরণ হলে পুনরায় ইস্তিগফার করা

বিরাশিতম মজলিস

'বান্দার হক' থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

তিরাশিতম মজলিস

আল্লাহ তাআলার মহব্বত এবং তার উপকরণসমূহ

চুরাশিতম মজলিস

অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা মহব্বত পয়দা করার মাধ্যম

সূচিপত্র

পঁচাশিতম মজলিস

দু'আয়ে মাছুরা (কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ) অধিক যিকিরের উত্তম পন্থা

ছিয়াশিতম মজলিস

আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মুরাকাবা কর

সাতাশিতম মজলিস

আল্লাহর মহব্বত পয়দা করার উপকরণ ও পদ্ধতি

আটাশিতম মজলিস

আল্লাহর কাছে মহব্বত কামনা করুন

উনচল্লিশতম মজলিস

ইবাদতে আবেগ-উদ্দীপনা উদ্দেশ্য নয়

নব্বইতম মজলিস
মহব্বত প্রকৃতিগত না-কি জ্ঞানগত

একানব্বইতম মজলিস
গুনাহের প্রতিষেধক : তাওবা

বিরানব্বইতম মজলিস
ভয় ও আশা : মূখ্য উভয়টিই

তিরানব্বইতম মজলিস

মানুষের ভয় আল্লাহর ভয়ের চেয়ে অধিক হওয়া

চুরানব্বইতম মজলিস
আমলের পার্থিব ফলাফল

ইসলাহী মাজালিস

পঞ্চম খণ্ড

ছেষট্টিতম মজলিস

অহংকারের বিভিন্ন রূপ

অহংকারের বিভিন্ন রূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

পাপীদেরকে তুচ্ছ মনে করো না

একটি মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'নিজের পরহেযগারী ও নৈতিক পবিত্রতার উপর অহংকার করে পাপীদেরকে তুচ্ছ মনে করো না। তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দাও। অহংকার করার ফলে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা রয়েছে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৬০)

এ বিষয়টি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, একজন মানুষ যখন দ্বীনের পথে অগ্রসর হয়, তখন শয়তান– যে কিনা শপথ করেছে যে, আমি মানুষকে সঠিকপথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে তার সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান থেকে এবং বাম থেকে আক্রমণ করবো– দ্বীনের পথে অগ্রসর ব্যক্তিকে অহংকারের মাধ্যমে পথহারা করে। তার অন্তরে অহংকার ও আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি করে। তাকে বুঝায় যে, তুমিতো অনেক ভালো কাজ শুরু করেছো। এভাবে অহংকার সৃষ্টির মাধ্যমে তার অন্তরে অন্যদের প্রতি তাচ্ছিল্য সৃষ্টি করে। ফলে তার অন্তরে এ চিন্তা জাগে যে, আমিতো দ্বীনের পথে চলছি, আর এরা সবাই পাপী, গোনাহগার ও জাহান্নামী। এই চিন্তার ফলে তার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায়।

নব আগন্তুকদের মধ্যে এ রোগ অধিক পরিমাণে সৃষ্টি হয়ে থাকে

অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করার এ ব্যাধি নব-আগন্তুকদের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। 'নব আগন্তুক' ঐ ব্যক্তি, যার পূর্বে দ্বীন-ধর্মের প্রতি কোন মনোযোগ ছিলো না, আল্লাহ তাআলা আকস্মিকভাবে দ্বীনের উপর চলার

তাওফীক দিয়েছেন। তখন সে নিজেকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে আরম্ভ করে এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করতে থাকে। পাপীদেরকে হেয় নজরে দেখে। ফলে তার অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়।

পাপকে ঘৃণা করো

সঠিক কথা হলো, পাপকে ঘৃণা করো, কিন্তু পাপী ব্যক্তিকে ঘৃণা করো না। 'কুফুর'কে ঘৃণা করো, কিন্তু কাফের ব্যক্তিকে ঘৃণা করো না। মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা থাকবে, 'কুফুরে'র প্রতি ঘৃণা থাকবে এবং পাপ কাজের প্রতি ঘৃণা থাকবে। যখন পাপী ব্যক্তির সাথে ঘৃণা থাকবে না, তখন কাউকে কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্রতি দয়া হবে যে, বেচারা গোনাহের রোগে আক্রান্ত।

পাপী ব্যক্তি করুণার পাত্র

জনাব মুহাম্মাদ শরাফত সাহেব আমার শ্বশুর। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আল্লাহওয়ালাদের সোহবত নসীব করেছেন। তাঁর এ অভ্যাসটি আমার খুব পসন্দ যে, তিনি যখন অন্য কারো মন্দ অভ্যাসের আলোচনা করেন, তখন এভাবে বলেন যে, 'অমুক বেচারা নামায পড়ে না।' তিনি 'বেচারা' শব্দ অবশ্যই যোগ করেন। যেমন আমরা সাধারণত বলে থাকি যে, অমুক বেচারা অসুস্থ। তিনি এভাবেই তাদের আলোচনা করেন এবং সব সময়ই করুণাসিক্ত এবং দয়ামাখা আঙ্গিকে কথা বলেন। কারণ, গোনাহও একটি রোগ। আর যে রোগী, সে ঘৃণার পাত্র কী করে হতে পারে! তার প্রতি কেন রাগ করা হবে! তার প্রতি বরং করুণা দেখাও, তার জন্যে দু'আ করো যেন আল্লাহ তাআলা তাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দান করেন।

অহংকারের কারণে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে

তাই হযরত থানভী (রহ.) বলছেন যে, অন্যদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা এবং অন্যদের প্রতি তাচ্ছিল্যের চোখে তাকানো কোনভাবেই জায়েয নয়। মানুষ যখন অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্যের চোখে তাকায়, তখন তার নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে। তোমাকে যে, আল্লাহ তাআলা দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দিয়েছেন, এটা তার নিয়ামত কি নিয়ামত নয়?

لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا - وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

'যদি আল্লাহ তাআলা তাওফীক না দিতেন, তাহলে না আমরা হিদায়েত পেতাম, না সদকা দিতাম, না নামায পড়তাম।'

যে সমস্ত নেক আমল হচ্ছে, তাঁরই তাওফীকে হচ্ছে। এজন্য শোকর আদায় করো। কিসের গর্ব, কিসের অহংকার, কিসের আত্মশ্লাঘা, আর কিসের অন্যকে হেয়প্রতিপন্ন করা! অন্যদেরকে যদি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো, তাহলে তোমাকে যে নেক আমলের তাওফীক দেওয়া হয়েছে তা ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা রয়েছে। মানুষ এ ধরনের অহংকার ও আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ না করলে অনেক সময় নেক আমলের তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন।

বড়দের সাথে রং লাগিয়ে কথা বলা বেয়াদবী

একটি মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'যাকে নিজের চেয়ে বড় মনে করো, তার সঙ্গে রং লাগিয়ে কথা বলা আদবের খেলাফ।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৬০)

যেমন, আপনি বড় কারো নিকট চিঠি লিখলে অনাড়ম্বরভাবে লিখবেন। কিন্তু আপনি তা না করে চিন্তা করে করে চিঠির বিষয়বস্তু তৈরি করছেন। কথা সাজাচ্ছেন। তাতে নিজের ভাষালঙ্কারের পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। আপনি চেষ্টা করছেন যেন আপনার চিঠির ভাষা চমৎকার হয়, সাহিত্যপূর্ণ হয় এবং তাতে উপমা-উৎপ্রেক্ষার বৈচিত্র থাকে। বড়দের নিকট চিঠি লেখার সময় এভাবে কথায় রং লাগানো আদবের পরিপন্থী।

কথায় রং লাগানো অহংকারের ফল

মূলত অহংকারের ফলে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। কারণ, সে চায় যে, আমার চিঠি যখন আমার বড়র নিকট যাবে, তখন যেন চিঠিটি পরিপাটি হয় এবং সাজানো-গোছানো হয়। যেন আমার ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া ভালো হয় যে, লোকটি তো বড় শিক্ষিত! বড় সাহিত্যিক। তার কথা অলংকারপূর্ণ। অথচ যার কাছে চিঠি লিখছো, সে হলো বড়। তুমি যত কিছুই হও না কেন, তোমার প্রকৃত অবস্থা তার জানা আছে। তাই কৃত্রিমতার কোন প্রয়োজন নেই। বরং সাদাসিধা ও অকৃত্রিমভাবে যে শব্দ মাথায় আসে তাই লিখতে থাকো।

সব কাজই অকৃত্রিমভাবে করতে হবে

আমাদের হযরত থানভী (রহ.)-এর রুচি এই ছিলো যে, প্রত্যেক কাজ অকৃত্রিমভাবে করবে। কাজে, কথায়, লেখায় সব বিষয়ে অকৃত্রিম হও। হযরত বলতেন যে, মজলিসের মধ্যে যেভাবে আরাম হয়, সেভাবে বসো। অকৃত্রিমভাবে বসো, কোন বিশেষ ধরনের বসার প্রতি গুরুত্বারোপ করো না। একইভাবে

সূচিপত্র

অকৃত্রিমভাবে চিঠি লেখো। তবে এটা অবশ্যই জরুরী যে, বেয়াদবী ও অশালীন কথা লিখো না। তাই হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, বড়দের সঙ্গে রং লাগিয়ে কথা বলা সমীচিন নয়।

আগে সালাম দিতে লজ্জা করা অহংকার

একটি মালফুযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'আলেমদের প্রতি আমার অভিযোগ যে, আমরা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করি। সাধারণ মানুষকে আগে সালাম দিতে আমরা লজ্জাবোধ করি। বরং আমরা অপেক্ষায় থাকি যে, অন্যেরা আমাদেরকে আগে সালাম দিবে।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৬০)

এটিও অহংকারের ফল। আমরা চাই যে, অন্যেরা আমাদেরকে সালাম করুক। আমরা সালাম করবো না। এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলেমদের মাঝে পাওয়া যায়। তাদের মাথায় একথা আসে যে, আমরা যেহেতু আলেম, তাই আমরা হলাম অনুসরণীয়। আর আমরা অনুসরণীয় হওয়ার কারণে সমস্ত সৃষ্টির কর্তব্য হলো, তারা আমাদের সঙ্গে ভক্তি-শ্রদ্ধার আচরণ করবে।

ইলমের জন্যে শোকর করো, অহংকার করো না

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বড় চমৎকার কথা বলতেন। তাঁর কথা সব সময় স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলতেন যে, ভাই! আল্লাহ তাআলা তোমাকে ইলম দিয়ে থাকলে তা তাঁর নিয়ামত। এখন তুমি সেই নিয়ামতকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করো। এ নিয়ামতকে নিজের অহংকারের মাধ্যম কেন বানাও? মূলত তুমিও অন্যান্য মাখলূকের মতই এক মাখলূক। তোমার মধ্যে আর তাদের মধ্যে কী পার্থক্য? শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, আল্লাহ তাআলা তাদের তুলনায় তোমাকে একটি অতিরিক্ত নিয়ামত দান করেছেন। তাই এজন্যে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করো। এ নিয়ামতকে সঠিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ, মানুষের খেদমতে ব্যবহার করো। এতে করে তোমার ইলমের নূর এবং তার ফয়েয বিস্তার লাভ করবে। তার সুঘ্রাণ দুনিয়াতে ছড়াবে। তার ফায়দা বিস্তৃত হবে। এটা সমীচিন নয় যে, ঐ ইলমকে নিজের অহমিকার মাধ্যম বানিয়ে বসবে। আল্লাহ তাআলা চাইলে এক মুহূর্তের মধ্যে এ ইলম ছিনিয়ে নিবেন। তাই কিসের উপর অহংকার করো? অতএব এ ইলমের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করো। ইলমকে তার সঠিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ, মানুষের খেদমতে ব্যবহার করো। মানুষের খাদেম হয়ে যাও।

সূচিপত্র

অন্যান্য পদ মানুষের ক্ষমতাভুক্ত নয়

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বড় দামী কথা বলতেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। তার উপর যদি আমল করা হয়, তাহলে সমস্ত অহংকারের শিকড় কেটে যাবে। তিনি বলতেন যে–

আমি তোমাদেরকে একটি পদের কথা বলছি। এটি এমন একটি পদ, যে পদ কেউ তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিবে না এবং এ পদ লাভ করার ফলে কেউ তোমার সাথে হিংসা করবে না। অথচ দুনিয়ার অন্য সমস্ত পদের অবস্থা এই যে, সেগুলো অর্জন করা মানুষের ক্ষমতাভুক্ত নয়। যেমন, তুমি চাইলে দেশের প্রেসিডেন্ট হবে! দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া কি তোমার ক্ষমতাভুক্ত? তারপর ধরে নাও যে, তুমি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলে, তখন কত মানুষ তোমার সাথে হিংসা করবে? তখন সব সময় এ আশঙ্কাও লেগে থাকবে যে, যে কোন সময় এ পদ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

'সেবকে'র পদ গ্রহণ করো

বর্তমান যুগের রাজনীতির অবস্থা এই যে, কেউ যদি প্রধানমন্ত্রী হয়, তাহলে তার সব সময় এ চিন্তা লেগে থাকে যে, আমার থেকে এ পদ আবার চলে না যায়। দিন-রাত তার এ পেরেশানীতে অতিবাহিত হয়। সব সময় তার উপর গদি বাঁচানোর ফিকির সওয়ার হয়ে থাকে।

হযরত বলতেন যে, আমি তোমাদেরকে এমন একটি পদের কথা বলছি, যা অর্জন করা তোমাদের নিজেদের ক্ষমতাভুক্ত। আর এ পদ অর্জন করলে কেউ তোমাদের সাথে হিংসা করবে না। এ পদ কেউ তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিবে না। তাহলো 'সেবকে'র পদ। সেবক হয়ে সবার সেবা করতে আরম্ভ করো। একথা ভাবো যে, আমি তো সবার সেবক। জনসাধারণের সেবক। সমস্ত মাখলূকের সেবক। বউ-বাচ্চার সেবক। পরিবারের লোকদের সেবক। তবে সেবার ধরণ ভিন্ন ভিন্ন।

উস্তাদ, বাপ ও আলেম সবাই সেবক

যে উস্তাদ বাচ্চাদেরকে পড়ায়, সেও খেদমত করে। তবে তার খেদমতের ধরণ ভিন্ন। তাই উস্তাদও খাদেম। এমনিভাবে বাবা তার সন্তানের পরিচর্যা করে, তাও খেদমত। এমনকি বাপ যদি বেটাকে মারে, তাও খেদমত। ধমক দেয়, তাও খেদমত। কারণ, এই মারা এবং ধমক দেওয়ার উদ্দেশ্য তার মধ্যে ভালো ভালো গুণ সৃষ্টি করা, তাই বাবা খাদেম।

সূচিপত্র

এমনিভাবে তুমি যদি আলেম হয়ে থাকো, তাহলে মনে করো যে, আল্লাহ তাআলা মাখলূকের খেদমত করার জন্য তোমাকে এ ইলম দিয়েছেন। যাতে করে তুমি এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মাখলূকের উপকার করো। এটাই ইলমের সঠিক প্রয়োগ ক্ষেত্র। এই ইলমের উপর ভিত্তি করে গর্ব করতে থাকবে এবং অহংকারে লিপ্ত হবে, তা ঠিক নয়। অতএব একজন আলেমও খাদেম।

অহংকারের সংজ্ঞা

একটি মালফূযে হযরত বলেন–

> 'অহংকার হলো, নিজের উত্তম গুণাবলীকে নিজের যোগ্যতা ও পূর্ণতা মনে করা, আল্লাহর দান ও দয়ার উপর নজর না দেওয়া এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করা। তবে নিজের গুণাবলীকে অস্বীকার করা 'তাওয়াযু' বা বিনয় নয়। যেমন, একজন হাফেযের জন্যে নিজের হিফযের বিশ্বাস রাখা জায়িয আছে, তাকে আল্লাহর দান মনে করা উচিত।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৬২)

এ বিষয়টি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। এর সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে প্রশংসনীয় কোন গুণ দান করে থাকেন, তাহলে নিজের মধ্যে এ গুণ থাকার কথা বিশ্বাস করা কোন অহংকার নয়। তবে শর্ত হলো, তাকে আল্লাহ তাআলার দান মনে করতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও পূর্ণতা বলে বিশ্বাস না করতে হবে। যেমন পূর্বেও বলেছি যে, নিজেকে 'আকমাল' তথা পরিপূর্ণ মনে করা অহংকার নয়, তবে 'আফযাল' তথা শ্রেষ্ঠ মনে করা অহংকারের শামিল।

যেমন, এক ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে, কিন্তু অন্য একজন জানে না। এখন সে একথা কী করে বলবে যে, আমি আরবী জানি না। বা এক ব্যক্তি মাদরাসায় পড়েছে, অন্যজন পড়েনি। এখন সে কী করে বলবে যে, আমি মাদরাসায় পড়িনি। কারণ, এটি তো অবাস্তব কথা। তাই শুধু এতটুকুর দ্বারা অহংকার হয় না। তবে হ্যাঁ! অহংকার তখন হবে, যখন সে তার এ গুণকে হয় নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা মনে করবে। সে মনে করবে যে, আমার যা কিছু লাভ হয়েছে তা আমার ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে হয়েছে। যেমন কিনা কারূন দাবি করেছিলো যে,

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي

(আমিতো নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা এ সকল সম্পদ অর্জন করেছি)

(সূরা কাসাস : ৭৮)

অথবা ঐ ব্যক্তি তার এ গুণকে আল্লাহর দানতো মনে করে, তবে এ গুণের ভিত্তিতে সে অন্যদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাহলে এটা অহংকার। তবে যদি এ দু'টি বিষয় না থাকে, অর্থাৎ, সে এটাকে নিজের যোগ্যতা মনে করে না, বরং এটাকে সে আল্লাহর দান মনে করে এবং এটাও জানে যে, যে কোন সময় তিনি এটা ছিনিয়ে নিতে পারেন এবং এ গুণের কারণে সে অন্যদেরকে হেয়প্রতিপন্নও করে না, তাহলে ইনশাআল্লাহ ঐ ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত থাকবে।

অহংকার থেকে মুক্ত থাকার উপায় হলো শোকর করা

অহংকার থেকে মুক্ত থাকার উপায়ও এটাই যে, যখনই নিজের কোন ভালো গুণের প্রতি নজর যাবে, তখনই এজন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করবে যে, হে আল্লাহ! আপনি কেবলই অনুগ্রহ করে আমাকে এ গুণ দান করেছেন, অন্যথায় আমি এর যোগ্য ছিলাম না। শোকরের মধ্যেই একথা নিহিত থাকে যে, হে আল্লাহ! আমি এর যোগ্য ছিলাম না, আপনি নিজেই দয়া-মায়া করে আমাকে এ গুণ দান করেছেন। যখন মানুষ একথা চিন্তা করবে, তখন ইনশাআল্লাহ অহংকারের শিকড় কেটে যাবে। এ বিষয়টিকেই হযরত বলেন যে, 'অহংকার হলো, নিজের ভালো গুণাবলীকে নিজের যোগ্যতা মনে করে। আল্লাহর দান ও দয়ার প্রতি নজর দেয় না এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করে। তবে নিজের গুণাবলীকে অস্বীকার করা বিনয় নয়।'

নিজেকে 'অধম ও অকর্মণ্য' বলা বিনয় নয়

অনেকে বিনয়ের জন্যে নিজেকে নিজে 'অধম ও অকর্মণ্য' বলে। এগুলোর বেশির ভাগই মিথ্যা হয়ে থাকে। মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ এই যে, সে নিজেকে অকর্মণ্য বলার উত্তরে যদি বলা হয় যে, সত্যিই আপনি অকর্মণ্য। তাহলে তার মনের অবস্থা কী হবে? তার মনে এ উত্তর অপসন্দ হবে। এ অপসন্দ হওয়াই এ কথার প্রমাণ যে, এ ব্যক্তি যে, নিজেকে নিজে অকর্মণ্য বলছিলো, তা অন্তর থেকে বলেনি। বরং সে নিজেকে এজন্যে অকর্মণ্য বলছিলো, যেন মানুষ তাকে বিনয়ী মনে করে এবং মানুষ উত্তরে তাকে বলে যে, না হযরত! আপনি তো অনেক বড় আলেম। আপনার মর্যাদা তো অনেক উপরে।

লক্ষ্য করুন, এর মধ্যে কতগুলো রোগের সমন্বয় ঘটেছে। তাই একথা বলা যে, আমি অকর্মণ্য- এটা বিনয় নয়। বরং বিনয়ের ভান যে, আমি অনেক বড় বিনয়ী, তাই নিজেকে 'অধম ও অকর্মণ্য' বলি। সুতরাং আমরা নিজেদেরকে যে, 'নগণ্য, 'গোনাহগার', 'অকর্মণ্য' ও 'অকেজো' লিখি, তা বেশির ভাগ সময় এ

সমস্ত রোগের সমষ্টি হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে আন্তরিকভাবেই এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে সে ভিন্ন কথা। সত্যি ও আন্তরিকভাবে বলার আলামত এই যে, অন্য কোন ব্যক্তি যদি এসব কথার উত্তরে বলে যে, হ্যাঁ, আপনি সত্যিই এমন। তখন যদি অন্তরে সামান্য আঁচড়ও না লাগে এবং নিজের কাছে খারাপ না লাগে, তাহলে এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই।

নিজেকে ছোট মনে করা হলো বিনয়

আসল কথা হলো, এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করার দ্বারা কিছু আসে যায় না। কারণ, নিজেকে ছোট বলা বিনয় নয়, নিজেকে ছোট মনে করা হলো বিনয়। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে বিনয়ী সে কৃত্রিমভাবে এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করবে না। এমন ব্যক্তি মুখে নিজেকে নিজে 'অধম' ও 'অকর্মণ্য' না বললেও অন্তরে অন্তরে সব সময় তার চোখ নিজের দোষ-ক্রটির উপর থাকে। যার ফলশ্রুতিতে সে নিজেকে সমস্ত মাখলূকের চেয়ে তুচ্ছ মনে করে।

বুযুর্গদের বিনয়ের ঘটনা

হযরত ডা. হাফিযুল্লাহ সাহেব (রহ.) যিনি হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব অমৃতসরী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। তিনি একবার আমাকে বর্ণনা করে শোনান যে, আমি নিজে এ ঘটনা হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব অমৃতসরী (রহ.) থেকে শুনেছি যে, একবার আমি থানাভোনে হযরত থানবী (রহ.)-এর খানকায় অবস্থান করছিলাম। হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মদ সাহেব (রহ.)ও তখন খানকায় অবস্থান করছিলেন। এক দিন হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মদ সাহেব (রহ.) আমাকে বলেন যে, আমার মধ্যে তো বিস্ময়কর অবস্থা বিরাজ করছে। বুঝি না এটা ভালো অবস্থা, নাকি মন্দ অবস্থা। বলতেও লজ্জা লাগছে, কিন্তু যেহেতু আপনার সাথে বন্ধুত্ব রয়েছে, তাই বন্ধু হিসেবে শুধু আপনাকে বলছি। অবস্থাটি এই যে, আমি যখন হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর মজলিসে বসি, তখন আমার মনে হয় যে, এ মজলিসে যত মানুষ বসে আছে, এরা সবাই আমার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং এরা সকলে মানুষ। আর আমি একটি বলদ, মানুষের মধ্যে এসে বসেছি। আমার পেরেশানী হলো, আমার এ অবস্থা ভালো, নাকি মন্দ তা বুঝি না।

আমি যখন তাঁর থেকে এ অবস্থা শোনলাম, তখন উত্তরে বললাম– হযরত! আমারও তো এই একই অবস্থা হয় যে, আমি যখন হযরতওয়ালার মজলিসে বসি, তখন এমন মনে হয় যে, আমিই সবার চেয়ে তুচ্ছ, আর এঁরা সবাই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন আমরা দু'জন মিলে চিন্তা করলাম যে, আমরা উভয়ে হযরত

থানভী (রহ.)-এর নিকট আমাদের এ অবস্থা বর্ণনা করি। সুতরাং আমরা দু'জন হযরত থানভী (রহ.)-এর নিকট গেলাম এবং নিবেদন করলাম– হযরত! আমাদের দু'জনেরতো এ অবস্থা। জানিনা এ অবস্থা ঠিক, নাকি অঠিক? মুনাসিব, নাকি না-মুনাসিব?

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁদের অবস্থা শুনে বললেন– আরে ভাই! কোন চিন্তা করো না। আমিও যখন মজলিসে বসি, তখন আমারও এমনই মনে হয় যে, এরা সকলে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ, আর আমি এদের থেকে তুচ্ছ।

নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি দাও

মোটকথা, নিজেকে 'অধম' বলা বিনয় নয়, বরং 'অধম' মনে করা হলো বিনয়। যখন কোন মানুষের তার নিজের দোষের উপর চোখ পড়ে, তখন তার চোখে সারা পৃথিবীর মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। কারণ, অন্য সব মানুষের গোপন দোষ সম্পর্কে জানা থাকে না, কিন্তু নিজের সমস্ত গোপন দোষ সম্পর্কে জানা থাকে এবং ঐ সমস্ত দোষের কথা সামনে উপস্থিত থাকে। আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে আমাদের সবাইকে এ গুণ দান করুন। আমীন।

নিজের গুণকে অস্বীকার করা বিনয় নয়

এজন্যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর এ মালফূযে বলেন যে– 'নিজের গুণাবলীকে অস্বীকার করা বিনয় নয়।'

যেমন কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করলো– আপনি কি হাফেয? আর আপনি বিনয়ের জন্যে বললেন– না। এটি বিনয় হলো না, এটি তো বরং মিথ্যা হলো। তবে হ্যাঁ, নিজের এ গুণ সম্পর্কে একথা মনে করবে যে, এসব কিছু আল্লাহর দান, যেগুলো আমার কোন প্রকার যোগ্যতা ছাড়া লাভ হয়েছে। এটি আমার ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা ও পূর্ণতা নয় এবং এ গুণের কারণে আমি শ্রেষ্ঠ হওয়া জরুরী নয়, বরং অন্যেরা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

শুধু ইলম অর্জনের দ্বারা অহংকার দূর হতে পারে না

একটি মালফূযে হযরত বলেন–

> 'এ অহংকার বড়ই মন্দ চরিত্র। যতক্ষণ এ চরিত্র আমাদের মধ্যে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দ্বারা ইলমের হক আদায় হতে পারে না। আর এ মন্দ চরিত্র শুধু ইলম হাসিল করার দ্বারা দূর হতে পারে না। যেমন, কারো চুলকানির ঔষধ

সূচিপত্র

জানা আছে, তাই বলে ঔষধ জানার কারণে তার চুলকানি ভালো হয়ে যাবে না। বরং তাকে ঔষধের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। তারপর সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। ক্ষতিকর জিনিসসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ডাক্তার যত দিন বলে ততদিন ঔষধ ব্যবহার করতে হবে এবং নিয়ম মেনে চলতে হবে। ডাক্তার যে পর্যন্ত শিরা দেখে না বলবে যে, এখন চুলকানির জীবাণু দূর হয়ে গেছে, সে পর্যন্ত ঔষধ ব্যবহার করা বাদ দেওয়া যাবে না।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৬১)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ রোগ থেকে হেফাযত করুন এবং এ থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সাতষট্টিতম মজলিস

অধিক কথা বলার প্রবণতা ও তার প্রতিকার

অধিক কথা বলার প্রবণতা ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

চারটি মুজাহাদা

হযরাতে সুফিয়ায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট যখন কোন ব্যক্তি নিজের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য যেতো, তখন তাঁরা চার প্রকারের মেহনত-মুজাহাদা এবং কষ্ট-সাধনা করাতেন।

এক. কম খাওয়া।

দুই. কম কথা বলা।

তিন. কম ঘুমানো।

চার. মানুষের সাথে কম মেলামেশা করা।

এ চার প্রকারের মুজাহাদা করানোর ফলে ঐ ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে ভারসাম্য চলে আসতো। ফলে এ সমস্ত অভ্যাস তার নিয়ন্ত্রণে এসে যেতো। তখন ঐ ব্যক্তি আর সীমাতিরিক্ত আহার করতো না, সীমাতিরিক্ত কথা বলতো না, সীমাতিরিক্ত ঘুমাতো না এবং মানুষের সঙ্গেও সীমাতিরিক্ত মেলামেশা করতো না।

হালাল জিনিস কেন পরিত্যাগ করানো হয়?

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন যে, এ সমস্ত মুজাহাদার মাকসাদ হলো, আমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা যেহেতু ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে এবং আমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা গোনাহের দিকে ধাবিত তাই এ কামনা-

সূচিপত্র

বাসনাকে ভারসাম্যের মধ্যে আনতে এবং সোজা করতে কতক সময় কিছু জায়েয জিনিসকেও পরিত্যাগ করতে হয়।

এক ব্যক্তি হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে, আল্লাহ তাআলা একটি জিনিসকে যখন জায়েয ও হালাল করেছেন, তখন সুফিয়ায়ে কেরাম ঐ জায়েয ও হালাল জিনিসকে কেন পরিত্যাগ করান? আল্লাহ তাআলা যখন এগুলোকে হালাল করেছেন, তাহলে কার ক্ষমতা আছে এগুলোকে হারাম করার?

উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন– মূলত এটি হলো চিকিৎসা। যখন তোমরা ডাক্তার এবং হাকীমের কাছে যাও, তখন ডাক্তার তোমাদেরকে বলে যে, তোমার ডায়াবেটিস আছে, তাই মিষ্টি খাবে না। এবার লক্ষ্য করো, মিষ্টিতো হালাল জিনিস, কিন্তু ডাক্তার তা খেতে নিষেধ করছে। কেন নিষেধ করছে? তোমার রোগের কারণে নিষেধ করছে। কারণ, তুমি যদি মিষ্টি খাও, তাহলে তোমার ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে। ফলে তুমি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ডাক্তার বা হাকীম যে মিষ্টান্ন খেতে নিষেধ করছে তা হালালকে হারাম করছে না, বরং তোমার প্রয়োজনের কারণে নিষেধ করছে।

ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব গড়া উদ্দেশ্য

একইভাবে যখন কোন শায়খ তার কোন মুরীদকে বলে যে, কথা কম বলো, খাবার কম খাও, কম ঘুমাও, মানুষের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দাও– তখন তার উদ্দেশ্য কোন হালালকে হারাম করা নয়, বরং তোমার চিকিৎসা করা এবং তোমার জন্য ক্ষতিকর জিনিস থেকে তোমাকে বাঁচানো উদ্দেশ্য। যাতে করে এর ফলশ্রুতিতে তোমার স্বভাব ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে যায়। বিধায় সুফিয়ায়ে কেরাম যে সমস্ত মুজাহাদা করান, সেগুলোর উপর এ জাতীয় আপত্তি করা উচিত নয়।

একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত

এরপর হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝান। তিনি বলেন যে, এর দৃষ্টান্ত হলো, এ কাগজ। এ কাগজটিকে একদিকে বাঁকা করে দাও, তারপর এটাকে সোজা করো। তুমি এটিকে সোজা করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এটি সোজা হবে না। এটিকে সোজা করতে হলে আগে একে বিপরীত দিকে বাঁকা করে দাও। বিপরীত দিকে বাঁকা করে দিলেই এটি সোজা হয়ে যাবে।

আমাদের নফস গোনাহের দিকে বাঁকা হয়ে আছে

এমনিভাবে আমাদের নফসও গোনাহ এবং আল্লাহর নাফরমানীর দিকে বাঁকা হয়ে আছে। যার ফলে গোনাহের কল্পনা সৃষ্টি হয়। অন্তরে গোনাহের

কামনা সৃষ্টি হয় এবং গোনাহের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এই নফসের চিকিৎসা এই যে, একে বিপরীত দিকে বাঁকা করে দিতে হবে। তার দ্বারা কিছু জায়েয কাজও পরিত্যাগ করাতে হবে। যখন এ নফস দ্বারা কিছু জায়েয কাজও পরিত্যাগ করানো হবে, তখন এটি ভারসাম্যের উপর উঠে আসবে। এ কারণেই যখন কোন মানুষ সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট যেতো, তখন তাঁরা তাকে বলতেন যে, খাবার কম খাবে, কম কথা বলবে, মানুষের সাথে কম মেলামেশা করবে এবং কম ঘুমাবে। এ চারটি মুজাহাদা করো।

কম খাওয়ার এবং কম ঘুমানোর প্রয়োজন নেই

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)– যিনি এ পথের 'মুজাদ্দিদ' এবং 'মুজতাহিদ'। তিনি বর্তমান যুগের অবস্থাকে সামনে রেখে বলেন যে, খাবার কম খাওয়ার চিন্তা করো না। বরং আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সে অনুপাতে খাও। আমি তোমাদেরকে 'কম খাওয়ার' মুজাহাদা করাই না। একইভাবে কম ঘুমানোর মুজাহাদাও করাই না। কারণ, বর্তমান যুগের মানুষের দৈহিক শক্তির অবস্থা এই যে, যদি খাবার কম খাও বা কম ঘুমাও তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে, তখন যে অল্প-বিস্তর ইবাদত তুমি করছো, তাও আর করতে পারবে না। এ কারণে আমি কম খাওয়ার মুজাহাদাও করাই না এবং কম ঘুমানোর মুজাহাদাও করাই না।

কম খাওয়ার সীমারেখা

তবে কম খাওয়ার এবং কম ঘুমানোর একটি পদ্ধতি বলছি, তোমরা তার উপর আমল করবে। কম খাওয়ার সে পদ্ধতিটি এই যে, খানা খাওয়ার সময় প্রত্যেক মানুষেরই এক সময় এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যে, আর খাবো কি খাবো না। যে সময় এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ঐ সময় খাওয়া ছেড়ে দাও। আর খেয়ো না। এর উপর আমল করলে ইনশাআল্লাহ কম খাওয়ার বরকত হাসিল হয়ে যাবে এবং ডাক্তারী কথানুযায়ী কখনো অসুস্থ হবে না।

কম ঘুমানোর সীমারেখা

একইভাবে কম ঘুমানোর ক্ষেত্রেও যদি বর্তমান যুগের মানুষ পূর্বের লোকদের মতো মুজাহাদা করতে আরম্ভ করে যে, চব্বিশ ঘণ্টায় শুধু এক ঘণ্টা ঘুমালো, তাহলে এমন কঠিন মুজাহাদার ফলে মানুষ অসুস্থ ও পাগল হয়ে যাবে এবং মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ফলে পূর্বে অল্প-বিস্তর ইবাদত করতো, তাও ছুটে যাবে।

এ কারণে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, বর্তমান যুগে এর উপর আমল করা উচিত নয়। এখন বরং এ পন্থা অবলম্বন করো যে, নিজের স্বাস্থ্য অনুপাতে ঘুমানোর জন্যে সময় নির্ধারণ করে নাও যে, চব্বিশ ঘণ্টায় আমাকে এত ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। যেমন, ছয় ঘণ্টা বা সাত ঘণ্টা, আর বেশির চেয়ে বেশি আট ঘণ্টা। ঘুমানের জন্য ঘণ্টা নির্ধারণ করার পর তার চেয়ে অধিক ঘুমিও না। এটাই কম ঘুমানোর সাধনা। এ দু'টি মুজাহাদার বিস্তারিত বিবরণ তো হযরত এভাবে বলে দিয়েছেন।

এ পথের প্রথম ধাপ 'জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা'

আরো দু'টি মুজাহাদা রয়েছে। তার একটি হলো, 'কথা কম বলা'। এর উপর উমল করা খুবই জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কথা বলাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ পথে চলতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এ জিহ্বা কেঁচির মত চলতে থাকবে, তার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, কন্ট্রোল থাকবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এ পথে চলতেও পারবে না। এ পথের প্রথম ধাপই হলো, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে আনা। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে গোশতের এ টুকরাটি দান করেছেন। এটি এত বড় একটি নিয়ামত যে, জন্মের সময় থেকে শরীরে লেগে আছে, আর মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত এ মেশিন কাজ করে যাচ্ছে। এ মেশিনকে না তেল দিতে হয়, না সার্ভিসিং করাতে হয়। না তার ওভারহোলিং করাতে হয়, না পার্টস পরিবর্তন করতে হয়। যে দিন থেকে এ মেশিন লেগে আছে, অনবরত নিজের কাজ করে যাচ্ছে। অপর দিকে মেশিনটিও পাওয়া গেছে বিনামূল্যে। এটি পেতে কোন পয়সা খরচ করতে হয়নি।

জিহ্বার নড়াচড়া

এটি এমন একটি মেশিন যে, যখনই মাথায় এ চিন্তা আসে যে, আমাকে এ কথাটি এভাবে বলতে হবে, তখনই মেশিনটি এমনভাবে নড়াচড়া করতে আরম্ভ করে যে, কথাটি মানুষ পরিষ্কার শুনতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা মস্তিষ্ক ও জিহ্বার মধ্যে এমন এক বিস্ময়কর কানেকশন সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, আমার মাথায় কোন বিষয় আসলেই তা শব্দের ছাঁচে সেজে জিহ্বার মাধ্যমে উচ্চারিত হয়ে অন্য মানুষের মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। জিহ্বার এ বিচিত্র ধরনের নড়াচড়ার পদ্ধতি কি তোমরা নিজেরা আবিষ্কার করেছো যে, জিহ্বাকে এভাবে ঘুরাবো তো এ বর্ণ উচ্চারিত হবে, আর ঐভাবে ঘুরাবো তো ঐ বর্ণ উচ্চারিত হবে? তোমরা নিজেরা কি এ ভাষা তৈরি করেছো, যার মাধ্যমে মনের কথা প্রকাশ করো? বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা এবং অপূর্ব কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে মস্তিষ্ককে

শিখিয়েছেন এবং এরপর জিহ্বাকে এমনভাবে মস্তিষ্কের অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন যে, মস্তিষ্কে কোন কথা আসলেই জিহ্বা দিয়ে তা উচ্চারিত হয়।

মস্তিষ্ক ও জিহ্বার মাঝের কানেকশন

যদি এতদুভয়ের মাঝে বিরতি হতো যে, মস্তিষ্কের মধ্যে তো একটি কথা এসেছে, কিন্তু তাকে জিহ্বায় আনতে প্রথমে বোতাম টিপতে হবে। তাহলে মাঝের এ বিরতি এক আযাবে পরিণত হতো, তখন বড় জটিল অবস্থা সৃষ্টি হতো। দুনিয়ার কোন কাজই তখন হতো না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার অনুগ্রহে এতদুভয়ের মাঝে এমন এক কানেকশন সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, একদিকে মস্তিষ্কে কথা আসে, আর অপর দিকে জিহ্বা দিয়ে তা উচ্চারিত হয়। এর জন্যে না কোন সুইচ অন করতে হয়, আর না কোন পরিশ্রম করতে হয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ওয়েস্ট ইন্ডিজে 'বারবাডোজ' নামে একটি দ্বীপ আছে। আমি একবার সেখানে যাই। সেখানে বড় শিক্ষণীয় একটি ঘটনা দেখতে পাই। ঘটনাটি এই যে, একজন লোককে দেখলাম, তার জিহ্বা আছে। সে জিহ্বা নড়াচড়াও করে, কিন্তু তার গলার মধ্যে এমন কোন সমস্যা আছে, যার কারণে জিহ্বা নড়াচড়া করা সত্ত্বেও আওয়াজ বের হয় না। তাই তার জন্যে একটি মেশিন তৈরি করা হয়েছে। মেশিনটি সব সময় তার হাতে থাকে। যখনই তার কোন কথা বলতে হয়, তখনই প্রথমে মেশিনটি সজোরে গলার মধ্যে বসায়। তারপর ঐ মেশিনে চাপ দিলে আওয়াজ বের হয়। সে আওয়াজ মানুষের আওয়াজের মত মনে হয় না। কোন পশুর আওয়াজ মনে হয়। সে আওয়াজ শুনে শিশুরা হাসতে থাকে। তবে ঐ মেশিনের মাধ্যমে সে তার কথা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

কিন্তু আমি তার চরম অস্থিরতা লক্ষ্য করছিলাম যে, যখন তার মাথায় কোন কথা আসে, তখন সাথে সাথে সে তা বলতে পারে না। প্রথমে সে মেশিনটি গলার মধ্যে বসায়, তারপর আওয়াজ বের হয়। ফলে মাথায় কোন কথা আসা এবং জিহ্বা দ্বারা তা উচ্চারণ করার মধ্যে যে বিরতিটুকু হয়, তা বড় অস্থিরভাবে অতিবাহিত হয়।

আমরা অসংখ্য নিয়ামতের মালিক

আমাদের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কদর এজন্যে নাই যে, আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত নিয়ামত আমাদেরকে বিনামূল্যে, বিনা চাওয়ায় এবং কোনরূপ কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া দান করেছেন। জিহ্বা দিয়েছেন। বাক শক্তি

সূচিপত্র

দিয়েছেন। কণ্ঠস্বর দিয়েছেন। মস্তিষ্কের সাথে জিহ্বার কানেকশনও দিয়েছেন। যখন যে কথা জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করতে চাই, সাথে সাথে তা উচ্চারণ করি। এ কারণে এ জিহ্বার কোন দাম নেই। আল্লাহ রক্ষা করুন। এগুলোর কোন একটি অকেজো হয়ে গেলে বা কোন একটির কাজ বিঘ্নিত হলে, তখন বুঝে আসবে যে, এটি কত বড় নিয়ামত! মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্তের একেকটি কণার মধ্যে নিয়ামতসমূহের এক জগত নিহিত রয়েছে। তার মধ্যে জিহ্বা অন্যতম।

এ নিয়ামতকে গোনাহের কাজে ব্যবহার করো না

পবিত্র কুরআনে বার বার এ হুকুম এসেছে যে, চিন্তা-ফিকির করো। তার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, চিন্তা-ফিকিরের এ সমস্ত উপাদান, যেগুলো আল্লাহ তাআলা নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করো। এই যে, জিহ্বা, যা আল্লাহ তাআলা সরকারী মেশিন হিসেবে দান করেছেন, যা আমরা অবিরাম ব্যবহার করে চলছি। কখনো একথা চিন্তা করার তাওফীকও হয় না যে, আল্লাহ তাআলা কত কি নিয়ামত দিয়ে রেখেছেন। এটা একটু চিন্তা করো।

আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে কোন প্রকার চেষ্টা-কষ্ট ছাড়া না চাইতেই বিনা পয়সায় কেবল দয়া করে এ নিয়ামত দান করেছেন, তাই সাথে সাথে এ হুকুমও দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে এ মেশিন দিচ্ছি ঠিক, তবে এ মেশিনকে দেখে-শুনে ব্যবহার করবে। কোন গোনাহের কাজে এটি ব্যবহার করবে না।

জিহ্বা আখেরাতের ভাণ্ডার সঞ্চয়ের মাধ্যম

এ মেশিনটিকে যদি সঠিক পন্থায় ব্যবহার করো, তাহলে এ মেশিন তোমাদের জন্যে আখেরাতের ভাণ্ডার সঞ্চয়ের মাধ্যম হবে। এ জিহ্বা দ্বারা যদি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলো, তাহলে এ কালিমা তোমার আমলের পাল্লাকে নেকী দ্বারা ভরে দিবে। এ জিহ্বা দ্বারা যদি একবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলো, তাহলে আমলের পাল্লা ভরে যাবে। অর্থাৎ, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যে কোন যিকিরে এ জিহ্বাকে লাগিয়ে রাখলে আমি তোমাদেরকে আমলের পাল্লা ভরে নেকী দেবো। তোমাদের জন্য আখেরাতে নেকীর ভাণ্ডারসমূহ দান করবো। এ জিহ্বা দ্বারা যদি আমার কালাম তেলাওয়াত করো, তাহলে একেকটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকী তোমার আমলনামায় লিখে দেবো। শুধু যদি 'আলিফ, লাম, মীম' পড়ো, তাহলে তোমার আমলনামায় ত্রিশটি নেকী লেখা হবে।

ভেবে দেখুন, কতো বিশাল তাঁর রহমত! এ মেশিন তাঁরই দেওয়া। এ মেশিনের শক্তিও তিনিই দিয়েছেন। এ কালিমাগুলোও তিনিই শিখিয়েছেন। তাঁর

দেওয়া তাওফীকেই এ সমস্ত কালিমা জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে। এ কুরআন তাঁরই কালাম। এটি অবতীর্ণ করা স্বতন্ত্র এক বিশাল নিয়ামত। এরপরও বলা হচ্ছে যে, আমার দেওয়া মেশিন দ্বারা এ কালাম পাঠ করবে তো তোমাদেরকে ইনআম দেওয়া হবে। এতগুলো নেকী তোমাদের আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে। তাঁর রহমতের কোন শেষ আছে?

জিহ্বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানকারী

এ জিহ্বাকে যদি তোমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করো, তাহলে এ জিহ্বাই তোমাদের জন্যে জান্নাতের মহল নির্মাণ করাতে পারে। তাই এ জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখো। কারণ, এ জিহ্বা তোমাদের আখেরাতের জীবনকে গড়ে দিচ্ছে এবং তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনছে। সত্তর বছরের কাফেরও যদি 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পড়ে, তাহলে ঐ মুহূর্তেই সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

মোটকথা, এ জিহ্বা এত বড় কৃতিত্ব সম্পাদন করে চলছে যে, মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করাচ্ছে। এ জিহ্বা জান্নাতে প্রবেশ করার উপকরণসমূহ সঞ্চিত করছে এবং আখেরাতের ভাণ্ডারসমূহ পূর্ণ করছে।

জিহ্বা জাহান্নামে নিয়ে যায়

এ জিহ্বার যিনি স্রষ্টা এবং মালিক, তিনি শুধু এতটুকু চেয়েছেন যে, এ জিহ্বা একটু সামলিয়ে ব্যবহার করো। গোনাহের কাজে এটিকে ব্যবহার করো না। কারণ, এটিকে যদি তোমরা গোনাহের কাজে ব্যবহার করো তাহলে এটি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বিপদজনক উপকরণ হবে। তখন এর সমান বিপদজনক আর কিছু থাকবে না।

কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, মানুষকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিপতিতকারী মারাত্মক জিনিস হলো; তাদের জিহ্বা। এ জিহ্বা মানুষকে অতি দ্রুত জাহান্নামে নিয়ে যায়। যেমন, মিথ্যা বললে তার শাস্তি জাহান্নাম। গীবত করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। কারো মনে ব্যথা দিলে তার শাস্তি জাহান্নাম। জিহ্বা দ্বারা আল্লাহর নাফরমানীমূলক যে কোন কথা বললে তা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। তাই আল্লাহ তাআলা আপনাদের কাছে এটাই চেয়েছেন যে, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, যেন কোন অন্যায় কথা এ জিহ্বা দিয়ে বের না হয়।

জিহ্বার দ্বারা গীবত করা

সাধারণত মানুষ একথা ভুলে যায় যে, আমাকে কত বড় নিয়ামত দেওয়া হয়েছে? কে এ নিয়ামত দিয়েছেন? কী জন্যে দিয়েছেন? এসব কিছু মানুষ ভুলে যায়। এর ফলে সে দিন-রাত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিহ্বাকে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে থাকে। আর মনে করে যে, আমি জায়েয কাজ করছি। কিন্তু জায়েয কাজসমূহের মধ্যেও যখন জিহ্বাকে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করা হয়, তখন এর পরিণতিতে কিছু খারাপ ফলাফল দেখা দেয়। যেমন, আপনি আপনার পরিচিত কারো ভালো বিষয়গুলো আলোচনা করছেন যে, অমুক ব্যক্তি খুব ভালো মানুষ, নেককার মানুষ। নিয়মিতভাবে নামায-রোযা আদায় করে ইত্যাদি। আপনি তো তার গুণ বর্ণনা করছেন, কিন্তু শয়তান তার মাঝে একটি তালি লাগিয়ে দিবে যে, এমনিতো সে খুব নেক লোক, কিন্তু সামান্য নির্বোধ কিসিমের লোক। এখন শয়তান 'কিন্তু' যোগ করে একটি বাক্য বাড়িয়ে দিলো। এই এক বাক্য এ প্রশংসাকেই গীবত বানিয়ে দিলো। যে গীবত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে–

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

'গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক।'

শয়তান তাকে এই গীবতের মধ্যেও লিপ্ত করে দিলো।

জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো

আসল কথা হলো, মানুষ যখন বেশি কথা বলতে থাকে, তখন পরিণামে জিহ্বা সীমালংঘন করে থাকে, তখন সে আর গণ্ডির মধ্যে থাকে না। তাই সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন যে, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো এবং কথাই কম বলো। যখন কথা কম বলবে, তখন জিহ্বার বিচ্যুতির সুযোগই থাকবে না। জিহ্বার বিচ্যুতি এ জন্যেই ঘটে যে, তা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেঁচির মত অবিরাম চলছে। তার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা ও বাধা-নিষেধ নেই। আল্লাহওয়ালাগণের সোহবত যাদের নসীব হয় না, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ফিকিরও তাদের হয় না। বাজারে গিয়ে দেখুন, মানুষ নির্দ্বিধায় ও নির্ভাবনায় জিহ্বা দিয়ে কথা বলে চলছে। তাদের কারো কি এ ফিকির আছে যে, জিহ্বাকেও নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম তাদের জিহ্বা চলছে।

বিনা প্রয়োজনে কথা বলো না

এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে জিহ্বার উপর সামান্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ কারণে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন যে, কম কথা বলো। শুধুমাত্র

প্রয়োজনের সময় কথা বলো। বিনা প্রয়োজনে কথা বলো না, চুপ থাকো। বুযুর্গগণ বলেন, মেপে কথা বলো। এর উপর আমল তখনই হয়, যখন মানুষ কম কথা বলার অভ্যাস গড়ে। মনের মধ্যে কথা বলার চাহিদা হচ্ছে, কিন্তু বলার প্রয়োজন নেই, তাহলে বলো না, চুপ থাকো।

হযরত মিয়াঁ সাইয়্যেদ আসগার হুসাইন সাহেব (রহ.)-এর একটি ঘটনা

হযরত মিয়াঁ সাইয়্যেদ আসগার হুসাইন সাহেব (রহ.) আমার ওয়ালিদ মাজিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.)-এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁর সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর কথা শুনেছি। হযরত ওয়ালিদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিলো।

হযরত ওয়ালিদ সাহেব বলেন যে, আমি একবার তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করতে গেলে তিনি বলেন যে, মওলভী শফী সাহেব! আজ আমরা আরবীতে কথাবার্তা বলবো। আমি বড় বিস্মিত হলাম। কারণ, সারা জীবনে কখনো তো আরবীতে কথা বলেন নাই। আরবীতে কথা বলার অভ্যাসও নেই এবং এর অনুশীলনও নেই। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি যে, হযরত! এমনটি কেন? উত্তরে হযরত বলেন যে, আসল ব্যাপার এই যে, আমরা যখন আমাদের নিজের ভাষায় কথা বলি, তখন জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে থাকে না। যা ইচ্ছা তাই বলতে থাকি। যার ফলে অধিক কথা বলার ব্যাধিতে আক্রান্ত হই। কিন্তু আরবী বলার অভ্যাস তোমারও নেই, আমারও নেই। এর ফল এই হবে যে, কেবল প্রয়োজনীয় কথাই আমরা বলবো। তাও হবে ভাঙ্গা-চোরা। তখন প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা মুখ দিয়ে বের হবে না।

আমাদের দৃষ্টান্ত

এরপর হযরত মিয়াঁ সাইয়্যেদ আসগার হুসাইন সাহেব (রহ.) বলেন– আমাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো, যে বিরাট অঙ্কের পুঁজি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলো। প্রথম দিকে সে ঐ পুঁজি নির্দ্বিধায় উড়াতে থাকে। কখনো এটা কিনছে, কখনো ওটা কিনছে। কখনো এটা খেলো, কখনো ওটা খেলো। অবশেষে ঐ পুঁজির সামান্য অংশ বাকী রইলো। অথচ তার গন্তব্যস্থল এখনো অনেক দূরে। তখন ঐ ব্যক্তির অবস্থা এই হবে যে, অবশিষ্ট পুঁজি সে চিন্তা করে করে অতি সাবধানে খরচ করবে, যেন গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বে পুঁজি শেষ হয়ে না যায়।

জায়েয কথাও বিনা প্রয়োজনে বলো না

আমাদের দৃষ্টান্তও এমনই যে, আমরাও আমাদের জীবনের দীর্ঘ এ সময়ে জিহ্বা নামক এ নিয়ামতকে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে ব্যবহার করে নষ্ট করে দিয়েছি।

জানা নেই, জীবনের আর কতটুকু সময় বাকি আছে। তাই আগামীতে এ জিহ্বাকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করার এবং অঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কথা কম বলার মূল উদ্দেশ্যও এটিই। এর পদ্ধতি এই যে, শুরুতে খুব কম কথা বলো। জায়েয কথাও বিনা প্রয়োজনে বলো না। এভাবে ক্রমান্বয়ে যখন কম বলার অভ্যাস হয়ে যাবে এবং স্বভাবের মধ্যে ভারসাম্য চলে আসবে, তখন আল্লাহ্ তাআলার দেওয়া তাওফীকে মুখ থেকে সে কথাই বের হবে, যা ভারসাম্যপূর্ণ হবে। স্বভাব যখন ভারসাম্যের ছাঁচে গড়ে উঠে, তখন যে কথাই মুখ দিয়ে বের হয় তা টেকসই বের হয়। এক সুতা এদিক সেদিক হয় না। কোথাও অতিরঞ্জন হয় না। কোথাও সীমাতিরিক্ত প্রশংসা হয় না। কোথাও সীমাতিরিক্ত নিন্দা হয় না।

নতুন প্রজন্ম কোন ভাষাই জানে না

কিছু কিছু লোক হযরত থানভী (রহ.)-এর ওয়ায ও মালফূয পড়ে বলে যে, হযরত খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন। যে কারণে কতক সময় হযরতের কথা আমাদের বুঝে আসে না।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, হযরত থানভী (রহ.) যে সময়ে এ সমস্ত কিতাব লিখেছেন এবং এ সমস্ত 'মালফূয' বলেছেন, সে যামানার লোকদের অবস্থা বর্তমান যামানার লোকদের মতো ছিলো না। বর্তমানে তো এমন এক জাতি তৈরি হয়েছে, যারা কোন ভাষাই পারে না। না উর্দূ, না ফার্সী, না আরবী, না ইংরেজি। কোন ভাষাই শুদ্ধরূপে জানে না। বর্তমানে গ্রাজুয়েট এবং এম. এ পাশ ব্যক্তি যখন কথা বলে, তখন বলে যে, 'আমি তাশরীফ এনেছিলাম।' 'আপনি উপস্থিত হয়েছিলেন।' 'আমি আপনার নিকট এজন্যে তাশরীফ এনেছিলাম যেন আপনি আমার বাড়িতে যান।' 'আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনি যা নিবেদন করেছিলেন'– এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আমার নিকট বড় বড় শিক্ষিত লোকের চিঠি আসে। তার মধ্যে প্রচুর বানান ভুল থাকে। মোটকথা, এমন এক প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, যার কোন ভাষাই শুদ্ধ নয়। আল্লাহ্ তাআলাই এ জাতির উপর রহম করুন।

উর্দূ ভাষীদের কয়েকটি বাক্য

যে যামানায় হযরত থানভী (রহ.) এ সমস্ত ওয়ায ও মালফূয ইরশাদ করেছেন, সে যামানা এমন ছিলো যে, তখনকার সাধারণ মানুষেরাও ইলমী পরিভাষার ব্যাপারে এত বেশি বে-খবর ছিলো না। সে যামানার মাধ্যমিক পাশ

লোকদের চিঠি-পত্র দেখুন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা আরবী ভাষার শব্দসমূহ এমনভাবে ব্যবহার করতেন যে, বর্তমানের এম. এ ও বি.এ পাশ লোকও সেগুলো বুঝবে না।

বর্তমান যুগের লোকদের তো এ অবস্থা যে, এক ব্যক্তি বললো যে, 'মাঁয় আজ এক যিয়াফত মেঁ মাদয়ু থা'। তখন অপরজন বললো যে, তুমি আরবী বলছো, না কি উর্দূ বলছো? ঐ ব্যক্তি তখন এভাবে বললো যে, 'আজ মুঝে এক ফাংশন মেঁ ইনভয়েট কিয়া গিয়া হায়'। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, হ্যাঁ, এবার তুমি উর্দূ বলেছো। বর্তমানে আমাদের অবস্থা এই হয়েছে। 'যিয়াফত' ও 'মাদয়ু' শব্দ যেন বড় কঠিন হয়েছে। এ কারণে বর্তমান যুগের মানুষ বলে যে, হযরত থানভী (রহ.)-এর 'মাওয়ায়েয' ও 'মালফূযাতে'র মধ্যে বড় কঠিন কঠিন শব্দ থাকে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর কথা মাপাজোখা হয়ে থাকে

দ্বিতীয় কথা হলো, কোন শিক্ষিত মানুষ যদি হযরত থানভী (রহ.)-এর কথাগুলি একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে দেখতে পাবে যে, হযরতের কথা এমন পরিমিত যে, তার মধ্যে কোন শব্দ অতিরিক্তও হয় না এবং কোন শব্দ কমও হয় না। এ কারণে অনেক সময় তিনি নিজের কথাকে সীমার মধ্যে রাখতে সহজ কোন শব্দ পান না বিধায় কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এটা শুধু এ জন্যে করতেন, যেন কথা সীমার মধ্যে থাকে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি মালফূয

আমার ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি মালফূয তথা বাণী শুনাতেন যে, হযরত বলেন– 'নিজের মতকেই শুধু প্রাধান্য দেওয়া খুবই মন্দ চরিত্র।' অর্থাৎ, সব সময় শুধু নিজের মতের উপর ভরসা করা এবং শুধু নিজের উপর আস্থা পোষণ করে সব কাজের ব্যাপারে নিজেই ফায়সালা করা নিতান্ত খারাপ কাজ। তাই সব কাজের পূর্বে অবশ্যই পরামর্শ করবে। তিনি বলেন যে– 'নিয়মতান্ত্রিক বড় যতক্ষণ পর্যন্ত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে পরামর্শ করবে।' এখানে লক্ষ্য করুন, তিনি একথা বলেননি যে, 'বড় যতক্ষণ আছে।' বরং বলেছেন– 'নিয়মতান্ত্রিক বড় যতক্ষণ আছে।' এরপর তিনি নিজেই এ শব্দটি বাড়ানোর কারণ বর্ণনা করেন যে, 'নিয়মতান্ত্রিক বড়' এজন্যে বলছি যে, প্রকৃতপক্ষে কে বড় আর কে ছোট– তা তো কেবল আল্লাহ জানেন।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার।'
(সূরা হুজুরাত : ১৩)

বড় তো সেই, যাকে আল্লাহ তাআলা ভূষিত করবেন। যাকে মাফ করে দিবেন। যার প্রতি তিনি খুশি হবেন। এমন নয় যে, যে ব্যক্তি বয়সে বড় বা মর্যাদায় বড়, সে আল্লাহর নিকটেও বড়, তা জরুরী নয়। তবে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিছু মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন, বাপ বেটার চেয়ে বড়। উস্তাদ শাগরিদের চেয়ে বড়। এজন্যে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক বড় আছে, তাদের সাথে পরামর্শ করো। আর যখন নিয়মতান্ত্রিক বড় না থাকে, তখন নিজের সমকক্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করো, আর যখন তারাও না থাকে, তখন নিজের চেয়ে ছোটদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

ভারসাম্য থাকলে এমন কথাই বের হয়

কিন্তু যদি আমি আর আপনি বলতাম, তাহলে শুধু এতটুকু বলতাম যে, বড়দের সাথে পরামর্শ করবে। কিন্তু হযরত থানবী (রহ.)-এর মুখ থেকে কথাটি এভাবে বের হয়নি। কারণ, অন্যকে বড় বলা মূলত আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম করে কাউকে পবিত্র বলা। তাই তিনি একটি শব্দ বাড়িয়ে বলেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক বড়র সঙ্গে পরামর্শ করবে।

যখন আল্লাহ তাআলা কারো স্বভাবের মধ্যে ভারসাম্য দান করেন, তখন মুখ এবং কলম থেকে যে শব্দই বের হয় তা পরিমিত হয়ে থাকে। এক ইঞ্চিও এদিক সেদিক হয় না। তার জিহ্বারও এ অবস্থা হয় এবং কলমেরও এ অবস্থা হয়। তাই যখন কেউ কিছু লিখবে, তখন আবেগ তাড়িত হয়ে সীমালংঘন করবে না এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করবে না। বরং যে শব্দই লিখবে, চিন্তা-ভাবনা করে লিখবে।

কোন উদ্দেশ্যে কথা বলছো?

এ কারণে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন যে, কম কথা বলো। মানুষ যখন প্রথম প্রথম এ পথে পা রাখে, তখন সর্বপ্রথম তাকে এ কাজ করতেই হয়। তাই হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে–

> 'মানুষের ইচ্ছাধীন যে কোন কথা এবং কাজ কোন না কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক

সূচিপত্র

কাজ এবং কথায় চিন্তা করা উচিত যে, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? যে কাজ এবং কথার কোন উদ্দেশ্য নেই, তা অর্থহীন। একইভাবে কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু তা উপকারী নয়, তাহলেও তা অর্থহীন। আর যদি সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিজের বা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে ঐ কাজ ও কথাও ক্ষতিকর বলে গণ্য হবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৮৬)

হযরত বলেন যে, যখনই কোন কথা বলবে, তখনই এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করবে যে, যে কথা আমি বলতে যাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য যদি সঠিক এবং শরীয়তসম্মত হয় তাহলে তো ঠিক আছে, কথা বলো। আর যদি উদ্দেশ্য সঠিক ও শরীয়তসম্মত না হয় বা ঐ কথার মধ্যে দুনিয়া বা আখেরাতের কোন ফায়দা না থাকে, তাহলে অহেতুক জিহ্বাকে ঐ কথায় জড়িয়ো না। নিজেকে বিরত রাখো, ঐ কথা বলো না। এ গুণ অর্জনের জন্যে এর অভ্যাস গড়তে হবে এবং অনুশীলন করতে হবে। তুমি তৈরি হয়ে যাও যে, জিহ্বাকে অন্যায়ভাবে ব্যহার করবো না, বরং নিয়ন্ত্রণ করবো। মানুষ যখন আল্লাহকে খুশি করার জন্য তৈরি হয়ে যায় এবং সংকল্প করে নিজের কাজকে সংশোধন করতে চায়, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে সাহায্যও করা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

হযরত থানভী (রহ.) এ আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন যে, 'যে সমস্ত লোক আমার পথে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদের হাত ধরে আমার পথে নিয়ে যাই।' (সূরা আনকাবুত : ৬৯)

হযরত বলেন যে, এ আয়াতে 'হিদায়াত' অর্থ 'পথ দেখানো' নয়, বরং 'গন্তব্যে পৌছানো'। অর্থাৎ, হাত ধরে গন্তব্যে পৌছিয়ে দেই। কিন্তু এর জন্যে সংকল্পতো করতে হবে। অগ্রসরতো হতে হবে। সংকল্প করার পর তিনিই বুঝিয়ে দেন যে, কী বলতে হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মিথ্যা থেকে পরহেয করা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) হিজরতের সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওদিকে মক্কাবাসীরা সাধারণ ঘোষণা দিয়েছিলো যে, যে কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত বা মৃত ধরে আনতে পারবে তাকে একশ' উট ইনআম দেওয়া হবে (নাউযুবিল্লাহ)। আপনারা অনুমান করে দেখুন,

বর্তমানেও একশ'টি উটের দাম কত হবে, তাহলে সে যুগে এর দাম কত ছিলো! এত বড় পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছিলো এবং চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলো এবং সর্বত্র গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই লুকিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর পূর্ব পরিচিত এক লোকের সাথে সাক্ষাত হয়। সে লোকটি এক শহরের অধিবাসী ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) সর্বজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন, বিধায় মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কও ছিলো বিস্তৃত। যাহোক, লোকটি হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সাক্ষাত পেয়ে তো ভীষণ খুশি। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনার সাথে ইনি কে? লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতো না বিধায় এ কথা জিজ্ঞাসা করলো। এখন আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) যদি সত্য সত্য বলে দেন যে, ইনি জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে সে অবস্থায় তা ছিলো খুবই বিপদজনক। কারণ, এভাবে শত্রুদের পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। আর তা হতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণ। আর উত্তর না দিয়েও কোন উপায় ছিলো না। কারণ, লোকটি তো সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছে। আর যদি অন্য কোন মানুষ বলে উত্তর দেয়, তাহলে তা হবে মিথ্যা। বলাবাহুল্য যে, তিনি ছিলেন "সিদ্দীকে আকবার" তথা মহা সত্যবাদী। তিনি মিথ্যা বলতে পারছিলেন না। তাঁর দ্বারা মিথ্যা বলার কল্পনাও সম্ভব ছিলো না। তাই তিনি আল্লাহর কাছে উত্তর চেয়ে থাকবেন। সুতরাং আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর অন্তরে এ উত্তর ঢেলে দেওয়া হয় যে, এভাবে বলো–

هَادٍ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ

অর্থাৎ, ইনি আমার পথ প্রদর্শক, আমাকে পথ দেখিয়ে থাকেন।

লক্ষ্য করুন, যখন কিনা বাঁচা-মরার প্রশ্ন, মৃত্যু চোখের সামনে নাচছে, এমন সময়ও 'সিদ্দীকের' মুখ থেকে সীমাতিক্রমকারী কোন শব্দ বের হয়নি। যখন কেউ নিজেকে আল্লাহ তাআলার হুকুমের অধীন বানিয়ে নেয়, তখন তাঁর পক্ষ থেকেই হিদায়াত দান করা হয় যে, এমন ক্ষেত্রে কী বলতে হবে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব নানুতবী (রহ.)-এর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

তাই ইংরেজদের পক্ষ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য ওয়ারেন্ট জারী করা হয়। সে সময় এ ধরনের আসামীদেরকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে চৌরাস্তায় ফাঁসির কাষ্ঠ ঝুলানো ছিলো। যাহোক, পুলিশ তাঁকে তালাশ করছিলো। হযরত মাওলানা একবার ছাত্তা মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন তিনি লুঙ্গি এবং সাধারণ মানের কোর্তা পরা ছিলেন। কেউ দেখে বুঝতেই পারবে না যে, তিনি বড় একজন আলেম। পুলিশ তালাশ করতে করতে ছাত্তা মসজিদে চলে যায়। পুলিশের লোকেরা ভেবেছিলো যে, তিনি যখন এত বড় কাজ করেছেন, তাই তিনি অনেক বড় আলেম হবেন এবং খুব জাঁকজমকের সঙ্গে জুব্বা-কুব্বা এবং পাগড়ি পরিহিত হবেন। কিন্তু হযরত মাওলানা ছাত্তা মসজিদে লুঙ্গি পরে বসেছিলেন। পুলিশের লোকেরা চিন্তাও করতে পারেনি যে, ইনিই মাওলানা কাসেম সাহেব। তারা মনে করেছে, এ লোক মসজিদের খাদেম হবে। এ চিন্তা করে তাঁরই কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, মাওলানা কাসেম সাহেব কোথায়? হযরত মাওলানা নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং একটু সরে এসে বলেন– এখনই তো এখানে ছিলো। কারণ, যদি বলে দেন যে, আমি কাসেম, তাহলে ধরা পড়ে যান। আর মিথ্যা বলতেও রাজি নন। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয়, অন্তরে উত্তর ঢেলে দেওয়া হয়। তখন পুলিশের লোকেরা এদিক সেদিক খোঁজ করে ফিরে চলে যায়।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহী (রহ.)ও আযাদীর লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁকে বন্দী করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তলব করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বলেন যে, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, তোমার নিকট অস্ত্র রয়েছে। বলো, তোমার কাছে অস্ত্র আছে?

হযরতের কাছে তো অস্ত্র ছিলো, যেগুলো তিনি গুপ্ত কক্ষে পুঁতে রেখেছিলেন। এখন যদি বলেন যে, অস্ত্র নেই, তাহলে মিথ্যা হয়। আর যদি সত্য বলেন যে, অস্ত্র আছে, তাহলে ফাঁসি কাষ্ঠ সামনে ঝুলছে। অথচ এমন সময়, যখন কিনা প্রাণের আশংকা দেখা দেয়, তখন কতক সময় মিথ্যা বলারও অনুমতি হয়ে যায়। হযরতের হাতে তখন তাসবীহ ছিলো। তিনি তাসবীহ উপরের দিকে উঠিয়ে বলেন যে, আমার অস্ত্র তো এটি। মাত্র এসব কথা হচ্ছিলো, এমন সময় এক গ্রাম্য লোক সেখানে এসে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে যে, আরে! তোমরা কাকে ধরে এনেছো? এতো আমাদের মসজিদের মুয়াযযিন। ম্যাজিস্ট্রেট যখন দেখলো যে, এ লোক

সূচিপত্র

তো তাসবীহ্ হাতে নিয়ে ঘুরছে, আর গ্রাম্য লোকটিও বলছে যে, এ লোক মুয়াযযিন তখন সে তাঁকে ছেড়ে দেয়। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এভাবেই সাহায্য করা হয়।

সারকথা

মোটকথা, মানুষ যখন সংকল্প করে যে, আমি আল্লাহ্র দেওয়া এ মেশিনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবো এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি মতো ব্যবহার করবো, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হয়। তাই নিজের পক্ষ থেকে আগে সংকল্প করো, পণ করো এবং এর জন্যে চেষ্টা-ফিকির করো, তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে একথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

আটষট্টিতম মজলিস

কৃপণতা ও তার প্রতিকার

কৃপণতা ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

কার্পণ্য সম্পদের মহব্বতের পরিণতি

বিভিন্ন আধ্যাত্মিক রোগের আলোচনা চলছে। হযরত থানভী (রহ.) এখান থেকে 'কৃপণতা'র আলোচনা শুরু করেছেন। 'কৃপণতা'ও আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের অন্যতম। সাধারণ মানুষ যাকে কঞ্জুসী বা কিপ্টেমী বলে। মানুষের অন্তরে সম্পদের মহব্বত যখন এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে, পয়সা হাত থেকে বের করতে জান বের হয়ে যায়, তাকেই বলে 'কার্পণ্য'। এটা বড় মন্দ চরিত্র। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এর নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। কৃপণতার ফলে মানুষ তার উপর অর্পিত ফরয-ওয়াজিবসমূহে গাফলতী করে এবং গোনাহে লিপ্ত হয়।

কৃপণতার পরিণতি

কৃপণতা মানুষের মধ্যে এ মানসিকতা সৃষ্টি করে যে, যে সম্পদ হাতে এসেছে, তা এখন আর অন্য কোথাও না যাক। এর পরিণতি এই হয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যেখানে খরচ করা জরুরী, যেমন যাকাত– যা কিনা সম্পদের মধ্যে ওয়াজিব হক– এবং স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ– এ সমস্ত ক্ষেত্রেও মানুষ তখন আর সঠিকভাবে ব্যয় করে না। কৃপণতার একটি পরিণতি তো এই হয়। এর আরেকটি পরিণতি এই হয় যে, অন্তরে এই মানসিকতা জন্মায় যে, যে কোন উপায়ে আমাদের কাছে পয়সা আসুক। তখন মানুষ জায়েয ও নাজায়েজের পরোয়া করে না। ব্যস, সম্পদ আসছে, আসতে দাও। তা হালাল পন্থায় আসুক বা হারাম পন্থায় আসুক তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। সম্পদ হারাম পন্থায়

আসলে আর ঐ লোক মওলভী হলে, তখন সে ঐ হারাম মালকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হালাল বানিয়ে নেয়। যাতে এ হারাম মাল তার কাছেই থেকে যায়, অন্য কারো কাছে চলে না যায়।

কার্পণ্য দু'ধারী তরবারী

কৃপণতা একদিকে ওয়াজিব হক পরিশোধ করতে প্রতিবন্ধক হয়, অপর দিকে গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধকারী হয় এবং মানুষের মধ্যে হারাম উপায়ে সম্পদ লাভের চিন্তা পয়দা করে। তাই কৃপণতা হলো দু'ধারী তরবারী। সে এদিক দিয়েও কাটে, আবার ওদিক দিয়েও কাটে। গোনাহের কাজেও লিপ্ত করে, আবার ফরয-ওয়াজিব হক আদায় করতেও ত্রুটি করায়। তাই এটি একটি মারাত্মক রোগ। এর চিকিৎসা করা খুবই জরুরী। হযরত থানবী (রহ.) 'আনফাসে ঈসা'র এ জায়গায় যেসব কথা বলেছেন, তার দ্বারা এ রোগ সম্পর্কে কিছু মূলনীতি জানা যায়।

'কিতাবুল বুখালা'

কৃপণতার বিস্তারিত আলোচনা অনেক দীর্ঘ। প্রসিদ্ধ সুসাহিত্যিক আল্লামা জাহিয (রহ.) এ বিষয়ে 'কিতাবুল বুখালা' নামে দু'শ পৃষ্ঠার একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। তাতে তিনি কৃপণদের বর্ণনা দিয়েছেন। দুনিয়াতে কেমন কেমন কৃপণ হয়ে থাকে। তাদের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য কী হয়ে থাকে। তিনি তাদের বিস্ময়কর বিস্ময়কর অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ কিতাব পড়লে কার্পণ্যের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে জানা যায়। কোন কোন বৃত্তে কার্পণ্যের আনাগোনা রয়েছে, তার কত বিচিত্র রূপ রয়েছে, কী কীভাবে এ কার্পণ্য মানুষের সর্বনাশ করে থাকে ইত্যাদি বিষয় এটি পাঠ করার দ্বারা জানা যায়। এ কিতাবটি সাহিত্যের 'রাজকর্ম' বলে পরিগণিত হয়।

এছাড়া 'ইহইয়াউল উলূম' কিতাবেও ইমাম গাযালী (রহ.) কৃপণতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'আনফাসে ঈসা' নামক এ কিতাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা সাহেব (রহ.) কৃপণতা সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.)-এর যে সমস্ত উক্তি তুলে ধরেছেন, তা এক পৃষ্ঠাতেই শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো তিনি হযরত থানভী (রহ.)-এর বিভিন্ন ওয়ায ও মালফূয থেকে নকল করে এখানে সংকলিত করেছেন। এ এক পৃষ্ঠাতে এ রোগ সম্পর্কিত বুনিয়াদী এবং মৌলিক সব কথা তিনি সন্নিবেশিত করেছেন।

এক ব্যক্তি চিঠি লিখলো যে,
'পয়সা ব্যয় করতে মন বড় সংকীর্ণ ও আড়ষ্ট হয়ে আসে।'
হযরত থানভী (রহ.)-এর উত্তর এই দেন যে–
'ওয়াজিব কোন হক ছুটে না গেলে কোন চিন্তা নেই।'

সংশোধনের উপায় নিজের দোষ প্রকাশ করা

আল্লাহর যে সকল বান্দা নিজের ইসলাহের জন্যে কোন শায়খের শরণাপন্ন হন, তারা নিজেদের একেকটি বিষয় শায়খকে লিখে জানান। কারণ, শায়খের শরণাপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যই হলো, তুমি নিজের মধ্যে যে সমস্ত অবস্থা উপলব্ধি করো, সেগুলো শায়খকে অবহিত করো। তখন শায়খ পর্যবেক্ষণ করে বলবেন যে, বাস্তবিকই এটি কোন রোগ কিনা। যদি তা রোগ হয়ে থাকে তাহলে শায়খ তার চিকিৎসা করবেন। তুমি যদি না জানাও তাহলে শায়খের তো আর গায়বের ইলম নেই। তাই শায়খকে নিজের অবস্থাসমূহ জানাতে হয়। আল্লাহ তাআলা যখন কারো মধ্যে নিজের ইসলাহের ফিকির দান করেন, তখন তার চোখ নিজের অবস্থা এবং দোষ-ত্রুটির দিকে ধাবিত হয়। আর এ ফিকির পয়দা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গাফলতের মধ্যে মানুষ বুঝতেই পারে না যে, কী হচ্ছে? সঠিক পথে চলছি, নাকি ভুল পথে? মনের মধ্যে যেসব কথা ও চিন্তা উদয় হয়, সেগুলো সঠিক, নাকি ভুল। এসবের কোন পরোয়াই থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন ফিকির দান করেন, তখন মানুষের অন্তরে 'খটকা' জাগে।

অন্তরে প্রশ্ন জাগা

আমার শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব আরেফী (কুঃ সিঃ) বলতেন যে, 'তাকওয়া' অর্থ 'খটকা'। অর্থাৎ, অন্তরে এ সংশয় সৃষ্টি হওয়া যে, আমি যে কাজ করছি তা সঠিক, না কি অঠিক? আমার অন্তরে যে চিন্তা আসছে তা সঠিক, নাকি অঠিক? এ সংশয়ই সফলতার চাবিকাঠি। কারণ, যখন কোন কাজ করার সময় অন্তরে খটকা সৃষ্টি হবে, আর শায়খকে তা অবহিত করবে, তখন শায়খ তার ব্যবস্থাপত্র দিবে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, ঐ আল্লাহর বান্দার অন্তরে খটকা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি যখন কোথাও পয়সা খরচ করি, তখন অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়। অন্তর ব্যথিত হয় যে, পয়সা চলে যাচ্ছে। এটা তো কৃপণতার ব্যাধি নয়? যদি এটা ব্যাধি হয়ে থাকে তাহলে শায়খের নিকট এর চিকিৎসা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

পয়সা ব্যয় হওয়ার চিন্তা গোনাহ্ নয়

উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) লিখেন যে, 'যদি ওয়াজিব কোন হক ছুটে না যায়, তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।' এ কথার অর্থ এই যে, পয়সা ব্যয় হওয়ার কারণে অন্তরে যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ব্যথা হচ্ছে, বেদনা হচ্ছে– এ দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বেদনা কোন গোনাহ নয়। কারণ, এটি মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত একটি বিষয়। এর উপর মানুষের কোন দখল নেই। আর আল্লাহ তাআলা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কোন বিষয়ে শাস্তি প্রদান করেন না। তবে যদি এ দুঃখ-বেদনা কোন ওয়াজিব হক আদায়ে প্রতিবন্ধক হয়, যেমন যাকাত ফরয ছিলো, তা আদায় করলো না। সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব ছিলো, তা দিলো না। স্ত্রী-সন্তানদের যে পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেওয়া উচিত ছিলো তা দিলো না, বা কোন চাকর রেখেছিলো, তার প্রাপ্য যথাযথভাবে দিলো না। এ দুঃখ-বেদনার ফলে যদি এমন ওয়াজিব হক ছুটে যায়, তাহলে এটি গোনাহ।

শুধু মালের মহব্বত ক্ষতিকর নয়

ওয়াজিব হক নষ্ট হওয়ার মধ্যে কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়াও অন্তর্ভুক্ত। যেমন নাজায়েয ও হারাম কাজের মাধ্যমে পয়সা উপার্জন করলো। বিধায় যতক্ষণ পর্যন্ত কোন হারাম ও নাজায়েয কাজে লিপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র অন্তর সংকীর্ণ হওয়া গোনাহের কারণ হয় না। এ কারণেই উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, যদি ওয়াজিব কোন হক ছুটে না যায়, তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ, কৃপণতার আসল অর্থ হলো, মালের মহব্বত। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন যে, আমি তোমাদের অন্তরে মালের মহব্বত দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

'মাখলুককে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী।'

(সূরা আলে-ইমরান : ১৪)

আল্লাহ তাআলা যখন সম্পদের মহব্বত দিয়েছেন, তখন তা অন্তরে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের ভিতর মৌলিকভাবে কৃপণতার উপাদান সৃষ্টি করেছেন। তাই শুধু কৃপণতার উপাদান থাকা কোন গোনাহের বিষয় বা পাকড়াওযোগ্য ব্যাপার নয়। তবে পাকড়াওযোগ্য বিষয় তখন হবে, যখন মানুষ এই মহব্বতকে গোনাহের কাজে ব্যবহার করবে বা ঐ মহব্বত মানুষকে গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করবে বা ওয়াজিব হক নষ্ট করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

হযরত উমর ফারূক (রাযি.)-এর দু'আ

আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.)-এর নিকট শুনেছি যে, হযরত উমর ফারূক (রাযি.)-এর যামানায় যখন ইরান বিজয় হলো এবং পারস্য সম্রাট কিসরার মহল মুসলমানদের হাতে এলো, তখন মসজিদে নববীর মধ্যে স্বর্ণের এত বড় স্তুপ হলো যে, হযরত উমর ফারূক (রাযি.) ঐ স্তুপের পেছনে আড়াল হয়ে গেলেন। স্বর্ণের এ স্তুপ দেখে হযরত উমর ফারূক (রাযি.) বলেন যে– 'হে আল্লাহ! আমি বলি না যে, এ সম্পদের মহব্বত আমাদের মধ্যে নেই এবং এ দু'আও করি না যে, এ মহব্বত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাক। তবে আমরা এ দু'আ করি যে, এ সম্পদের মহব্বত যেন আপনার দ্বীনের পথে ফিতনার কারণ না হয়।

তিনি একথা বলেননি যে, মালের মহব্বত আমাদের অন্তর থেকে বের করে দিন। কারণ, এ সম্পদ তো আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। এ সম্পদকেই আল্লাহ তাআলা 'ফযলুল্লাহ' তথা আল্লাহর অনুগ্রহ বলেছেন। এ সম্পদকেই 'খাইর' তথা শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর বলেছেন। এ সম্পদকেই তিনি جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا 'তোমাদের জীবনধারনের উপকরণ' বলেছেন। বিধায় সম্পদের ঘৃণা কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং মৌলিকভাবে সম্পদ কাজের জিনিস। এর উপরেই আল্লাহ তাআলা মানব জীবনের স্থিরতা রেখেছেন। তাই আমরা সম্পদের প্রতি ঘৃণা কামনা করি না এবং এর মহব্বতের বিলুপ্তিও চাই না। তবে হে আল্লাহ! আমরা এটা কামনা করি যে, এ সম্পদ যেন আমাদেরকে গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ না করে এবং আমাদের দ্বীনকে যেন কোন ফিতনায় আক্রান্ত না করে।

সম্পদের কোন্ ভালোবাসা গোনাহ?

এতে জানা গেল যে, অন্তরে মালের সহজাত মহব্বত থাকা গোনাহও নয় এবং ক্ষতিকরও নয়। তবে যদি মালের মহব্বত এ পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, তা মানুষকে সঠিক জায়গায় ব্যয় করতে বাধা দেয়, তবে তা কৃপণতা, যেটা হারাম এবং আধ্যাত্মিক রোগ। এখন লক্ষ্য করুন যে, এ মালফূযে হযরত থানভী (রহ.)

ঐ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, 'যদি ওয়াজিব হক ছুটে না যায় তাহলে কোন দুশ্চিন্তা নেই।' তবে একথা খুব ভালো করে বুঝুন যে, সব মানুষের জন্যে এক ব্যবস্থা হয় না। ডাক্তার প্রত্যেক রোগীর অবস্থা অনুপাতে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকে। সুতরাং হযরত থানভী (রহ.) এ ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে, সে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে রয়েছে। ভারসাম্যের সীমা অতিক্রম করেনি। এজন্যে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং কোন বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করেননি।

এটি বিপদের ঘণ্টা

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন যে, সম্পদের ভালোবাসা এবং সম্পদ ব্যয় করতে অন্তরে কষ্ট লাগা দোষনীয় এবং গোনাহ নয়। তবে এমতাবস্থায় এ আশঙ্কা রয়েছে যে, এক সময় এ অবস্থা বৃদ্ধি পেয়ে কৃপণতার সীমানায় পৌঁছে যাবে এবং যে কোন সময় ওয়াজিব হক আদায় করার পথও বন্ধ করে দিবে। তাই মাল খরচ করতে অন্তর ব্যথিত হওয়া বিপদের ঘণ্টা। এ বিপদের ঘণ্টার চিকিৎসা এই যে, মালের এ মহব্বতকে কিছুটা কমাতে হবে। যাতে এ মহব্বত সীমান্ত থেকে এতটুকু দূরে থাকে যে, সীমান্ত অতিক্রম করার আর আশঙ্কা না থাকে। তাই ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন যে, এ মহব্বতকে এ পরিমাণ কমাও যে, হয় এ ব্যথা সম্পূর্ণ খতম হয়ে যায়, কিংবা না থাকার পর্যায়ে চলে যায়। চর্চা করতে থাকলে এ অবস্থা অর্জন হবে।

ইমাম যুহরী (রহ.)-এর চোখে দিরহাম

ইমাম যুহরী (রহ.) উঁচু মাপের একজন মুহাদ্দিস। ইমাম মুয়াম্মার বিন রাশেদ (রহ.) তাঁর শাগরিদদের অন্যতম। তাঁর এ শাগরিদ তাঁর সম্পর্কে বলেন যে–

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عِنْدَهُ مِمَّا كَانَتْ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ، كَانَتِ الدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْرِ

'আমি আজ পর্যন্ত এমন কোন মানুষ দেখিনি, যার অন্তরে দুনিয়া এত অধিক মূল্যহীন, যত অধিক মূল্যহীন ইমাম যুহরীর অন্তরে ছিলো। তাঁর কাছে দিরহাম ছিলো (পশুর বিষ্টা) লাদির মত।'

অর্থাৎ, লাদির যেমন কোন মূল্য নেই, এমনিভাবে তাঁর নিকট দিরহামেরও কোন মূল্য ছিলো না। অর্থাৎ, দিরহামের প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। কোন মহব্বতই ছিলো না।

মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ (রহ.) এবং দুনিয়া

হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানভী (রহ.)-এর জীবনীতে আছে যে, তিনি যখন বাজারে গিয়ে কোন জিনিস ক্রয় করতেন, তখন পয়সার থলে দোকানদারকে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, তুমি এ জিনিসের দাম এ থলে থেকে নিয়ে নাও। নিজে গুণে দিতেন না। তিনি চিন্তা করতেন যে, যতটুকু সময় থলে থেকে পয়সা বের করে তা গোনার পিছনে ব্যয় হবে, ততটুকু সময় আল্লাহ তাআলার যিকিরে কেন ব্যয় করবো না। একবার এক চোর দেখে যে, তাঁর কাছে পয়সার একটি থলে রয়েছে। তিনি থলেটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। চোর পিছন দিক থেকে এসে থলেটি নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি কোন প্রকার বাধা না দিয়ে থলে ছেড়ে দেন এবং পিছন দিক ফিরেও তাকান না যে, কে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো।

এবার চোর থলে নিয়ে ঐ এলাকা থেকে বের হতে চাচ্ছে, কিন্তু রাস্তাই পাচ্ছে না। বেচারা গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। সে অস্থির হয়ে একবার এ গলিতে প্রবেশ করে, আবার আরেক গলিতে প্রবেশ করে। কিন্তু কোনভাবেই বের হওয়ার রাস্তা পায় না। অবশেষে তার ধারণা হয় যে, এসব কিছু আল্লাহর ঐ ওলীর সঙ্গে অন্যায় আচরণের বিপদ। তখন ঐ চোর মিয়াঁজীর বাড়িতে গিয়ে দরজায় করাঘাত করে। তিনি ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কে? চোর বলে যে, আপনার থলে নিয়ে নিন। মিয়াঁজী বলেন যে, আমি এ থলে নিবো না। কারণ, যখন তুমি ছিনিয়ে নিয়েছিলে তখনই আমি ওটা তোমাকে দান করে দিয়েছি। তাই আমি আর এ থলের মালিক নই। চোর বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে নিয়ে নিন। কিন্তু তিনি বলেন যে, না আমি নিবো না। অবশেষে চোর বলে যে, হযরত! আমি বের হওয়ার রাস্তা পাচ্ছি না। আপনি দু'আ করুন, যাতে রাস্তা পেয়ে যাই। তখন তিনি বলেন যে, ঠিক আছে চলে যাও, আমি তোমার জন্যে দু'আ করছি। তখন চোর থলে নিয়ে চলে যায়।

মালের মহব্বত থেকে একটু সরে থাকো

মোটকথা, আল্লাহর এমন বান্দাও রয়েছেন, যাঁদের অন্তর থেকে মালের মুহাব্বত একদম খতম হয়ে গেছে। আমাদেরও হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে হবে, আর না হয় মালের মহব্বত কমপক্ষে এতটুকু পরিমাণ কম হতে হবে যে, বিপদজনক সীমানা থেকে দূরে থাকবে। এ কারণে ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন যে, মালের মহব্বত থেকে একটু সরে থাকো। এ ব্যাপারে ইমাম গাযালী (রহ.) দু'টি কথা বলেছেন।

এ অবস্থাকে খারাপ মনে করো এবং দু'আ করতে থাকো

১. প্রথম এই যে, যখন তুমি অনুভব করবে যে, পয়সা হাতছাড়া হওয়ার কারণে অন্তর ব্যথিত এবং সংকুচিত হচ্ছে, তখন একটি কাজ এই করো যে, অন্তরের এ অবস্থাকে খারাপ মনে করো। মনে করো যে, এটি কোন ভালো অবস্থা নয়।

২. দ্বিতীয় কাজ এই করো যে, আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করতে থাকো যে, হে আল্লাহ! মালের মহব্বতের এ সাপ যেন আমাকে দংশন না করে এবং এটি আমার জন্যে কোন এক সময় বিপদের কারণ না হয়ে যায়। তাই হে আল্লাহ! আমার মালের এ মহব্বতকে সীমালংঘন করা থেকে প্রতিহত করুন এবং একে সীমার মধ্যে রাখুন। যদি এভাবে দু'আ করতে থাকো, তাহলে ইনশাআল্লাহ এ মহব্বত ক্ষতিকর হবে না।

তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন

তবে হযরত থানভী (রহ.) এ মালফূযে ঐ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, এ দুঃখ ও বেদনা মন্দ বা নাজায়েয নয়। তিনি ঐ ব্যক্তিকে এ বেদনার জন্যে সতর্ক করার জরুরত মনে করেননি। এর কারণ হলো, ঐ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। তিনি জানতেন যে, এ ব্যক্তি মালের মহব্বতে সম্মুখে অগ্রসর হবে না। অন্য কোন ব্যক্তি হলে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিতেন না। বরং তাকে সতর্ক করে বলতেন যে, এ বেদনা তো মারাত্মক বিপদজনক বিষয়। এর সংশোধনের ফিকির করো। শায়খের আসল কাজই হলো, তিনি দেখবেন যে, কাকে কোন সময় কী ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায়।

এটি ভারসাম্যপূর্ণ মহব্বত

অপর এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)কে চিঠিতে লিখেন যে–

> 'সম্পদ ব্যয় করতে এক প্রকারের চাপ অনুভূত হয়। নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হওয়াকে ভয় পাই। যদিও ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করতে ত্রুটি করি না।'

উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে–

> 'এটি মালের নিষিদ্ধ মহব্বত নয়, এটি ভারসাম্যপূর্ণ মহব্বত।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯০)

এক ব্যক্তি লিখে যে, যখন আমি পয়সা খরচ করি, তখন অন্তরে চাপ অনুভব করি এবং পয়সা খরচ করতে ভয় পাই যে, একদম নিঃস্ব হয়ে না যাই, তখন

সূচিপত্র

আবার ঋণ নিতে হবে। অবশ্য ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি না। উত্তরে হযরত বলেন যে, এটি মালের নিষিদ্ধ মহব্বত নয়, বরং ভারসাম্যপূর্ণ মহব্বত। কারণ, যখন ওয়াজিব হকসমূহে ত্রুটি হচ্ছে না, তখন উদ্দিষ্ট বস্তু তার হাসিল রয়েছে। সম্পদের যে ভালোবাসা নিন্দনীয়, আধ্যাত্মিক রোগ এবং গোনাহ তা তার মধ্যে নেই। তাই এটি দোষনীয় নয়। তবে এরপরও মানুষের সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এমন যেন না হয় যে, এ ভালোবাসাই ক্রমে ক্রমে মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করার মাধ্যম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাদেরকে সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উনসত্তরতম মজলিস

সব কৃপণতাই নিন্দনীয় নয়

সব কৃপণতাই নিন্দনীয় নয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

সব কাজ আল্লাহ্ তাআলার জন্যে হওয়া উচিত

যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাধি মানুষের জন্যে ধ্বংসাত্মক, সেগুলোর আলোচনা চলছে। ঐ সমস্ত ব্যাধির মধ্যে অন্যতম ব্যাধি কৃপণতা। যার সামান্য বিশ্লেষণ গতকাল আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কেই হযরত থানভী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা এভাবে করেছেন যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

'যে আল্লাহর জন্যে দান করলো এবং আল্লাহর জন্যে বাধা দিলো তার ঈমান পরিপূর্ণ হলো।'

এ হাদীসে 'দান করা' এবং 'বাধা দেওয়া' উভয়ের সঙ্গে 'আল্লাহর জন্যে' হওয়ার শর্ত রয়েছে। এর দ্বারা জানা গেলো যে, বদান্যতা নিঃশর্তভাবে প্রশংসনীয় নয় এবং কৃপণতাও নিঃশর্তভাবে নিন্দনীয় নয়। বরং আল্লাহর জন্যে হলে উভয়টি নন্দিত, অন্যথায় উভয়টি নিন্দিত। মোটকথা, সমস্ত চরিত্রই স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত। আর কোন চরিত্রই সৃষ্টিগত স্বভাব পর্যায়ে নিন্দিত বা প্রশংসিত নয়। বরং প্রয়োগ ক্ষেত্রের ভিত্তিতে তা প্রশংসা ও নিন্দার বিষয় হয়।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯০)

সব কৃপণতাই নিন্দনীয় নয়

'কৃপণতা'র অর্থ হলো, 'সম্পদ ব্যয় করতে বিরত থাকা'। এর বিপরীত হলো, বদান্যতা। 'বদান্যতা' অর্থ হলো, খোলা মনে সম্পদ ব্যয় করা, মন সংকীর্ণ না করা। সাধারণভাবে কৃপণতাকে নিন্দনীয় ও মন্দ চরিত্র এবং বদান্যতাকে প্রশংসনীয় ও উত্তম চরিত্র মনে করা হয়। এ মালফূযে হযরত বলেন যে, এ ধারণা ঠিক নয়। সব সময় মাল আটকে রাখা মন্দ নয় এবং সব সময় মাল খরচ করা ভালো নয়। বরং কোন কোন সময় সম্পদ আটকে রাখাও উত্তম, প্রশংসাযোগ্য ও সওয়াবের উপযুক্ত হয়ে থাকে। আর কোন কোন সময় সম্পদ ব্যয় করাও মন্দ কাজ, বরং গোনাহের কাজ হয়ে থাকে, বা কমপক্ষে নিন্দনীয় হয়ে থাকে।

শুধু আল্লাহর জন্যে সম্পদ ব্যয় করো

এ কথার দলিল স্বরূপ হযরত থানভী (রহ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীস তুলে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে মূলনীতি বলে দিয়েছেন যে-

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

'যে আল্লাহর জন্যে দান করলো এবং আল্লাহর জন্যে বাধা দিলো তার ঈমান পরিপূর্ণ হলো।' (তিরমিযী শরীফ)

হাদীসের মধ্যে আরো কথা রয়েছে, তবে এখানে একথাগুলো বলাই উদ্দেশ্য। এ হাদীসের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে দেয় এবং আল্লাহর জন্যে আটকিয়ে রাখে, সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো। অর্থাৎ, যখন দিচ্ছে তো আল্লাহর জন্যে দিচ্ছে, আর যখন না দিয়ে আটকিয়ে রাখছে, তখনও আল্লাহর জন্যেই আটকিয়ে রাখছে। 'দেওয়ার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে যেখানেই খরচ করছে- সে গরীব, মিসকীন ও অভাবীদেরকে দান করুক, যাকাত দিক বা স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণের পিছনে ব্যয় করুক, তাদের জন্যে পানাহারের ব্যবস্থা করুক বা নিজের জন্যেই ব্যয় করুক সব জায়গায় আল্লাহ তাআলাকে খুশি করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন, কোন ফকীরকে পয়সা দিচ্ছে তো আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্যেই দিচ্ছে। মানুষকে দেখানো তার উদ্দেশ্য নয়। স্ত্রী-সন্তানের পিছনে খরচ করছে তো একথা চিন্তা করে খরচ করছে যে, আল্লাহ তাআলা এদের হক আদায় করা আমার দায়িত্ব বানিয়ে দিয়েছেন, তাই আমার কর্তব্য তাদের হক আদায় করা। আমি এদের পিছনে খরচ করে সে কর্তব্য পালন করছি। তখন এ খরচও আল্লাহ তাআলার জন্যে হলো এবং 'আল্লাহর জন্যে দান করার' অন্তর্ভুক্ত হলো।

নিজের জন্য ব্যয় করাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে

এমনিভাবে যা কিছু সে নিজে খাচ্ছে, তার মধ্যেও তার এ নিয়ত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে জান দিয়েছেন, তা আমার নিকট আমানত। আমার জানেরও আমার উপর হক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে–

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

'তোমার নফসেরও তোমার উপর হক রয়েছে।'

এখন যদি আমি আমার নফসকে না খাওয়াই, আর অনাহারের কারণে সে মারা যায় তাহলে এটি আত্মহত্যা হবে এবং হারাম মৃত্যু হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমার উপর আমার নফসের হক রেখেছেন। তাই এ নফসকে আমি যা কিছু খাওয়াচ্ছি তা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে, তাঁর হুকুম পালনার্থে এবং তাঁকে খুশি করার উদ্দেশ্যে খাওয়াচ্ছি। এ সবই আল্লাহর জন্যে দান করার অন্তর্ভুক্ত।

বাজার থেকে সদাই ক্রয় করাও আল্লাহর জন্যে হয়ে থাকে

বাজারে কিছু খরিদ করছে– যদিও বাহ্যত তা নিজের লাভের জন্য খরিদ করছে। কারণ, সে তা নিজের জন্যে খরিদ করছে বা নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্যে খরিদ করছে বা কোন অভাবী ও মুখাপেক্ষী লোককে দেওয়ার জন্যে খরিদ করছে। এ তিনটির কোন একটি অবশ্যই হবে। আর এ তিনটির প্রত্যেকটিই এমন যে, নিয়ত বিশুদ্ধ করলে তা আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন যে, কাজ তো নিজের জন্যে বা নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্যে করা হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন যে, একটু দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করো, তাহলে এসব কিছু আমার জন্যে হয়ে যাবে এবং আমার জন্যে দান করার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়াও আল্লাহর জন্যে হয়ে থাকে

এজন্যেই হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে–

حَتَّى اللُّقْمَةِ الَّتِى تَرْفَعُهَا إِلَى فِى امْرَأَتِكَ وَهِىَ صَدَقَةٌ

'এমনকি খাবারের গ্রাস, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দাও, তাও দান বলে গণ্য।' (বুখারী শরীফ)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তা মাটিকে স্বর্ণে পরিণত করে। খাবার খাওয়া হচ্ছে নিজের উপকারের জন্যে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন যে, আমি লিখে নিচ্ছি যে, এ খাবার তুমি আমার জন্যে খেয়েছো। তাই তোমার এ আমলকেও তোমার নেক আমলের মধ্যে এবং সওয়াবের আমলের মধ্যে লিপিবদ্ধ করছি। আখেরাতে যখন হিসাব হবে, তখন তোমার এ পানাহারও তোমার নেক আমলের একাউন্টের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এ বাধা দেওয়াও আল্লাহর জন্যে

এ হাদীসে দ্বিতীয় বাক্য বলা হয়েছে, مَنَعَ لِلّٰهِ 'যদি বাধা দেয় তাহলে আল্লাহর জন্যে বাধা দেয়।'

অর্থাৎ, পয়সা খরচ করার একটি ক্ষেত্র এসেছে কিন্তু সেখানে পয়সা দেয়নি, বরং আল্লাহর জন্যে আটকিয়ে রেখেছে। যেমন, সাধারণ সভায় কোন কাজের জন্যে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। সবাই প্রতিযোগিতামূলক চাঁদা দিচ্ছে। তখন তোমার মনে এ চিন্তা হলো যে, চাঁদা দিতে তো মন চাচ্ছে না কিন্তু সবাই প্রতিযোগিতামূলক চাঁদা দিচ্ছে, এখন আমি যদি না দেই তাহলে আমার মান যাবে। ভর মজলিসের মধ্যে আমার বদনাম হবে যে, সবাই দিচ্ছে আর এ কৃপণ বসে আছে। মানুষ আমাকে কৃপণ বলবে। একথা চিন্তা করে চাঁদা দেওয়ার ইচ্ছা করলো এবং পকেট থেকে পয়সা বের করলো কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলো যে, এখন যদি আমি চাঁদা দেই, তাহলে এটা মানুষকে দেখানোর জন্যে চাঁদা দেওয়া হবে, আল্লাহ তাআলার জন্যে হবে না। এভাবে চাঁদা দেওয়া তো জায়েয নেই এবং এতে সওয়াবও হবে না। এ চিন্তা আসার পর সে পয়সা আবার পকেটে রেখে দিলো। এমতাবস্থায় চাঁদা না দিয়ে পয়সা পকেটে রেখে দেওয়া 'আল্লাহর জন্যে আটকিয়ে রাখা'র অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এ আটকিয়ে রাখা আল্লাহকে খুশি করার জন্যে হয়েছে। সে ভেবেছে যে, দুনিয়াবাসী আমাকে কৃপণ বলে বলুক, কিপ্টে বলে বলুক, কিন্তু এ সময় দান করা যেহেতু জায়েয নেই, তাই আমি আটকিয়ে রাখলাম। তাই এটিও 'আল্লাহর জন্যে আটকিয়ে রাখা'র অন্তর্ভুক্ত।

বিবাহ-শাদীতে উপহার দেওয়া

বর্তমান যুগে বিবাহ-শাদীতে যে সমস্ত উপহার-উপঢৌকন দেওয়া হয় এবং রীতিমত তা লিখে রাখা হয় যে, কে কার বিবাহে কী পরিমাণ উপহার দিলো। পরবর্তীতে অপর ব্যক্তি তারচেয়ে বাড়িয়ে বা সমান সমান উপহার দেয়। পবিত্র কুরআন একে হারাম বলেছে। তাই এমন ক্ষেত্রে দিবে না।

তবে যদি অন্তরে এ বাসনা জাগে যে, এ ব্যক্তি আমার ভাই। তার ঘরে আনন্দানুষ্ঠান হচ্ছে, তাই তাকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা জাগছে। তাহলে তো সুবহানাল্লাহ! খুব ভালো কথা। উপহার-উপঢৌকন দাও। কিন্তু উপহার দিতে মন তো চাচ্ছে না। কারণ, হাতে পয়সা নেই বা তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও নেই, কিন্তু সে যেহেতু আমার অমুক অনুষ্ঠানে এতো টাকা দিয়েছিলো, তাই তার অনুষ্ঠানেও আমার দেওয়া জরুরী বা আমি কোন উপহার না দিলে পুরো সমাজে নিন্দিত হবো। সবাই বলবে যে, লোকটি এমন হাড়কিপ্টে যে, কারো বিবাহ-শাদী হলেও বা অনুষ্ঠান হলেও তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। একথা চিন্তা করে উপহার দিলো। এ ধরনের উপহার-উপঢৌকন দেওয়া নাজায়েয এবং হারাম।

এটিও আল্লাহর জন্যে 'না দেওয়া'র অন্তর্ভুক্ত

আর যদি সে চিন্তা করে যে, কেউ আমাকে কিপ্টে বলে বলুক, কেউ কৃপণ বলে বলুক, কেউ অসভ্য বলে বলুক, কেউ অভদ্র বলে বলুক, আমাকে তো আমার আল্লাহকে খুশি করতে হবে। আমি আমার আল্লাহকে খুশি করার জন্যে এক্ষেত্রে কিছু দিবো না। এ না দেওয়া 'আল্লাহর জন্যে না দেওয়া'র অন্তর্ভুক্ত। বা ঐ ব্যক্তির জানা আছে যে, অমুক ব্যক্তিকে আমি যদি পয়সা দেই তাহলে সে তা নাজায়েয এবং অন্যায় কাজে ব্যবহার করবে। এমন ব্যক্তিকে উপহার, উপঢৌকন দেওয়া বা দান করা জায়েয নেই। একথা চিন্তা করে সে পয়সা দিলো না। এটিও 'আল্লাহর জন্যে না দেওয়া'র অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদেরকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় দেওয়া উচিত

এজন্যে হযরত থানভী (রহ.) এ মালফূযে বলেছেন যে, দেওয়াও সব সময় ভালো নয়, আবার না দেওয়াও সব সময় মন্দ নয়। বরং তা নির্ভর করে নিয়ত ও অবস্থার উপর। অনেক সময় দেওয়াই গোনাহ। যেমন, উপরে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো। আর কোন কোন অবস্থায় না দেওয়া সওয়াবের কাজ। এর আসল ভিত্তি এর উপর যে, দেওয়া শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে হচ্ছে কিনা? এবং এ দেওয়া আল্লাহ তাআলার জন্যে হচ্ছে কিনা? যেখানে শরীয়ত বিরোধীভাবে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে দেওয়া অর্থহীন। আর দেওয়ার সময় আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার নিয়ত থাকতে হবে। যশ-খ্যাতি ও লোক দেখানোর নিয়ত না থাকতে হবে। যখন এ দুই শর্ত পাওয়া যাবে, তখন দেওয়া সওয়াবের কাজ হবে, আর যখন এ দুই শর্ত না দেওয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে, তখন না দেওয়াই সওয়াবের কাজ হবে।

সম্পদের দিকে মনের টান সহজাত বিষয়

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করলো, সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো। এমন ব্যক্তিকে এতো বড় সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, তার ঈমান পরিপূর্ণ। যাহোক, এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, দান ও বদান্যতাও নিঃশর্তভাবে প্রশংসনীয় নয় এবং কৃপণতাও নিঃশর্তভাবে নিন্দনীয় নয়। বরং আল্লাহর জন্যে হলে উভয়টি প্রশংসনীয়, আর আল্লাহর জন্যে না হলে উভয়টি নিন্দনীয়।

মোটকথা, সব চরিত্রই সহজাত ও সৃষ্টিগত। সৃষ্টিগতভাবে কোন চরিত্রই নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় নয়। যেমন, গতকাল আমি বলেছিলাম যে, শুধুমাত্র অন্তরে মালের মহব্বত থাকা বা সম্পদ ব্যয় করতে অন্তর সংকুচিত হওয়া, এগুলো মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। কারণ, স্বভাবগতভাবে মানুষের মন সম্পদের দিকে ধাবিত হয়। মালের সংজ্ঞাই হলো– مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ 'যার দিকে মন ধাবিত হয়'। তাই সম্পদের দিকে অন্তর ঝুঁকে পড়া একটি সহজাত বিষয়।

মালের মহব্বতের সঠিক ও অঠিক ব্যবহার

এ মালের মহব্বতকে যদি কেউ জায়েজ পন্থায় ব্যবহার করে, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন, মালের মহব্বতে তুমি হালাল উপায়ে উপার্জন করার প্রতি যত্নবান হলে এবং এক্ষেত্রে একথাও চিন্তা করলে যে, হালাল উপায়ে যত অধিক পাই, তা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। এমনিভাবে ব্যবসা, কৃষিকাজ, চাকুরী ইত্যাদি সবই মালের মহব্বতে করলে, কিন্তু যেহেতু মালের মহব্বতকে তুমি একটি জায়েয এবং বৈধ কাজে ব্যবহার করলে তাই মালের এ মহব্বত খারাপ বা নিন্দনীয় নয়। এ মহব্বত তোমার উপর খারাপ কোন প্রভাব ফেললো না। কিন্তু মালের মহব্বতকে যদি তুমি নাজায়েয কাজে ব্যবহার করো, নাজায়েয পন্থায় তুমি মাল উপার্জন করতে আরম্ভ করো এবং ওয়াজিব খাতসমূহে তুমি মাল খরচ না করো তাহলে এটি মালের মহব্বতের অবৈধ ব্যবহার হলো। তাই হযরত বলেন যে, মালের মহব্বত এমনিতে প্রশংসনীয়ও নয় এবং নিন্দনীয়ও নয়। হ্যাঁ, এ মহব্বতকে যদি সঠিক উপায়ে ব্যবহার করো তাহলে সঠিক হবে আর যদি অঠিক উপায়ে ব্যবহার করো তাহলে অঠিক হবে। তবে ইমাম গাযালী (রহ.) যেমন বলেছেন যে, এ মহব্বতকে একটু কমিয়ে রাখো। একেবারে সীমান্তে দাঁড়িয়ো না। অন্যথায় এক কদম অগ্রসর হলেই তোমাকে গোনাহের মধ্যে লিপ্ত করে দিবে। তাই মালের মহব্বতকে কম করার চেষ্টা করো।

অন্যের জিনিস ব্যবহার করা কখন জায়েয?

অন্য একটি মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে–

> 'অন্তর যদি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, অনুমতি ছাড়া আমার খাওয়া তার অপসন্দনীয় হবে না, বরং তিনি এতে খুশি হবেন– সেক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়াও খাওয়া জায়েয হবে। বরং ছিনিয়ে নিয়েও খেতে পারবে। তবে শর্ত হলো, ঐ বন্ধু দানশীল হতে হবে, কৃপণ না হতে হবে। কারণ, কারো প্রতি কৃপণের ভালবাসা থাকে না। আর থাকলেও তা মালের সমান না। তাই কৃপণের অনুমতির মধ্যেও সন্দেহ রয়েছে। হ্যাঁ, দানশীল বন্ধুর সঙ্গে যদি পুরোপুরি অকৃত্রিম সম্পর্ক থাকে তাহলে ছিনিয়ে নিয়ে খাওয়াও জায়েয আছে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯০)

আসল বিধান এই যে, কোন মানুষের কোন জিনিসই তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হালাল নয়। হাদীস শরীফে আছে যে–

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِأٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'কোন মুসলমানের মাল অন্যের জন্য তার আন্তরিক সম্মতি ব্যতীত হালাল নয়।'

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, অন্যের জিনিস ব্যবহারের জন্যে শুধু অনুমতি যথেষ্ট নয়, বরং খুশি মনে অনুমতি দিলে তবে ব্যবহার করা জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়।

ছিনিয়ে নিয়ে খাওয়াও জায়েয আছে

হযরত থানভী (রহ.) এ মালফূযে বলছেন যে, কতক মানুষের সঙ্গে এমন অকৃত্রিম সম্পর্ক থাকে যে, তাদের ব্যাপারে শতকরা একশ' ভাগ বিশ্বাস থাকে যে, আমি যদি তার কোন জিনিস খাই তাহলে তার খারাপ লাগাতো দূরের কথা বরং সে আরো খুশি হবে। এমতাবস্থায় পরিষ্কার ভাষায় অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, জানাই আছে যে, সে খুশি হবে। বরং এমতাবস্থায় ছিনিয়ে নিয়ে খাওয়াও জায়েয আছে। যেমন, সে ব্যক্তি কিছু একটা খাচ্ছে, আপনি ছোঁ মেরে তা ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেললেন, তাহলে এটাও জায়েয আছে। কারণ, ছিনিয়ে নিলে ঐ বন্ধু অসন্তুষ্ট হওয়াতো দূরের কথা, সে বরং অধিক খুশি হবে এবং আনন্দ বোধ করবে। বরং এমনও হতে পারে যে, বাহ্যিকভাবে সে আটকানেরও চেষ্টা করবে। কিন্তু মনে মনে সে বন্ধুর প্রতি আরো খুশি হবে যে, এটি আমার বন্ধু

খেলে তো আরো ভালো। যখন এমন নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে, তখন যদি আপনি ছিনিয়েও নিয়ে নেন তাহলেও কোন দোষ নেই।

মনের সন্তুষ্টির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী

তবে বাস্তবিক পক্ষেই মনের সন্তুষ্টির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। এমন নয় যে, নিজের থেকেই মনে করতে থাকলো যে, আমি খাওয়াতে তার খুশি হওয়া উচিত। তাই আমি খেলে তা আমার জন্যে জায়েয হবে। এটা যথেষ্ট নয়। বরং তার পূর্বের আচরণে এটি পরিষ্কার হতে হবে যে, আমি খেলে সে খুশি হয়। তাহলে তার জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে খাওয়া যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মশকের সাথে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা

ফুকাহায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাঁরা কতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদঘাটন করেছেন। হাদীস শরীফে আছে যে, পবিত্র মক্কা বিজয় হওয়ার পর তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। মসজিদুল হারামের বরাবরে হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর বাড়ি ছিলো। হযরত উম্মে হানী (রাযি.) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত বোন এবং হযরত আলী (রাযি.)-এর আপন বোন ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়িতে গিয়ে কিছু সময় বিশ্রাম করেন। তাঁর বাড়িতে পানির একটি মশক ঝুলানো ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মশকের সাথে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেন।

পানির মালিকানার শরয়ী বিধান

এ হাদীস দ্বারা ফুকাহায়ে কেরাম কমপক্ষে দুই ডজন মাসআলা বের করেছেন। যখনই কোন হাদীস ফুকাহায়ে কেরামের নিকট পৌঁছতো, তখন তাঁরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসে যেতেন এবং দেখতেন যে, এ হাদীস থেকে উম্মতের দিক-নির্দেশনামূলক কী কী মাসআলা বের হয়। যাহোক, যে বাড়িতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেছিলেন, সেটি উম্মে হানী (রাযি.)-এর বাড়ি ছিলো এবং মশকটিও তাঁরই ছিলো। আর পানির নিয়ম এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পানি নদী, সমুদ্র বা বড় পুকুরের মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ পানি সবার জন্যে সাধারণভাবে বৈধ। যার যতটুকু ইচ্ছা সেখান থেকে পানি নিতে পারবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সেখান থেকে পানি উঠিয়ে এনে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে মশক, মটকা বা অন্য কোন পাত্রে রেখে দেয়, তাহলে ঐ পানি তার

মালিকানাধীন হয়ে যায়। তখন ঐ পানি সে বিক্রি করতে পারে, নিজেও ব্যবহার করতে পারে এবং অন্য কাউকে হাদিয়া-তোহফাও দিতে পারে। আর অন্যদের জন্যে তার অনুমতি ছাড়া এ পানি পান করা হালাল নয়। এটি হলো, ঐ পানির শরয়ী বিধান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে অনুমতি ছাড়া পানি পান করা জায়েয ছিলো

ফুকাহায়ে কেরাম এ হাদীস প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ মশকের মালিক ছিলেন হযরত উম্মে হানী (রাযি.)। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুমতি ছাড়া ঐ মশক থেকে পানি পান করলেন। এভাবে পানি পান করা তার জন্যে কিভাবে জায়েয হলো? এর উত্তর এই যে, অনুমতি ছাড়াই তাঁর জন্যে পানি পান করা এজন্যে জায়েয হয়েছে যে, যদিও তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাঁর থেকে অনুমতি গ্রহণ করেননি, কিন্তু তিনি জানতেন যে, আমি উম্মে হানী (রাযি.)-এর ঘরের যে কোন জিনিস ব্যবহার করলে তিনি নিজে ব্যবহার করা থেকেও অধিক খুশি হবেন। এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে তাঁর অনুমতি ছাড়াই তাঁর মশক থেকে পানি পান করা জায়েয হয়েছে।

সাধারণ মানুষের ভাগাড়কে পেশাবের জন্যে ব্যবহার করা

আরো শুনুন! হাদীস শরীফে এসেছে যে, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে লোকদের ভাগাড় (ডাষ্টবিন) ছিলো। লোকেরা বাড়ির সব ময়লা-আবর্জনা সেখানে ফেলতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ভাগাড়ের নিকট গিয়ে পেশাব করলেন। ফুকাহায়ে কেরাম এখানে প্রশ্ন উঠিয়েছেন যে, এ ভাগাড়টিতো নির্দিষ্ট একটি গোত্রের লোকদের ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি ছাড়া ভাগাড়টিকে পেশাব করার জন্যে কী করে ব্যবহার করলেন? তারপর তাঁরা এর উত্তর এই দিয়েছেন যে, ভাগাড়টি সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত ছিলো, বিধায় তিনি এটি ব্যবহার করেছেন। হাদীসের মধ্যে 'গোত্রের ভাগাড়' বলে তাদের মালিকানা বুঝানো হয়নি, বরং তাদের সাথে সম্পৃক্ততা বুঝানো হয়েছে।

আর কোন কোন ফকীহ এর উত্তর এই দিয়েছেন যে, যদিও ঐ ভাগাড়টি সেই গোত্রের মালিকানাধীন ছিলো, কিন্তু ঐ গোত্রের একজন ব্যক্তিও এমন ছিলো না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটি ব্যবহার করাকে সে অপসন্দ করবে। তাই গোত্রের পক্ষ থেকে সাধারণ অনুমতি বিদ্যমান ছিলো।

সূচিপত্র

সালামের উত্তর দেওয়ার জন্যে তায়াম্মুম করা

আরো শুনুন! একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করে বললো– 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর দিতে চাইলেন। কিন্তু ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুর হালতে ছিলেন না। পাশেই এক ব্যক্তির ঘর ছিলো। তিনি ঐ ঘরের দেওয়ালে হাত মেরে তায়াম্মুম করলেন, তারপর তার সালামের উত্তর দিলেন– 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকুতুহু'। সালামের জওয়াবের মধ্যে আল্লাহর নাম ছিলো। বিধায় বিনা অযুতে তিনি আল্লাহর নাম নেওয়া সমীচিন মনে করলেন না। তাই তিনি তায়াম্মুম করে তারপর উত্তর দিলেন। এমনটি করা ওয়াজিব বা জরুরী ছিলো না। শুধু আল্লাহ তাআলার নামের আদবের খাতিরে তিনি তায়াম্মুম করেন। একথা মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি এ উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করে তাহলে ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া জায়েয নেই।

তায়াম্মুম করার জন্যে অন্যের দেওয়াল ব্যবহার করা

এ হাদীস সম্পর্কেও ফুকাহায়ে কেরাম একইভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ ঘরতো অন্য কোন ব্যক্তির ছিলো। সে ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তিনি তায়াম্মুমের কাজে তার দেওয়াল কীভাবে ব্যবহার করলেন? তারপর এর উত্তর দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই এমন নেই যে, তার দেওয়ালের মাটি দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়াম্মুম করাকে অপসন্দ করবে। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচলিত সাধারণ অনুমতির ভিত্তিতে এ দেওয়াল ব্যবহার করেন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যের জিনিস ব্যবহার করার গুরুত্ব

এ সমস্ত ঘটনা বলার দ্বারা মূলত একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ইসলামী শরীয়ত এবং ইসলামী ফিকহ অন্যের জিনিস ব্যবহারের ব্যাপারে কত সজাগ দৃষ্টি রাখে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেও এ প্রশ্ন উত্থাপন করছে যে, তিনি এ সমস্ত জিনিসকে মালিকের অনুমতি ছাড়া কীভাবে ব্যবহার করলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমাদের অবস্থা এই যে, হালাল-হারামের কোন পরওয়া নেই। বিশেষ করে যারা পাশাপাশি থাকে, তারা একে অপরের জিনিস ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু অন্যের থেকে অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন বোধ করে না।

কিন্তু আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, হাদীসের দৃষ্টিতে শুধু অনুমতিও যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না সে অনুমতি আন্তরিকতার সাথে হয়।

কৃপণের অনুমতি সন্দেহযুক্ত

হযরত থানভী (রহ.) তো এতদূর বলেছেন যে, কৃপণের অনুমতিও সন্দেহযুক্ত। যেমন, আপনি কোন কৃপণের নিকট থেকে তার একটি জিনিস ব্যবহারের অনুমতি নিলেন, কিন্তু সে যখন অনুমতি দিলো তখন তার অন্তরের উপর দিয়ে যেন করাত চালানো হলো। কারণ, সে চিন্তা করে যে, যদি অনুমতি না দেই তাহলে খারাপ কথা হবে। তাই যদি অনুমতি দেই, তাও মুশকিল, আর যদি না দেই, তাও মুশকিল। এ দ্বিমুখী বিপদে পড়ে সে অনুমতি দিলো। এমন কৃপণ ব্যক্তির এ অনুমতি সন্দেহযুক্ত। তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সে খুশি মনে অনুমতি দেয়নি।

কৃপণের নিকট থেকে জোরপূর্বক ওয়াজিব হক নেওয়া

তবে এখানে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে যে, কোন কৃপণ ব্যক্তি চাপের মুখে নিজের মনের উপর পাথর চাপা দিয়ে অনুমতি দিলে তার দুই অবস্থা–

এক অবস্থা এই যে, ঐ কৃপণ ব্যক্তি চাপের মুখে এমন জিনিসের অনুমতি দিলো, যা ঐ কৃপণ ব্যক্তির দায়িত্বে ওয়াজিব হক ছিলো কিন্তু তা সে দিচ্ছিলো না, তাই আপনি চাপ সৃষ্টি করে তার থেকে অনুমতি নিয়ে নিলেন। এমতাবস্থায় ঐ জিনিস হালাল হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। যেমন, কৃপণ ব্যক্তির স্ত্রী আছে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে ওয়াজিব। কিন্তু ঐ কৃপণ স্বামী কার্পণ্যের কারণে স্ত্রীর খরচ দেয় না বা প্রয়োজনের তুলনায় কম দেয়। যার দ্বারা স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ হয় না। তখন স্ত্রী ভর মজলিসের মধ্যে তার খরচের বিষয় আলোচনায় আনলো এবং মজলিসের লোকদের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে স্বামীর নিকট থেকে তার ভরণ-পোষণের অনুমতি আদায় করে নিলো। অথচ স্ত্রী জানে যে, অনুমতি দিতে তার অন্তরে যেন সাপে দংশন করেছে। যাহোক, মানুষের চাপে পড়ে স্বামী অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যেহেতু স্বামীর দায়িত্বে স্ত্রীর হক আদায় করা ওয়াজিব ছিলো, তাই স্বামী চাপের মুখে পড়ে হৃষ্টচিত্ত না দিলেও এ খরচা স্ত্রীর জন্যে হালাল। বরং এমতাবস্থায় অনুমতি ছাড়াও স্ত্রীর জন্যে তা হালাল।

স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর খরচ নেওয়া

'হিন্দা' ছিলেন হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর স্ত্রী। তিনি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমার স্বামী আবু সুফিয়ান চেপে ধরে খরচ করতে অভ্যস্ত। তিনি কৃপণ মানুষ। (তার দেওয়া অর্থে) আমার ব্যয় নির্বাহ হয় না। আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে (তিনি প্রয়োজনীয়) খরচ দেন না। কখনো কখনো তিনি তার টাকা-পয়সা বাড়িতে রেখে বাইরে যান। আমি কি তাকে না জানিয়ে সেখান থেকে টাকা-পয়সা নেবো? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমার এবং তোমার সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্যে যে পরিমাণ আবশ্যক, অতটুকু নিবে।'

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি ছাড়াও নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, এটি ছিলো ওয়াজিব হক।

ওয়াজিব হক ছাড়া চাপ সৃষ্টি করে নেওয়া জায়েয নেই

কিন্তু যদি ওয়াজিব হক না হয়, তাহলে চাপ সৃষ্টি করে নেওয়া জায়েয নেই। কতক লোক রীতিমত প্ল্যানিং করে যে, আমাদের অমুক বন্ধু বড় কৃপণ, তাই একদিন সবাই মিলে তার উপর চড়াও হবো এবং সবাই মিলে তার উপর চাপ সৃষ্টি করবো, যাতে করে সে খাওয়াতে বা উপহার-উপঢৌকন দিতে বাধ্য হয়। যে কোন মূল্যে তার দ্বারা পয়সা খরচ করাতে হবে। প্ল্যান মাফিক সবাই তার বাড়িতে গিয়ে তার উপর চড়াও হলো এবং সবাই তাকে চাপ সৃষ্টি করলো। বেচারা তো সবার চাপের মুখে বাধ্য হয়ে পড়লো। তাদের কথা মানা ছাড়া কোন উপায় থাকলো না। এখন সে মনের উপর পাথর চাপা দিয়ে তাদের কথা মেনে নিলো। টাকা খরচ করে তাদেরকে খাওয়ালো। কিন্তু তার মনের উপর দিয়ে তো রীতিমতো কিয়ামত বয়ে গেলো। এমতাবস্থায় ঐ কৃপণ বন্ধু থেকে জোর-জবরদস্তি যা কিছু খেলো তা সব হারাম হলো। কারণ, লোকটি যদিও কৃপণ, কিন্তু তোমাদের জন্যে ব্যয় করা তার উপর ওয়াজিব ছিলো না। তোমরা তার মর্জির বিরুদ্ধে এবং মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খরচ করতে তাকে বাধ্য করেছো। তাই এটি 'কোন মুসলমানের সম্পদ তার খুশি মনের অনুমতি ছাড়া হালাল নয়' –এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মাদরাসার জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করা

মাদরাসার জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করাও এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন যে, যে সমস্ত লোক নিজেদের

প্রভাব খাটিয়ে চাঁদা উঠায়, সে চাঁদা সন্দেহযুক্ত। কারণ, যার থেকে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে, সে যখন দেখে যে, এত বড় মাওলানা সাহেব চাঁদার জন্যে আমার দোকানে আগমন করেছেন। এখন চাঁদা দিতে তো মন চাচ্ছে না কিন্তু এত বড় মাওলানাকে কীভাবে ফিরিয়ে দেই। সুতরাং মনের উপর পাথরের বোঝা চাপিয়ে কিছু পয়সা চাঁদা স্বরূপ তাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু তা খুশি মনে দেয়নি। আর যে চাঁদা খুশি মনে দেওয়া হয় না তা নেওয়া জায়েয নেই।

সাধারণ মাহফিল বা সভায় চাঁদা সংগ্রহ করা

এজন্যে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, বর্তমান যুগে সাধারণ মাহফিল বা সভায় চাঁদা সংগ্রহ করা সমীচীন নয়। সাধারণ সমাবেশে চাঁদা সংগ্রহ করলে বেশির ভাগ মানুষ এ বিপদ দূর করার জন্যে এবং মানুষের তিরস্কার থেকে বাঁচার জন্যে চাঁদা দিয়ে থাকে। এভাবে দেওয়ার মধ্যে ইখলাস থাকে খুব কম। বর্তমান যুগের কথা এজন্যে বলা হয়েছে যে, সাধারণ মাহফিল বা সভায় চাঁদা সংগ্রহ করা জায়েয হওয়ার উপর তাবুক যুদ্ধের ঘটনা দিয়ে মানুষ দলিল দিয়ে থাকে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধের সময় মসজিদে নববীতে সাধারণভাবে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন।

এ দলিলের উত্তর এই যে, যাঁদের নিকট চাঁদা চাওয়া হচ্ছিলো তারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)। যাঁদের ব্যাপারে এটা নিশ্চিত ছিলো যে, আল্লাহ তাআলার জন্যে চাঁদা দিতে হলে তাঁরা দিবেন। আর আল্লাহ তাআলার জন্যে না দিতে হলে দিবেন না। বর্তমানে আমরা নিজেদেরকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে কী করে তুলনা করতে পারি। এ কারণে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, সাধারণ মাহফিল বা সভায় চাঁদা সংগ্রহ করার রীতিটি ভালো নয়। এমতাবস্থায় এ আশঙ্কা রয়েছে যে, মানুষের আন্তরিক ইচ্ছার বিপরীতে চাঁদা উসূল করা হবে। এ কারণে এ ধরনের চাঁদা– 'কোন মুসলমানের সম্পদ তার খুশি মনের অনুমতি ছাড়া হালাল নয়'– এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সমস্ত কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সত্তরতম মজলিস

সুদ নেওয়ার দ্বারা কার্পণ্য বৃদ্ধি পায়

সুদ নেওয়ার দ্বারা কার্পণ্য বৃদ্ধি পায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

সুদ নেওয়ার দ্বারা কার্পণ্য বৃদ্ধি পায়

একটি মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'সুদ নেওয়ার দ্বারা কৃপণতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, সুদ নেওয়ার কারণই হলো কৃপণতা। যত সুদ নেয় তত কৃপণতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি নিজের শরীরের পিছনেও ব্যয় করে না।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯১)

কৃপণতার বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পদ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, সম্পদের প্রতি লোভ ও ভালবাসা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সম্পদ বৃদ্ধির কারণে তার অমুখাপেক্ষীতা ও অভাবমুক্তি ঘটে না। অর্থাৎ, মানুষের সম্পদ যতই বাড়ুক না কেন সে তার উপর তুষ্ট ও তৃপ্ত না হয়ে আরো বেশি সম্পদ অর্জনের ফিকির করতে থাকে। সাধারণ নিয়মের দাবিতো ছিলো সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্তরে অভাবমুক্ততা সৃষ্টি হবে, কিন্তু বাস্তবে অভাবমুক্তি ঘটে না এবং ব্যয় করার মানসিকতাও বৃদ্ধি পায় না, বরং সম্পদের ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পায়।

মানুষের পেট কবরের মাটিই পূর্ণ করবে

একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ وَادِيَانِ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ (صحيح البخارى)

অর্থাৎ, আদম সন্তান যদি স্বর্ণভরা একটি প্রান্তরও পায়, তাহলে সে দু'টি প্রান্তর পেতে চাইবে। যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ দু'টি প্রান্তর পায়, তাহলে তিনটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। পরিশেষে তিনি অপূর্ব এক প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য ইরশাদ করেন–

وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

অর্থাৎ, আদম সন্তানের পেট কবরের মাটি ছাড়া অন্য কোন জিনিস পূর্ণ করতে পারবে না। মানুষের পেট তখনই পূর্ণ হবে, যখন তার মধ্যে মাটি ভরা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অল্পে তুষ্ট না হবে এবং তার সম্পদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পেট ভরবে না।

এক সওদাগরের গল্প

শায়খ সাদী (রহ.) বলেন যে, আমি তোমাদেরকে একটি গল্প শুনাচ্ছি। অনেক বড় একজন সওদাগরের মাল-সামানা গোর নামক মরুভূমির মধ্যে খচ্চরের পিঠ থেকে পড়েছিলো। খচ্চরটিও মরে পড়েছিলো। ঐ সওদাগরটিও মরে পড়েছিলো। সেখানে পড়ে থাকা বিক্ষিপ্ত সামানাগুলি যেন তাদের নীরব ভাষায় বলছিলো– দুনিয়াদারের সংকীর্ণ দৃষ্টি দু'টি জিনিসই কেবল পূর্ণ করতে পারে, হয় অল্পে তুষ্টি, আর না হয় কবরের মাটি। তৃতীয় কোন জিনিস তা পূর্ণ করতে পারে না।

যাহোক, কার্পণ্যের বৈশিষ্ট্য হলো, সম্পদ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, লোভও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে, মালের মহব্বতও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ব্যয় করতে আরো বেশি প্রতিবন্ধক হতে থাকে।

বড় একজন পুঁজিপতির উক্তি

করাচীতে অনেক বড় একজন পুঁজিপতি রয়েছেন। তিনি পাকিস্তানের বিখ্যাত দু'-চারজন পুঁজিপতির অন্যতম। কোটি-কোটি টাকার মালিক। একদিন তিনি আমার কাছে এলে আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক টাকা দিয়েছেন। অনেক কারখানা বানিয়েছেন। ফ্যাক্টরি বানিয়েছেন। সবকিছুতো করেছেন। এখন লাভের জন্যে নয় শুধু আল্লাহর জন্যে কিছু করুন। কাজটি হলো, এমন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করুন, যা সুদ না নিয়ে কাজ করবে। আপনার যেহেতু প্রচুর পরিমাণে টাকা আছে, তাই আপনি এটা করতে পারেন। তিনি বললেন, মাওলানা সাহেব! ঐ ব্যাংক তাহলে চলবে কেমনে? আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ চলবে। তবে আপনি একথা চিন্তা করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবেন যে, যে পয়সা আপনি ঐ ব্যাংকে লাগিয়েছেন তা আপনার হাত থেকে বের হয়ে

গেছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আপনার যখন হাজার হাজার কোটি টাকা রয়েছে, তখন এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে যদি কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করেন তাতে কি আসে যায়। এ কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে এগুলোর কথা ভুলে যান। তিনি বললেন যে, আমি সেগুলোর কথা ভুলে যাবো? আমি বললাম যে, ঐ কয়েক কোটি টাকা কোথায় গিয়েছে আপনি তা ভুলে যান। তবে আল্লাহ্ তাআলা যদি চান তাহলে তার মধ্যেও লাভ দান করবেন। কিন্তু আপনি তা ভুলে যান। সবশেষে তিনি বললেন, মাওলানা সাহেব! আপনি কথাতো ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমি হাতের চুলকানীর কী করবো!!

ধনী ও দরিদ্রের ব্যয়ের পার্থক্য

এই হলো সম্পদ বাড়ানোর চুলকানি। হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, এ কৃপণতাও ক্রমে ক্রমে চুলকানির রূপ ধারণ করে। তখন মানুষের কাছে যত পয়সাই আসুক না কেন তার লালসা শেষ হয় না। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে, একজন গরীব মানুষ যেই পরিতৃপ্তি ও খুশি মনে দু'-পাঁচ টাকা চাঁদা দেয়, হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক ধনী ব্যক্তি এমন খুশি মনে দেয় না। অথচ ঐ ধনী ব্যক্তির সামর্থ্য অধিক। আর গরীবের সামর্থ্য মোটেও নেই। এ সবই মালের মহব্বতের পরিণতি।

সুদের মানসিকতা কৃপণতা সৃষ্টি করে

এ কৃপণতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো সুদ। কারণ, সুদের অর্থই হলো কাজ কিছুই করো না এবং কোন ঝুঁকিই নিয়ো না আর পয়সার উপর পয়সা কামাও। এটা হলো কৃপণের কাজ। আর সুদের মানসিকতা নিজেই মানুষের মধ্যে কৃপণতা সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে যত সুদখোর জাতি অতিবাহিত হয়েছে, সবচেয়ে অধিক কৃপণও ছিলো তারাই। দুনিয়াতে সর্বাধিক সুদখোর জাতি 'ইহুদী'। পবিত্র কুরআন ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছে–

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ

'আর এ কারণে যে, তারা সুদ নিতো। অথচ তাদেরকে তা থেকে বারণ করা হয়েছিলো।' (সূরা নিসা : ১৬১)

বর্তমান বিশ্বেও পৃথিবীর সমস্ত সুদী কারবার সেই ইহুদীদের হাতেই রয়েছে। আর এরাই সর্বাধিক কৃপণ জাতি। সারা পৃথিবীতে তাদের কৃপণতা প্রসিদ্ধ।

'শাইলাক' ইহুদীর গল্প

আপনারা 'শাইলাক' ইহুদীর গল্প হয়তো শুনেছেন। এটি রোমের বাদশার সময়ের গল্প। এক ইহুদী ছিলো, তার নাম ছিলো 'শাইলাক'। এক অভাবী ব্যক্তি তার কাছে টাকা চাইতে এলো। শাইলাক বললো, আমি সুদের উপর ঋণ দিতে পারি। সুতরাং সে সুদের উপর ঋণ দিলো। সে ঋণের টাকার দ্বিগুণ সুদের শর্ত লাগালো এবং বললো যে, এত দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করবে। ঋণগ্রহীতা গরীব মানুষ ছিলো। সে তার পানাহারের প্রয়োজনে ঋণ নিয়েছিলো। সেই মেয়াদ যখন পুরা হয়ে গেলো এবং ঋণ পরিশোধের দিন আসলো, তখন শাইলাক তার বাড়িতে টাকা উসুল করতে গেলো। গরীব লোকটি বললো, আমার কাছে তো এখন অল্প টাকা আছে। সুতরাং সে অল্প কিছু টাকা দিয়ে বললো যে, আর টাকা নেই, নইলে আমি তোমাকে দিতাম।

শাইলাক বললো, ঠিক আছে এখন দ্বিগুণ সুদ দিতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের জন্যে নতুন তারিখ নির্ধারণ করে দিলো। নির্দিষ্ট সেই দ্বিতীয় তারিখ আসলে শাইলাক পুনরায় তার বাড়িতে গেলো। গরীব লোকটি তখন বললো, তুমি তো সুদ দ্বিগুণ করে দিয়েছো। এখন আমি আসল টাকাতো দিতে পারবো কিন্তু সুদের এ দ্বিগুণ টাকা দিতে পারবো না। তাই তুমি আসল টাকা নিয়ে নাও। সে বললো যে, আমি তো পুরা সুদ নিবো এবং তোমাকে সময়ও বাড়িয়ে দিবো না। গরীব লোকটি বললো যে, আমার নিকট পরিশোধ করার মতো টাকা নেই, আমি কী করবো? শাইলাক বললো যে, আমি আর একটি তারিখ নির্ধারণ করে দিচ্ছি, সে তারিখ মতো তুমি যদি টাকা পরিশোধ না করো তাহলে তোমার দেহের এক পাউন্ড গোশত কেটে নিয়ে খাবো এবং টাকাও নিবো। সে তারিখ যখন এলো গরীব লোকটি সুদের টাকা পরিশোধ করতে পারলো না, তখন শাইলাক ছুরি নিয়ে লোকটির বাড়িতে গেলো।

টাকার পরিবর্তে মানুষের গোশত

গরীব লোকটি তো অস্থির হয়ে গেলো। সে কোন মতে আত্মগোপন করে রোমের বাদশার দরবারে চলে গেলো। সে বাদশাহকে বললো, আমার গোশত কাটতে আসছে। সুতরাং আদালতে মামলা হলো। তাকে কারাগারে বন্দী করা হলো। শাইলাক আদালতে জোরালো বক্তব্য দিলো। সে তার বক্তব্যে বললো যে, আমার সাথে আপনি ন্যায়বিচার করুন। এতদিন ধরে সে আমাকে ঘুরাচ্ছে। সে আমার টাকা দিচ্ছে না। অবশেষে সে নিজে স্বেচ্ছায় নিজের গোশত কাটতে

বলে। এখন আদালতের উচিত আমাকে তার গোশত কেটে নেওয়ার রায় দেওয়া। কারণ, ন্যায়বিচারের দাবি এটাই।

সেই দরিদ্র লোকটি তো কারাগারে বন্দী ছিলো। সে আদালতে আসতে পারছিল না। তাই তার স্ত্রী আদালত কক্ষে এসে বক্তব্য দেয়। বক্তব্যে সে বলে যে, শাইলাক ন্যায়বিচার করতে বলছে, আর তার ন্যায়বিচারের দাবি হলো, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির গোশত কেটে খাবে। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের সবার সাথেও যদি আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিচার করতে আরম্ভ করেন তাহলে আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে। এ দুনিয়াতে ন্যায়বিচারই সবকিছু নয়। দয়া বলেও একটি জিনিস আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর যদি দয়া করেন তাহলে আমরা মুক্তি পাবো। অন্যথায় মুক্তি পাবো না। তখন বাদশাহ ঐ গরীব লোকটির পক্ষে দয়ার ভিত্তিতে ফায়সালা দেন। যাহোক, পুরো ইহুদী জাতি শাইলাকের মতো সমগ্র পৃথিবীতে কৃপণ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

হিন্দু বেনিয়া সুদখোর জাতি

পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম সুদখোর জাতি হলো হিন্দু সম্প্রদায়। হিন্দু বেনিয়ারা প্রসিদ্ধ। ভারতের হিন্দু ব্যবসায়ীদেরকে 'বেনিয়া' বলে। তাদেরকে মহাজনও বলে। এরাও সুদ খায়। এদের কৃপণতা প্রবাদতুল্য। এরা এক এক পাইয়ের হিসাব করে থাকে।

হিন্দী ভাষার একটি প্রবাদ

আমার হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) হিন্দী ভাষার খুব মজার একটি প্রবাদ শুনাতেন–

لالہ جی گئے پاؤنے - چار دن میں آئے، لالہ جی کے گھر
آ گئے چار پاؤنے، لالہ جی نہ گئے نہ آئے

'হিন্দু বেনিয়া এক জায়গায় মেহমান হয়ে যায়। সে সেখানে চার দিন অবস্থান করে ফিরে আসে। এভাবে তার চার দিনের খরচ বেঁচে যায়। তারপর একদিন এ বেনিয়ার ঘরে চারজন মেহমান আসে। ফলে চার দিনে যা বেঁচে ছিলো তা শেষ হয়ে যায়। তাই বেনিয়া যায়ও নাই, আসেও নাই।'

যাহোক, তাদের নিকট কৃপণতার হিসাব-কিতাব এভাবে চালু থাকে, যেন একটি পাইও চলে যেতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে সুদের এ মানসিকতা এমন কৃপণতা সৃষ্টি করে।

সূচিপত্র

অর্থনৈতিক গোনাহ্ কৃপণতা সৃষ্টি করে

মনে রাখবেন, যার আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের কোন পরওয়া নেই, তার টাকা যত বাড়তে থাকে কৃপণতাও তত বাড়তে থাকে। তার লালসাও সেই পরিমাণে বাড়তে থাকে এবং পয়সা খরচ করতে তার প্রাণবায়ু যেন বের হয়ে যেতে থাকে। গরীব মানুষ প্রশান্ত মনে টাকা খরচ করবে, কিন্তু এই পুঁজিপতি, যে কিনা তার ধন-সম্পদের উপর সাপের মতো চড়ে বসেছে, সে টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হবে না। মনে রাখবেন, সম্পদের এ মোহ কৃপণতা সৃষ্টি করে। আর এ কৃপণতার ফলে মালের মহব্বত অধিক হয়ে থাকে।

বেশি বেশি এ দু'আ করুন

এ থেকে বাঁচার একটি মাত্র পথ রয়েছে। আর তাহলো, মানুষ নিজেকে নিজে শরীয়তের অনুগামী বানাবে। অন্তরে অল্পেতুষ্টির গুণ তৈরি করবে। আর এ দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ! জায়েয এবং হালাল তরীকায় আপনি আমাকে যতটুকু দান করবেন, আমার জন্যে তাই নিয়ামত এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো এ দু'আ করবে–

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একটি শব্দের উপর মানুষের কুরবান হওয়া উচিত। তিনি এ দু'আয় বলেন যে, 'হে আল্লাহ! যা কিছু রিযিক আপনি দান করেছেন, আপনি আমাকে তার উপর তুষ্টি নসীব করুন এবং আমাকে তার মধ্যে বরকত দান করুন।' আল্লাহ্ যখন অল্প মালের মধ্যে বরকত দান করেন, তখন তা লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকার চেয়েও অধিক উপকার দেয়। আর যদি আল্লাহর দেওয়া রিযিকের মধ্যে বরকত না থাকে, তখন শত শত লাখ-লাখ টাকাও বেকার হয়ে যায়। সেগুলোর দ্বারা কোন ফায়দা হাসিল হয় না। তারপর বলেন যে, 'হে আল্লাহ! যে সম্পদ আমার কাছে নেই, তার বদলে আপনি আমাকে ঐ জিনিস দান করুন, যা আপনার নিকট কল্যাণকর'। অর্থাৎ, আমি যত চিন্তা-ভাবনাই করি না কেন যে, আমার জন্যে কোন জিনিসটি ভালো আর কোনটি মন্দ। কিন্তু আমার সীমিত চিন্তা-ফিকির দ্বারা আমি কখনই প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবো না। তাই হে আল্লাহ! এ বিষয়টি আমি আপনার উপর

সূচিপত্র

ছেড়ে দিচ্ছি। হে আল্লাহ! যে জিনিস আমার কাছে নেই, তার বদলে আমাকে আপনি এমন জিনিস দান করুন, যা আপনার নিকট কল্যাণকর।

হালাল পন্থায় সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা জায়েয

তবে এ কথাটিও বুঝুন যে, আল্লাহ্ তাআলার নিকট অল্পেতুষ্টির দু'আ করবে, কিন্তু জায়েয এবং হালাল উপায়ে এ সম্পদ আরো বাড়ানোর চেষ্টা করা অল্পেতুষ্টির পরিপন্থী নয়। এ কথার প্রমাণ এই যে, খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। হালাল উপায়ে সম্পদ বাড়ানো যদি অল্পেতুষ্টির পরিপন্থী হতো তাহলে তিনি ব্যবসার জন্যে উৎসাহ দিতেন না। এর দ্বারা জানা গেলো যে, হালাল পন্থায় সম্পদ বাড়ানোর ইজাযত রয়েছে, তবে একথা চিন্তা করে এ কাজ করতে হবে যে, জায়েয এবং হালাল পন্থায় আল্লাহ তাআলা যতটুকু দান করবেন, তাই নিয়ামত। সেজন্যে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করে তা ব্যবহার করবো এবং নাজায়েয পন্থায় সম্পদ অর্জনের ফিকির কখনোই অন্তরে সৃষ্টি হতে দিবো না। সম্পদের ভালবাসাকে অন্তরে প্রবল হতে দিবো না। আল্লাহ তাআলা দয়া করে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

একাত্তরতম মজলিস

অপচয় ও তার প্রতিকার

অপচয় ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

কৃপণতার বিপরীত অপচয়

গত তিন দিন ধরে কৃপণতার আলোচনা চলছিলো, আলহামদু লিল্লাহ! তা সমাপ্ত হয়েছে। সামনে হযরত থানভী (রহ.) 'অপচয়' সম্পর্কে আলোচনা করছেন। 'অপচয়' 'কৃপণতার' বিপরীত জিনিস। কৃপণতার অর্থ হলো, যেখানে খরচ করা উচিত, সেখানে খরচ না করা। আর অপচয়ের অর্থ হলো, যেখানে খরচ না করা উচিত, সেখানে খরচ করা। এ উভয়টি নাজায়েয এবং নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর 'প্রিয় বান্দাগণের' গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ, দয়াময়ের বান্দারা যখন খরচ করে, তখন অপচয়ও করে না এবং কৃপণতাও করে না, আর এতদুভয়ের মাঝেই হলো মধ্যপন্থা।

(সূরা ফুরকান : ৬৭)

তাই মানুষের অপচয়ও করা উচিত না এবং কৃপণতাও করা উচিত না।

ব্যয় করার পূর্বে চিন্তা করো

'অপচয়' সম্পর্কিত আলোচনায় সর্বপ্রথম হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি মালফূয উদ্ধৃত করেছেন। মালফূযটি হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এক মুরীদের পত্রের উত্তরে 'তারবিয়্যাতুস সালেক' নামক কিতাবে লিখেছেন। মালফূযটি এই–

'ব্যয় করার পূর্বে গুরুত্বের সাথে দু'টি কাজ করবে। একটি এই যে, ব্যয় করার পূর্বে চিন্তা করবে যে, এক্ষেত্রে যদি ব্যয় না করি, তাহলে কোন ক্ষতি হবে কি না? যদি ক্ষতি না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যয় করবে না। আর যদি ক্ষতি হবে বলে মনে হয়, তাহলে কোন মুরুব্বীর সাথে পরামর্শ করবে যে, এক্ষেত্রে ব্যয় করা অঠিক ও অসমীচীন নয় তো? সে যা বলবে, সে অনুপাতে কাজ করবে। ক্ষতি দ্বারা বাস্তবিক এবং প্রকৃত ক্ষতি উদ্দেশ্য। যার মাপকাঠি হলো, শরীয়ত। কাল্পনিক ক্ষতি উদ্দেশ্য নয়।'

রোগী অনুপাতে চিকিৎসা

এ মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) 'অপচয়' থেকে বাঁচার উপায় লিখেছেন। আমি পূর্বেও একথা বলেছি যে, চিকিৎসক তার চিকিৎসাধীন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে তার অবস্থা অনুপাতে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। সুতরাং এ মালফূযের মধ্যেও হযরত তাকে বলেছেন যে, যদি কোথাও খরচ না করাতে ক্ষতি হবে বলে মনে হয়, সেখানেও কোন মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করবে। এমন মনে হচ্ছে যে, যাকে লক্ষ্য করে একথা বলেছেন, সে হয়তো খুব বেশি অপচয় করতো এবং তার মতামতের উপর নির্ভর করা যাচ্ছিলো না, এ কারণে তিনি এ ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন।

এমতাবস্থায় ব্যয় করবে না

অন্যথায় আসল কথা হলো, মানুষ ব্যয় করার পূর্বে চিন্তা করবে যে, যদি ব্যয় না করি তাহলে কি ক্ষতি হবে? ব্যয় না করায় যদি কোন ক্ষতি থাকে তাহলে ব্যয় করবে। কিন্তু ব্যয় না করায় যদি কোন ক্ষতি না থাকে তাহলে ব্যয় করার প্রয়োজনটা কি? সে ব্যয় প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে, যার কোন প্রয়োজন নাই।

ক্ষতির সিদ্ধান্ত কে দিবে?

এখন প্রশ্ন হলো, কোথায় খরচ না করায় ক্ষতি আছে, আর কোথায় ক্ষতি নেই? এটি এমন একটি প্রশ্ন, যার দুই আর দুই চারের মতো এক কথায় উত্তর দেওয়া মুশকিল। যে কোন শাস্ত্রে এবং বিদ্যায় যে সমস্ত নিয়মনীতি থাকে, তা একটি পর্যায় পর্যন্ত কাজ দেয়, সেই পর্যায় অতিক্রম করলে সেখানে মানুষকে নিজের সুস্থ রুচির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ব্যয় করার মধ্যে উপকার আছে কিনা?

এটি তো হলো, নেতিবাচক দিক যে, ব্যয় করার পূর্বে দেখো যে, ব্যয় না করলে ক্ষতি আছে কিনা? এর বিপরীতে একটি ইতিবাচক দিকও রয়েছে। তা এই যে, ব্যয় করার সময় দেখো যে, ব্যয় করার মধ্যে কোন উপকার আছে কিনা? ব্যয় করার মধ্যে যদি উপকার থাকে তাহলে ব্যয় করো, আর যদি উপকার না থাকে তাহলে ব্যয় করো না। এটাই হলো আসল মাপকাঠি। তাই 'অপচয়ে'র আসল অর্থ হলো, 'এমন ব্যয়, যার কোন উপকার নেই।' উপকার এখানে ব্যাপকার্থবোধক। তা দ্বীনের উপকার হোক বা দুনিয়ার উপকার হোক। দুনিয়ার উপকার বলতে শরীয়তসম্মত এবং জায়েয উপকার উদ্দেশ্য। নাজায়েয উপকার উদ্দেশ্য নয়। তাই যে ব্যয়ের মধ্যে দ্বীনের উপকার রয়েছে বা দুনিয়ার জায়েয এবং শরীয়তসম্মত উপকার রয়েছে, তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি ব্যয়টি এমন হয়, যার আদৌ কোন উপকার নেই বা এমন উপকার রয়েছে, যা লাভ করা শরীয়তে জায়েয নেই, এমন ব্যয় অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এটি অপচয় নয়

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা এ মূলনীতি বের হয়ে আসে যে, এমন অনেক খরচ রয়েছে, যেগুলোকে মানুষ 'অপচয়' মনে করে, অথচ বাস্তবে তা অপচয় নয়। যেমন, একজন মানুষ তার শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে থেকে নিজের আরামের জন্যে বা নিজের মনকে খুশি করার জন্যে অন্য লোকদের তুলনায় বেশি টাকা ব্যয় করে কোন জিনিস ক্রয় করে আনলো। যেমন, একটি জিনিস বাজারে দশ টাকাতেও পাওয়া যায়, পনের টাকাতেও পাওয়া যায় এবং বিশ টাকাতেও পাওয়া যায়। আবার ঐ জিনিসই একশ' টাকাতেও পাওয়া যায়। তবে মানগত ও উন্নত ও অনুন্নতের পার্থক্য রয়েছে। এখন একজন মানুষের ঐ জিনিসই ক্রয় করার জন্যে একশ' টাকা ব্যয় করার সামর্থ্য আছে এবং তা ক্রয় করার জন্যে তার অন্য কারো নিকট থেকে ঋণ নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। তাই সে ব্যক্তি নিজের আরাম ও সুবিধার জন্যে দশ টাকার জিনিসের পরিবর্তে একশ' টাকার জিনিস ক্রয় করলো, তাহলে এটি অপচয় বা গোনাহ নয়।

সফরের জন্যে সুবিধাজনক বাহন গ্রহণ করা

তদ্রূপভাবে তোমাকে সফর করে অন্য শহরে যেতে হবে। এখন তার জন্যে তুমি রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতেও ভ্রমণ করতে পারো, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভ্রমণ করতে পারো, প্রথম শ্রেণীতেও ভ্রমণ করতে পারো, এয়ার কন্ডিশনেও ভ্রমণ

করতে পারো এবং বিমানেও ভ্রমণ করতে পারো। এগুলোর ভাড়ার মধ্যেও তারতম্য রয়েছে। কিন্তু যার এয়ার কন্ডিশনে ভ্রমণ করার সামর্থ্য রয়েছে, সে বললো যে, আমি তো আমার আরামের জন্যে এয়ার কন্ডিশন ক্লাসে ভ্রমণ করবো, তাহলে এটা অপচয় হবে না এবং গোনাহও হবে না। এমনিভাবে কেউ নিজের মনকে খুশি করার জন্যে বা নিজের স্ত্রী-সন্তানকে খুশি করার জন্যে ব্যয় করলো, তাহলে তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তিন স্তরের বাসস্থান জায়েয

হযরত থানভী (রহ.) বাড়ির ব্যাপারে একটি মূলনীতি বলেছেন, যা সব জিনিসের ব্যাপারে ফিট হয়। হযরত বলেন যে, বাড়ি বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। এক হলো, 'বসবাসে'র যোগ্য। অর্থাৎ, আপনি স্বল্প পরিসরের কাঁচা একটি বাড়ি বানান বা শুধু ইট-পাথর দিয়ে একটি বাড়ি বানান, তার উপর টিনের ছাউনি দিন এবার তাতে বসবাস করুন। তাতে না প্লাস্টার থাকবে, না চুন-পেইন্ট থাকবে। এটি হলো, বসবাসের বাড়ীর প্রথম স্তর।

বসবাসের বাড়ীর দ্বিতীয় স্তর হলো, 'আরামদায়ক বসবাস' উপযোগী বাড়ী। যেমন, একটি বাড়ি করলেন। তার ছাদ পাকা করলেন। শোয়ার জন্য খাটের উপর গদি বিছালেন, যাতে আরামে ও শান্তিতে ঘুমাতে পারেন। এসব হলো আরামের ব্যবস্থা। এটা জায়েয। এটা হলো, বসবাসের দ্বিতীয় স্তর।

আর তৃতীয় স্তর হলো বাড়িতে 'সাজসজ্জা করা'। যেমন, পাকা বাড়ি বানালেন। তার সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের জন্যে তাতে প্লাস্টার করালেন, রং ও পেইন্ট করালেন। বাথরুমে টাইলসও লাগালেন। এসবই 'সাজসজ্জার' অন্তর্ভুক্ত। যদি হালাল মাল দ্বারা এসব কাজ করিয়ে থাকেন এবং এর জন্যে কারো থেকে ঋণ নিতে না হয়ে থাকে, তাহলে এটিও জায়েয আছে। বসবাসের বাড়ীর ক্ষেত্রে এ তিনটি স্তরই জায়েয আছে। অর্থাৎ, বসবাসের ব্যবস্থা করা জায়েয, তাতে আরামের ব্যবস্থা করা জায়েয এবং সাজসজ্জা করাও জায়েয।

চতুর্থ স্তর জায়েয নয়

চতুর্থ স্তর হলো 'প্রদর্শনী'। অর্থাৎ, লোকদেখানো। কোন কাজ শুধু এজন্যে করা যে, মানুষ বুঝবে যে, এ অনেক বড় মানুষ। অনেক বড় লোক। মানুষ বলবে যে, তার বাড়ি অতি শানদার। তার গাড়ি বড় শানদার। এর অর্থ এই যে, এসব জিনিস সে নিজের সম্পদের প্রদর্শনীর জন্যে করেছে। এ স্তরটি হারাম। এই 'প্রদর্শনী'র মধ্যে উপকারতো রয়েছে– কারণ, যখন সে নিজের সম্পদের প্রদর্শনী

করবে, তখন মানুষ তাকে বড় লোক মনে করবে। তখন মানুষ তার সম্মান করবে। তাকে শ্রদ্ধা করবে। তার হুকুম মানবে। বিধায় এ প্রদর্শনীর মধ্যে উপকারতো আছে, কিন্তু তা শরীয়ত সম্মত নয়। শরীয়তে এ উপকার গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এটি না থাকার শামিল।

আসল মাপকাঠি শরীয়তসম্মত উপকারিতা

লক্ষ্য করুন, বসবাস করা একটি উপকার, আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা একটি উপকার এবং সাজসজ্জাও একটি উপকার। এ তিন উদ্দেশ্যে যা কিছু খরচ করা হচ্ছে তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর প্রদর্শনীর মধ্যে উপকারতো আছে কিন্তু তা শরীয়তসম্মত নয়। তাই তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় এমন কাজ, যার মধ্যে কোন উপকার নেই। যেমন, টাকা তুলে ফেলে দিলো বা একটি জিনিস অধিক মূল্যে ক্রয় করলো। অথচ সামান্য সতর্কতার সাথে ক্রয় করলে তা সস্তায় পেতো। কিন্তু সে ঐ জিনিসই ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিজের উদাসীনতা, অবহেলা ও অবমূল্যায়নের কারণে অধিক টাকা ব্যয় করলো। এটা অপচয় হলো।

দুই পয়সা খোঁজ করার ঘটনা

একবার আমি হযরত ওয়ালিদ সাহেবের সঙ্গে লাহোর গিয়েছিলাম। তখন আমি ছোট শিশু ছিলাম। লাহোরে আমার বড় ভাই মরহুম জনাব যাকী কায়ফী সাহেব থাকতেন। সেখানে আমি, আব্বা এবং ভাই সাহেব আমরা তিনজন পায়ে হেঁটে লাহোরের কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। রাতের বেলা গাঢ় অন্ধকার ছিলো। এক জায়গায় কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া ছিলো। মানুষ অতি কষ্টে তা পার হতো। মরহুম বড় ভাই সাহেব পকেট থেকে পয়সা বের করছিলেন। ঐ অন্ধকারের মধ্যে পয়সা বের করতে গিয়ে একটি পয়সা মাটিতে পড়ে যায়। একদিকে অন্ধকার, অপর দিকে তাড়া ছিলো। তাছাড়া কাঁটাযুক্ত তারের বেড়াও ছিলো। তাই ভাই সাহেব চিন্তা করলেন যে, এত অন্ধকারের মধ্যে কে এ পয়সা তালাশ করে। একথা চিন্তা করে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। হযরত ওয়ালিদ সাহেব ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী পড়েছে? ভাই সাহেব বললেন, কয়েকটি পয়সা পড়ে গেছে। ওয়ালিদ সাহেব বললেন, তা উঠাচ্ছো না কেন? ভাই সাহেব বললেন, মাত্র দুই পয়সা বা এক আনা হবে। ওয়ালিদ সাহেব বললেন যে, দুই পয়সা হোক বা এক আনা হোক, প্রথমে কিছুক্ষণ তা অবশ্যই খুঁজে দেখো। তারপর যদি না পাওয়া যায় তাহলে ঠিক আছে ফেলে চলে যাও, কিন্তু খোঁজতো অবশ্যই করবে। সুতরাং ওয়ালিদ সাহেব কোথাও থেকে ম্যাচ

আনালেন এবং নিজেই ম্যাচ জ্বালালেন। তারপর বললেন যে, এখন তালাশ করে দেখো। তখন ঐ দুই পয়সা তালাশ করা হলো।

সামান্য অংশেরও মূল্যায়ন করা জরুরী

তারপর বললেন যে, এক পয়সা হোক বা দুই পয়সা হোক, এটি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। এ ব্যাপারে একথা চিন্তা করা যে, এটি সামান্য জিনিস, পড়ে গেছে তো গেছে এবং এভাবে ফেলে চলে যাওয়ায় আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের অবমূল্যায়ন করা হয়।

হযরত থানভী (রহ.) এক মালফূযে বলেন–

'যে নিয়ামতের বেশি অংশ দ্বারা তোমরা উপকৃত হও, তার অল্প অংশের সম্মান করা তোমাদের জন্যে জরুরী'।

অর্থাৎ, যে জিনিসের বড় পরিমাণ দ্বারা উপকার লাভ করো, সেই জিনিসের অল্প পরিমাণও যদি তোমাদের কাছে থাকে, তাহলে তারও সম্মান করো।

তাই হযরত ওয়ালিদ সাহেব বললেন, যে পয়সা পড়ে গেছে, তা এক আনা হোক বা দুই পয়সা হোক, তা অল্প সময়ের জন্যে হলেও অবশ্যই তালাশ করো। তার পিছনে অল্প সময় ব্যয় করো, যাতে আল্লাহর নিয়ামতের অবমূল্যায়ন না হয়। তালাশ না করে ফেলে চলে যাওয়া অপচয় এবং অবমূল্যায়ন। তবে তোমার যদি দানশীলতা করতে হয়, তাহলে কোন অভাবীকে দিয়ে দাও। তাহলে তার কাজে লাগবে। সেটা অপচয় হবে না, বরং দান হবে। সে পয়সা সঠিক ক্ষেত্রে পৌঁছে যাবে।

অবৈধ উপকারের জন্যে ব্যয় করা

যখন আল্লাহ তাআলার দেওয়া ছোট ছোট নিয়ামতের কদর করবে এবং তার জন্যে শোকর আদায় করবে, তখন আল্লাহ তাআলা আরো অধিক দান করবেন। আর যদি না-কদরী (না-শোকরী) করো, তাহলে আযাবের এবং ঐ নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যাহোক, পয়সা হারিয়ে যাওয়ার পর খোঁজ না করা এবং উপকার ছাড়া ব্যয় করা পয়সা এমনিতেই নষ্ট করার দৃষ্টান্ত, আর যেখানে ব্যয় করার পিছনে উপকার তো আছে কিন্তু সে উপকার শরীয়তসম্মত নয়– তার দৃষ্টান্ত হলো, প্রদর্শনীর জন্যে ব্যয় করা। শরীয়তে তা জায়েয নেই। বা পয়সা ব্যয় করে এমন কোন স্বাদ উপভোগ করা হলো, যা জায়েয নেই। এতে ব্যয় করার উপকার তো আছে, কিন্তু তা অবৈধ উপকার। তাই তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অপচয় ও অপব্যয়ের পার্থক্য

আলেমগণ বলেন যে, 'ইসরাফ' বা অপচয় হলো, ব্যাপক অর্থবোধক, আর 'তাবযীর' বা অপব্যয় হলো, বিশেষ অর্থবোধক। 'তাবযীর' শুধু অবৈধ ক্ষেত্রে ব্যয় করলে হয়। অর্থাৎ, নাজায়েয কাজে পয়সা ব্যয় করা হলো, 'তাবযীর' বা অপব্যয়। যেমন, ফিল্ম দেখে বা জুয়া খেলে টাকা ব্যয় করলো, তাহলে এটি হলো 'তাবযীর' বা অপব্যয়। আর এ সমস্ত অপব্যয়ও 'ইসরাফ' তথা অপচয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে যেখানে নাজায়েয এবং হারাম কাজে পয়সা ব্যয় হচ্ছে না, তবে অনর্থক কাজে ব্যয় হচ্ছে, সেটা 'ইসরাফ' তথা অপচয় তো হবে, কিন্তু 'তাবযীর' বা অপব্যয় হবে না। যাহোক, 'ইসরাফে'র মধ্যে যেহেতু 'তাবযীর'ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এজন্যে আমি 'ইসরাফের' সংজ্ঞা এই দিয়েছি যে, এমন জায়গায় টাকা ব্যয় করা, যেখানে উপকার নেই বা উপকার আছে, কিন্তু তা নাজায়েয উপকার।

মুজাহাদা কী?

আমি পূর্বে বলেছিলাম যে, যখন কোন মানুষের 'তারবিয়্যাত' করা হয়, তখন তার যে আসল গন্তব্য– যেখানে তাকে পৌঁছতে হবে, সেই গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বে তাকে প্রস্তুত করা হয়, সেই প্রস্তুতির নামই হলো, 'মুজাহাদা। যেমন, আসল উদ্দেশ্য হলো, হারাম থেকে বাঁচা। কিন্তু সেই মূল লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে প্রস্তুতি হিসেবে কতক সময় কিছু জায়েয জিনিসও ছাড়ানো হয়। হারাম থেকে বাঁচার পথ সুগম করার জন্যে এগুলো ছাড়ানো হয়। একেই 'মুজাহাদা' বলা হয়। এ কারণেই পীর-মাশায়েখ তাদের অধীনে তারবিয়্যাত গ্রহণকারী লোকদের থেকে কোন কোন সময় কিছু জায়েয জিনিসও ছাড়িয়ে থাকেন। যাহোক, অপচয়ের যে মূল নিষিদ্ধ সীমানা রয়েছে, তা তো ঐ সময় আসে, যখন ব্যয় করার পিছনে কোন উপকারই না থাকে বা উপকার থাকলেও তা শরীয়তসম্মত নয়।

ব্যয় না করায় ক্ষতি না হলে ব্যয় করো না

কিন্তু তারবিয়্যাত করার উদ্দেশ্যে হযরত থানভী (রহ.) তাঁর নিকট ইসলাহপ্রার্থী লোকটিকে একথা বলেন যে, ব্যয় করার পূর্বে দেখো যে, ব্যয় না করলে ক্ষতি আছে কিনা? যদি ব্যয় না করার মধ্যে কোন ক্ষতি না থাকে তাহলে ব্যয় করো না। যদিও এর মধ্যে ব্যয় করার জায়েয সুরতও বের হবে। যেমন, ব্যয় করার মধ্যে কোন ক্ষতি তো নেই, কিন্তু ব্যয় করলে উপকার আছে। এখানে ক্ষতি না হওয়া এবং উপকার হওয়া উভয়টি পাওয়া গেলো। আর এমন ক্ষেত্রে

ব্যয় করা জায়েয। কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) তারবিয়্যাতের উদ্দেশ্যে হুকুম দেন যে, 'তোমার জন্যে নির্দেশ হলো, ব্যয় না করার মধ্যে যদি ক্ষতি না থাকে, তাহলেও ব্যয় করবে না। যদিও সেই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয় করা মৌলিকভাবে জায়েযই হোক না কেন।'

ব্যয় করার পূর্বে কোন মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করা

শুধু এতটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং আরো বলেছেন যে, 'যদি ক্ষতি হবে মনে হয় তাহলে কোন মুরুব্বীর সাথে পরামর্শ করো।' অর্থাৎ, ব্যয় করার সময় একথা চিন্তা করো যে, যদি ব্যয় না করি তাহলে কোন ক্ষতি আছে কিনা? চিন্তা করে দেখা গেলো যে, এক্ষেত্রে ব্যয় করা না হলে ক্ষতি হবে। তাহলে এমতাবস্থায়ও ব্যয় করার পূর্বে কোন মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করো। তাকে জিজ্ঞাসা করো যে, এ ব্যয় অসঙ্গত ও অসমীচীন নয় তো? তারপর তিনি যা বলেন তার উপর আমল করো। তুমি নিজে নিজের মত মতো ফায়সালা করো না।

এ চিকিৎসা সবার জন্যে নয়

তবে এ চিকিৎসা সবার জন্যে নয় যে, সবাই ব্যয় করার পূর্বে একথা চিন্তা করবে যে, ব্যয় না করার মধ্যে ক্ষতি আছে কিনা? যদি জানা যায় যে, ব্যয় না করলে ক্ষতি আছে, তবুও ব্যয় করার পূর্বে মুরুব্বীর সাথে পরামর্শ করবে এবং তারপর ব্যয় করবে। এ চিকিৎসা সব মানুষের জন্যে নয়। বরং যে ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অপচয়ে লিপ্ত, তার জন্যে হযরত থানভী (রহ.) এ ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করেছেন।

উপকারিতা ও উপকারহীনতা শায়খের মাধ্যমে নির্ধারণ করাবে

তারপর হযরত থানভী (রহ.) একথাও বলেন যে, 'ক্ষতি' দ্বারা প্রকৃত এবং বাস্তবসম্মত ক্ষতি উদ্দেশ্য। যার মাপকাঠি হলো শরীয়ত। কাল্পনিক ক্ষতি উদ্দেশ্য নয়। যাহোক, আসল কথা ওটাই, যা আমি আপনাদের সামনে আরজ করলাম। তা এই যে, উপকার ছাড়া ব্যয় করা বা অবৈধ উপকারার্থে ব্যয় করা হলো, অপচয়। তবে কোন ক্ষেত্রে উপকার আছে আর কোন্ ক্ষেত্রে নেই তা দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো এক কথায় বলা মুশকিল। কতক সময় মানুষ মনে করে যে, এখানে ব্যয় করাতে উপকার রয়েছে, অথচ বাস্তবে উপকার নেই। এটি এমন এক অবস্থা, যেখানে এসে শায়খের প্রয়োজন পড়ে। তার সামনে বিস্তারিত অবস্থা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করতে হয় যে, আমি এখানে ব্যয় করবো কিনা? যদি

নিয়ম-নীতি বলে দেওয়ার দ্বারাই কাজ হতো তাহলে শায়খের জরুরতই বা কী ছিলো? শুধু অপচয়ের সংজ্ঞা বলে দেওয়া হতো, তার উপকারিতা ও শর্ত ইত্যাদি বলে দেওয়া হতো, সব মানুষ তা পড়ে সে অনুপাতে আমল করতো। কিন্তু এমনটি হয় না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা শুধু কুরআন অবতীর্ণ করেননি, বরং কুরআনের সাথে নবীও পাঠিয়েছেন। কারণ, উপযুক্ত পথ প্রদর্শকের পথ প্রদর্শন ছাড়া মানুষ শুধু পড়ার মাধ্যমে সব কথা বুঝতে পারে না।

পথ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা

হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করেছেন, তাবেয়ীগণ সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে হিদায়াত পেয়েছেন এবং তাবয়ে তাবেয়ীগণ তাবেয়ীগণের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করেছেন। এভাবে আজ পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা চলে আসছে। এর কারণ হলো, নিয়ম ও মূলনীতি একটি পর্যায় পর্যন্ত সঙ্গ দেয়। এর উপরে ঐ সমস্ত নিয়ম-নীতিকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলানোর কাজটি শায়খের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যেই শায়খের শরণাপন্ন হতে হয় এবং তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় যে, এখানে ব্যয় করবো কি করবো না?

এটি প্রকৃত প্রয়োজন নয়

এরপরে আর একটি মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে–

> 'অপচয় সম্পর্কে বলছি যে, যখন কোন জিনিস ক্রয় করতে চাও, তখন চিন্তা করে দেখো যে, এর প্রয়োজন আছে কিনা? যদি অবিলম্বে প্রয়োজনের কথা মনে পড়ে তাহলে তা ক্রয় করো। আর যদি অবিলম্বে প্রয়োজনের কথা মনে না পড়ে, তাহলে ক্রয় করো না। কারণ, যে প্রয়োজনকে আধা ঘণ্টা পর্যন্ত চিন্তা করে করে সৃষ্টি করতে হয়, তা প্রয়োজন নয়। আর যদি অন্তরে খুব চাহিদা হয়, আর উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনের কথা মনে না পড়ে, তাহলে এমতাবস্থায় জিনিসটি ক্রয় করো এরপর ধীরে-সুস্থে চিন্তা করতে থাকো। যদি অপচয় না হওয়া নিশ্চিত হও তাহলে খাও। অন্যথায় দান করে দাও।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯১)

অর্থাৎ, কোন জিনিসের প্রয়োজনীয়তা যদি সাথে সাথে বুঝে আসে তাহলে তো ঠিক আছে, তা ক্রয় করো। কিন্তু আধা ঘণ্টা ধরে চিন্তা করার পর যদি তার ব্যয়ের ক্ষেত্র বুঝে আসে তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা প্রয়োজনীয় নয়।

একটি জিনিস কিনতে খুব মন চাচ্ছে, তখন চিন্তা করলো যে, এর প্রয়োজন আছে কিনা? কিন্তু চিন্তা করার পরও তার প্রয়োজন বুঝে আসলো না। এ সম্পর্কে বলেন যে, ঐ জিনিস ক্রয় করো। তারপর ধীরে-সুস্থে বসে চিন্তা করতে থাকো। যদি অপচয় না হওয়া সুনিশ্চিত হয় তাহলে খেয়ে ফেলো, অন্যথায় দান করে দাও। কারণ, ঐ সময় যদি ক্রয় না করো তাহলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই উপস্থিত সময়ে ক্রয় করো, তবে পরবর্তীতে চিন্তা করে দেখো যে, প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করেছো, নাকি অপ্রয়োজনীয়। চিন্তা করার পর যদি জানা যায় যে, এর প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে তা ব্যবহার করো। আর যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে তা দান করে দাও।

স্ত্রী-সন্তানকে খুশি করার জন্যে ব্যয় করা

এরপর একই মালফূযে তিনি বলেন–

> 'স্ত্রীকে খাওয়ানোও দান করার অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে বিনা প্রয়োজনেও যদি কোন জিনিস ক্রয় করো, তাহলে সেটাও অপচয় নয়। কারণ, স্ত্রীর মনস্তুষ্টিও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। তবে শর্ত হলো, এজন্যে সামর্থ্যের অধিক ঋণ না করতে হবে।' (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, স্ত্রীর মন খুশি করার জন্যে বিনা প্রয়োজনে কোন জিনিস ক্রয় করাও অপচয় নয়। স্ত্রীর সাথে সন্তানও অন্তর্ভুক্ত। এটা কেন? তার কারণও তিনি বর্ণনা করেছেন যে, স্ত্রীর মনকে খুশি করাও কাঙ্ক্ষিত বস্তু। মূলকথা এটাই, যা পূর্বে বলেছি যে, ব্যয় করার পিছনে কোন ফায়দা থাকতে হবে। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, নিজেরই ফায়দা হতে হবে। অন্যের ফায়দাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, অন্যের মনকে খুশি করা এবং অন্যের মনোরঞ্জন করাও ফায়দার অন্তর্ভুক্ত। সে মনোরঞ্জন স্ত্রীর হোক, সন্তানের হোক, মা-বাবার হোক, ভাই-বোনের হোক, তাও একটি উল্লেখযোগ্য ফায়দা। এর পিছনে যা কিছু ব্যয় করা হবে, তাও অপচয় নয়।

উস্তাদের সম্মানে ৫২ প্রকারের খাবার

হযরত থানভী (রহ.)-এর নিকট একবার তাঁর উস্তাদ হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) তাশরীফ আনেন। আমি আমার শাইখের কাছে শুনেছি যে, হযরত থানভী (রহ.) তাঁর উস্তাদের সম্মানে বায়ান্ন প্রকারের খানা তৈরি করান। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) যখন দস্তরখানে বায়ান্ন প্রকারের খাবার দেখলেন, তখন বললেন যে,

ভাই! তুমি এটা কী করেছো! হযরত থানভী (রহ.) বললেন যে, সত্য কথা তো এই যে, এখনো মন ভরেনি। মন তো চাচ্ছিলো, আরো তৈরি করাই।

এখন অন্য মানুষ তো এ বায়ান্ন প্রকারের খাবার দেখে বলবে যে, এটা তো অপচয় হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে উস্তাদের সম্মান উদ্দেশ্য ছিলো। আর এটাও জানা ছিলো যে, কোন জিনিসই নষ্ট হবে না। বরং যা বাঁচবে তা অবশ্যই কোন আল্লাহর বান্দার কাজে আসবে। আল্লাহ না করুন, যদি নষ্ট হতো তাহলে অবশ্যই তা অপচয় হতো। কিন্তু সেখানে তো এটা নিশ্চিত ছিলো যে, এর কিছুই নষ্ট হবে না। আর কোন প্রকারের প্রদর্শনীও সেখানে ছিলো না যে, মানুষকে দেখানোর জন্যে এই বায়ান্ন প্রকারের খাবার তৈরি করিয়েছেন। বরং নিজের মনের দাবিতে এবং উস্তাদের খেদমত এবং উস্তাদের সম্মানের উদ্দেশ্যে এগুলো তৈরি করিয়েছিলেন। তাই এতে কোন অপচয় ছিলো না।

নিয়তের ব্যবধানে গোনাহ্ ও সওয়াব

এ কাজটিই যদি কোন মানুষ এ নিয়তে করে যে, ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে থাকবে যে, অমুক ব্যক্তি এমন দাওয়াত করেছিলো যে, তাতে বায়ান্ন প্রকারের খাবার ছিলো। তখন এ কাজটিই অপচয়ও হবে এবং হারামও হবে। একইভাবে বিবাহ-শাদীতে উপহার-উপঢৌকন দেওয়া হয়। এ উপহার যদি আন্তরিক মহব্বতের কারণে দেয় যে, এ ব্যক্তি আমার নিকট-আত্মীয়। তার খেদমত করতে মন চায়। কিছু দিয়ে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয়। তাহলে এটি সুন্নাত আমল এবং এতে বিরাট সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে। তখন এটি বরকতের জিনিস। আর এ কাজটিই যদি এ নিয়তে করে যে, এ উপহার দেওয়াতে নাম হবে যে, অমুক ব্যক্তি বিবাহে এ উপহার দিয়েছে, তখন এ জিনিসই অপচয় এবং গোনাহ। আল্লাহ্ তাআলা আপন অনুগ্রহে কার্পণ্য থেকেও আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং অপচয় থেকেও হেফাযত করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বাহাত্তরতম মজলিস

অপচয় থেকে বাঁচার উপায়

অপচয় থেকে বাঁচার উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা সাহেব (রহ.) এ মালফূযের শিরোনাম দিয়েছেন– 'অপচয় থেকে বাঁচার উপায়'। এ মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) তাঁর একজন মুরীদকে কিছু নসীহত করেছেন। সে নসীহতগুলো এ মালফূযে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত নসীহতের উপর আমল করা হলে ইনশাআল্লাহ অপচয় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। নসীহতগুলো ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে এগুলোর উপর আমল করার দ্বারা অন্যান্য দোষ থেকেও মুক্তি লাভ হবে। তিনি প্রথম নসীহত এই করেন যে–

> ১. 'আল্লাহওয়ালাদের পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করো। বিশেষ বেশ-ভূষার লোকদের পন্থা অবলম্বন করো না। প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও রীতি-নীতির মোটেও অনুগামী হয়ো না।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯২)

আল্লাহওয়ালাদের বেশ-ভূষা অবলম্বন করো

আল্লাহ তাআলা বৈধ জিনিসের পরিধি অনেক বিস্তৃত করেছেন। তবে সেই বৈধ জিনিসগুলোর মধ্যে কিছু এমন রয়েছে, যেগুলোকে প্রত্যেক যুগের আল্লাহর ওলীগণ গ্রহণ করে থাকেন। ফলে ঐ সমস্ত বৈধ জিনিসের মধ্যে বরকত হয়ে থাকে। এর অর্থ এ নয় যে, সেগুলোর বিপরীত করাতে গোনাহ হয়। একইভাবে আল্লাহওয়ালাদের অবলম্বনকৃত সব পদ্ধতি সুন্নাত হওয়াও জরুরী নয়। যেমন,

'পোশাক'। আল্লাহ তাআলা বৈধ পোশাকের পরিধি অনেক বিস্তৃত করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশেষ কোন পোশাক পরতে বাধ্য করেন নাই যে, এই পোশাক পরো। শরীয়ত এমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি।

প্রচলিত প্রথা ও ফ্যাশনে আবদ্ধ হয়ো না

এক প্রকারের পোশাক হলো এমন, যা যুগের আলেম ও ওলীগণ অবলম্বন করেছেন, আরেক প্রকারের পোশাক হলো সেটি, যা সাধারণ মানুষেরা অবলম্বন করেছে। সাধারণ মানুষেরা যে ধরনের পোশাক অবলম্বন করেছে, তাও গোনাহ নয়। তাও বৈধ পোশাকেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কোন বিশেষ ধরনের পোশাকের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। যার মধ্যে শরীয়তের নিষিদ্ধ কিছুও বিদ্যমান নেই। যেমন পাঞ্জাবী, পায়জামা ও ওয়াস্কোট পরার প্রচলন চলছে। তাহলে এটা কোন গোনাহ বা নাজায়েয কাজ নয়, বরং এটাও বৈধ। তবে তোমরা আল্লাহওয়ালাদের পদ্ধতি অবলম্বন করার চেষ্টা করো এবং বিশেষ বেশ-ভূষার অধিকারী লোকদের পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করো না। বিশেষ বেশ-ভূষার লোক বলতে ফ্যাশনপূজারী লোক উদ্দেশ্য। প্রচলন ও প্রথার মধ্যে আবদ্ধ হয়ো না। অর্থাৎ, এটা দেখো না যে, বর্তমানে তো এ ধরনের পোশাকের ফ্যাশন চলছে, তাই এ পোশাকই পরতে হবে। আর অমুক পোশাক আউট অব ফ্যাশন হয়ে গেছে, তাই তা পরিত্যাগ করা উচিত।

বুযুর্গদের অনুরূপ পোশাক পরা

এখানে কয়েকটি বিষয় বুঝতে হবে, যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের অনিয়ম হয়ে থাকে। প্রথম কথা এই যে, যে সমস্ত লোক আল্লাহওয়ালাদের পোশাকের অনুরূপ পোশাক পরার চেষ্টা করে। যেমন, আল্লাহওয়ালাগণের কিস্তি টুপি বা গোল টুপি দেখে তাদের নকল করে বা আল্লাহওয়ালাগণের সেলীম শাহী (নাগড়া) জুতা দেখে তাদের নকল করে বা আল্লাহওয়ালাগণের জামার মতো জামা পরতে চেষ্টা করে। বিশেষ করে যখন কোন ব্যক্তি নতুন নতুন দ্বীনের পথে চলতে আরম্ভ করে, তখন সে বুযুর্গদের নকল করার চেষ্টা করে।

তখন মানুষ আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, বুযুর্গগণের লেবাস-পোশাক নকল করার এবং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করার কী দরকার রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কিস্তি টুপি পরতেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এমন জুতা, এমন পাঞ্জাবী এবং এমন পায়জামা পরতেন? পাঞ্জাবীর ব্যাপারে তো একথা বলতে পারি যে, তিনি পাঞ্জাবী

পরেছেন। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঞ্জাবী আমাদের পাঞ্জাবী থেকে ভিন্ন রকম ছিলো। আমাদের পাঞ্জাবী খাটো হয়ে থাকে, আর তাঁর পাঞ্জাবী ছিলো লম্বা। এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়জামা পরা প্রমাণিত নেই, তবে তিনি পায়জামা পসন্দ করতেন একথা প্রমাণিত আছে। কিন্তু এ টুপি ও জুতা পরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। এ সদরিয়া এবং ওয়াস্কোট পরা প্রমাণিত নয়। তাই মানুষ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এ সমস্ত পোশাক পরা যেহেতু সুন্নাত নয়, তাহলে মানুষ এগুলোর প্রতি এতো মনোযোগ দেয় কেন? এবং এগুলোর প্রতি এত গুরুত্বারোপ করে কেন?

একে সুন্নাত মনে করা ভুল

এর উত্তর এই যে, এ গুরুত্ব এ কারণে দেওয়া হয় না যে, এগুলো পরা সুন্নাত। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি কিস্তি টুপি বা পাঁচ কল্লি টুপি সুন্নাত মনে করে পরে, তাহলে এটা পরা বিদআত এবং গোনাহ হবে। বরং এগুলোর প্রতি এ কারণে গুরুত্বারোপ করা হয় যে, প্রত্যেক যুগে আলেম এবং নেককারগণ যে সমস্ত পোশাক পরেন, সেগুলো পরাতে ফায়দা রয়েছে। সে ফায়দা এই যে, এমন পোশাক পরার ফলে তাদের সাথে নৈকট্য লাভ হয় এবং তাদের সাদৃশ্য লাভ হয় এবং এর দ্বারা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা হয় যে, আমরা যখন তাদের পোশাক গ্রহণ করেছি, তখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের নীতি-চরিত্র এবং জীবনাদর্শ গ্রহণ করারও তাওফীক দান করবেন। তাই এ পোশাককে সুন্নাত মনে করে অবলম্বন করা ভুল এবং একে জরুরী মনে করা তো মারাত্মক ভুল।

হাফেয মুহাম্মদ আহমাদ (রহ.)-এর ঘটনা

যেমন, আমাদের বুযুর্গগণ যখনই জুতা পরতেন সেলিম শাহী (নাগড়া) জুতা পরতেন। হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। তিনি হযরত কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেব (রহ.)-এর পিতা ছিলেন। সে সময় ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসন চলছিলো। বৃটেনের পক্ষ থেকে এখানে শাসক নিয়োগদান করা হতো। তাকে 'ভাইসরয়' বলা হতো। তৎকালীন 'ভাইসরয়' হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ (রহ.)কে সরকারী সম্মানসূচক 'শামসুল উলামা' খেতাব দিয়েছিলো। একবার সেই ভাইসরয় সাক্ষাত দানের জন্যে হযরতকে দিল্লীতে ডেকে পাঠায়। দেশের শাসক তাঁকে সসম্মানে আহ্বান করেছে তাই তিনি সাক্ষাতের জন্যে তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি যখন মহলে প্রবেশ করতে যান, তখন দারোয়ান ভদ্রলোক তাঁকে বাধা দিয়ে বলে- এ জুতা

পরে আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না। তখন তিনি পাটের রশি দ্বারা তৈরী অতি সাধারণ জুতা পরেছিলেন। বর্তমানে প্রচলিত সেলিম শাহী নাগড়া জুতা তো খুবই সূক্ষ্ম এবং দামী হয়ে থাকে। কিন্তু সে যুগের পাটের রশি দ্বারা তৈরী অতি সাধারণ জুতা খুব মোটা হতো। যাহোক, সে বললো যে, আপনি এ জুতা পরে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবেন না। আপনাকে বুট জুতা পরে যেতে হবে।

আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন নেই

হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব (রহ.) বললেন যে, আমি নিজে তো ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে আবেদন করিনি। তাই আমার সাক্ষাত করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনিই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখন তিনি যদি সাক্ষাতের জন্যে এ শর্ত আরোপ করেন যে, আমার নিজের পসন্দের জুতা খুলে তার পসন্দের জুতা পরবো, তাহলে আমি তার সাথে সাক্ষাতের এ দাওয়াত কবুল করছি না। আমি মাযুর। আর যদি সে আমার পসন্দের পোশাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাত দিতে তৈরি থাকে তাহলে আমিও তৈরি আছি। আমার একথা তাকে জানিয়ে দাও। সে সাক্ষাত দিতে না চাইলে আমি ফিরে যাচ্ছি। একথা বলে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

এবার তো দারোয়ানের সব ভদ্রলোকী উধাও হয়ে গেলো। সে ভাবলো যে, ভাইসরয় যখন একথা জানতে পারবেন যে, মাওলানা সাহেব এসেছিলেন এবং এ কারণে ফিরে গেছেন, তাহলে তো আমার খবর হয়ে যাবে। তাই সে ভিতরে গিয়ে জানালো যে, অমুক মাওলানা সাহেব তো একথা বলছে। ভাইসরয়ও শুনে অসন্তুষ্ট হলো যে, তুমি মাওলানার সাথে এ কী আচরণ করেছো! তাড়াতাড়ি তাঁকে ভেতরে ডেকে আনো। তখন তাঁকে সাথে সাথে ভেতরে ডেকে নিলো।

তিনি এমন জুতা কেন পরেছেন?

হযরত মাওলানার এমন জুতা পরার প্রতি গুরুত্বারোপ করার কারণ এটা ছিলো না যে, এরূপ জুতা পরা সুন্নাত। তাই কেউ যেন এমন আপত্তি উত্থাপন না করে যে, এমন জুতা পরা কি কোন ওয়াজিব-ফরয ছিলো? তিনি যদি ঐ সময় অন্য কোন জুতা পরে যেতেন তাহলে তো হারাম আর গোনাহ হতো না। কিন্তু তিনি দুই কারণে এমন জুতা পরার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

একটি কারণ তো এই ছিলো যে, তিনি নিজের উস্তাদ, আলেম, নেককার ও বুযুর্গগণকে এমন জুতা পরতে দেখেছেন। তাই তিনি তাদের মতো বেশ ধারণ করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় কারণ এই ছিলো যে, বিষয়টি আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্যের পরিপন্থী ছিলো যে, এক দিকে তো আলেম ব্যক্তিকে ডাকা হচ্ছে, অপর দিকে নিজের পসন্দের পোশাক ও জুতা পরার শর্ত আরোপ করা হচ্ছে। এ বিষয়টি আত্মমর্যাদার পরিপন্থী ছিলো। বিধায় হযরত এটা মেনে নেননি।

গুরুত্বারোপ করা কি বিদআত?

এখন কেউ কেউ এ পর্যন্ত বলে যে, তোমরা যে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করো যে, পোশাক এমন হতে হবে, জামা এমন হতে হবে, পায়জামা এমন হতে হবে, জুতা এমন হতে হবে, টুপি এমন হতে হবে, এভাবে গুরুত্বারোপ করা বিদআত। কারণ, হাদীস দ্বারা এমন পোশাক, এমন জুতা, এমন টুপি প্রমাণিত নয়। অথচ তোমরা এগুলোর প্রতি সুন্নাত-ওয়াজিবের মতো গুরুত্বারোপ করছো। ফলে এটা التزام مالم يلزم (এমন বিষয়কে আবশ্যকীয় মনে করা যেটা শরীয়ত আবশ্যকীয় করেনি।) হলো, তাই এটা বিদআত।

প্রিয়জনের সাদৃশ্য

একথা ঠিক নয়। কারণ, এ পোশাক, এ জুতা এবং এ টুপিকে সুন্নাত বা ওয়াজিব মনে করে গুরুত্বারোপ করা হয় না। বরং এগুলোর প্রতি এ কারণে গুরুত্বারোপ করা হয় যে, এগুলো আমাদের বুযুর্গ, আমাদের উস্তাদ এবং আমাদের মাশায়েখের অনসৃত পদ্ধতি। আমরা তাঁদের পদ্ধতি অবলম্বন করলে, তাদের বেশ ধারণ করার বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাদের স্বভাব-চরিত্রও তাঁদের মতো বানিয়ে দিবেন।

تیرے محبوب کی یارب شباہت لیکر آیا ہوں
حقیقت اسکوتو کردے میں صورت لیکر آیا ہوں

'হে আল্লাহ! তোমার প্রিয়জনের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এসেছি। আমি তাঁদের সুরত নিয়ে এসেছি, আপনি একে হাকীকত বানিয়ে দিন।'

বুযুর্গগণের পোশাক পরার দ্বারা তাঁদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়ে থাকে। এর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

অনাবশ্যক বিষয়কে আবশ্যকীয় মনে করা বিদআত

অপর দিকে কিছু মানুষ বাস্তবিকই মনে করে যে, এমন বেশ ধারণ করা এবং এমন পোশাক পরিধান করা ফরয, ওয়াজিব বা কমপক্ষে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তো

সূচিপত্র

অবশ্যই। এই পোশাক এবং এই বেশ থেকে কেউ বিমুখ থাকলে তার উপর আপত্তি করা হয়। তাকে এ বলে তিরস্কার করা হয় যে, সে এমন পোশাক কেন পরে না। এভাবে গুরুত্বারোপ করা এবং আবশ্যক বানিয়ে নেওয়া এ বেশ এবং পোশাককে বাস্তবিকই বিদআত বানিয়ে দেয়। যেমন, এ নিয়ে আপত্তি করা যে, অমুক পাঁচ কল্লি টুপি কেন পরেনি? অমুক এ ধরনের জুতা কেন পরেনি? অমুক এমন ধরনের পোশাক কেন পরেনি? যখন এমন ধরনের পোশাক এবং বেশ ধারণ না করার কারণে ফরয-ওয়াজিব তরক করার মতো আপত্তি করা হবে, তখন এ পোশাক এবং এ বেশ বিদআত হয়ে যাবে। আমাদের মতো লোকদের মধ্যে অনেক সময় এমন কথা হয়ে থাকে।

আসল কথা তো শুরু হয়েছিলো এখান থেকে যে, আল্লাহওয়ালাদের পোশাক ধারণ করো। এতে বরকত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে এ পোশাককে এ পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, তা ফরয-ওয়াজিবের স্তরে চলে যায়। ফলে এ পোশাক বিদআত হয়ে যায়। এটি অতি মারাত্মক ব্যাপার।

বৈধ বিষয়ে আপত্তি করাটাই একটি অবৈধ কাজ

হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) বড় চমৎকার কথা বলতেন। আর একথা তিনি এমনিতেই বলতেন না, বরং প্রথমে তিনি আলেমদের মজলিসে পেশ করে সত্যায়ন করিয়েছেন। তিনি আলেমদেরকে বলেছেন– আমার মাথায় একটি কথা এসেছে, আপনারা চিন্তা করে বলুন, এটি ঠিক, না কি অঠিক? যখন আট-দশটি মজলিসে একথা সত্যায়িত হয়েছে যে, একথা সম্পূর্ণ ঠিক, তখন তিনি কথাটিকে একটি মূলনীতি হিসেবে মানুষের সামনে বর্ণনা করেন যে– 'বৈধ বিষয়ে আপত্তি করাটাই একটি অবৈধ কাজ।'

অর্থাৎ, যে কাজটিকে শরীয়ত নিষিদ্ধ, হারাম ও নাজায়েয সাব্যস্ত করেনি, এমন কাজ কেউ যদি করে, তাহলে তাকে তিরস্কার করা এবং গালমন্দ করাটাই নিষিদ্ধ এবং পরিত্যাজ্য বিষয়।

'তারবিয়াতাধীন' লোকদের বিষয় ভিন্ন

উপরোক্ত নিয়মটি হলো, সর্বসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ অন্যদের তারবিয়াতের অধীনে রয়েছে। তাদের থেকে শিক্ষা, দীক্ষা ও ইসলাহ্ গ্রহণ করছে। যেমন, উস্তাদের জন্যে শাগরিদ, পীরের জন্যে মুরীদ এবং বাবার জন্যে সন্তান। তাদের ব্যাপারটি অন্য লোকদের

থেকে ভিন্ন। কারণ, অনেক সময় তাদেরকে মুস্তাহাব কাজের জন্যে তাকীদ করা হয় এবং মুস্তাহাব কাজ না করার কারণে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়। এ সমস্ত লোককে মুস্তাহাব কাজের প্রতি তাকীদ দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদের 'তারবিয়াত' করা। যাতে করে মুস্তাহাব আদায় করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এ কারণে 'তারবিয়াতাধীন' লোকেরা এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, কেউ তার শাগরিদকে বা মুরীদকে বা নিজের সন্তানকে মুস্তাহাব কাজ বর্জন করার কারণে তিরস্কার করছে, তাহলে তা ঠিক আছে।

তুমি কি খোদা?

কিন্তু সাধারণ মানুষ– যারা তোমার 'তারবিয়াতের' অধীন নয়, তাদের ব্যাপারেও যদি তুমি এটি চাও যে, এরাও আমার মতো হোক বা আমি যেমন চাই তেমন হোক। তাহলে তুমি আগে বলো যে, তুমি কি খোদা? নাকি তুমি খোদার পয়গম্বর? নাকি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এর ঠিকাদার বানিয়েছেন যে, সব মানুষ যেন তোমার মতো হয়ে যায়? বরং শরীয়ত যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যদি কোন মানুষ সেই সীমার মধ্যে থেকে কোন 'মুবাহ' কাজ করে তাহলে তোমার আপত্তি করার কোন অধিকার নেই এবং ঐ ব্যক্তিকেও খারাপ মনে করার কোন অধিকার তোমার নেই।

আল্লাহওয়ালাদের বেশ ধারণ করো

যাহোক, আল্লাহওয়ালাদের পদ্ধতি অবলম্বন করার বিষয়ে যত্নশীল হওয়া উচিত। এতেই বরকত রয়েছে। এতেই কল্যাণ রয়েছে। এতেই নিরাপত্তা রয়েছে। এরই বরকতে স্বভাব-চরিত্র এবং আচার-ব্যবহারও তাঁদের মতো বানানোর তাওফীক আল্লাহ তাআলা দান করেন। তবে এ নিয়তে তাঁদের পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বন করতে হবে যে, আমি যখন আমার বাহ্যিক দিকের ক্ষেত্রে আল্লাহওয়ালাদের পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করবো, তখন এর শুভ পরিণতি হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তর জগতকেও তাঁদের মতো বানিয়ে দিবেন।

খারাপ নিয়তের ফলে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে

কিন্তু যদি এ নিয়তে বুযুর্গদের বেশ ধারণ করা হয় যে, আমাকেও দেখতে বুযুর্গ মনে হবে। ফলে মানুষ আমাকে সম্মানের চোখে দেখবে, তাহলে এ নিয়তের ফলে উল্টা বিপদ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এ নিয়তে তাঁদের বেশ ধারণ করতে হবে যে, তাঁদের বেশ ধারণ করার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের মতো স্বভাব-চরিত্র দান করবেন।

বিশেষ বেশ-ভূষার অনুগামী হওয়া ভালো নয়

দ্বিতীয় কথা হযরত বলেছেন যে, 'বিশেষ বেশ-ভূষার লোকদের পদ্ধতি অবলম্বন করো না।' 'বিশেষ বেশভূষা'র অর্থ হলো, কেউ নিজের জন্যে নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে যে, আমি সব সময় এ ধরনের টুপি পরবো। এ ধরনের জামা পরবো। এ ধরনের মোজা পরবো। এ ধরনের জুতা পরবো। তারপর এই বিশেষ ধরনের পোশাকের প্রতি সে এতো বেশি গুরুত্বারোপ করেছে যে, ঐ পোশাক সে ব্যক্তির পরিচিতি হয়ে গেছে। এটা হলো, 'বিশেষ বেশভূষা'। এর সম্পর্কে হযরত বলেন যে, আল্লাহর পথের পথিকদের জন্যে এমন করা ভালো নয়। কারণ, এতে করে মানুষ তাকে দেখিয়ে বলে যে, এ ব্যক্তি এমন 'বিশেষ বেশভূষা'র অধিকারী যে, যখনই সে টুপি পরে তো এ ধরনের টুপি পরে। সব সময় সাদা রঙের শেরওয়ানী পরে। সব সময় এ ধরনের জুতা পরে। এ সম্পর্কে হযরত বলেন যে, এমন কাজ কেন করো যে, মানুষের মাঝে তোমার বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। বরং যখন সহজে যা পাওয়া যায় তাই গ্রহণ করবে। যে পোশাকে আরাম বোধ হয়, তাই পরবে।

আকবার এলাহাবাদীর একটি ঘটনা

মরহুম আকবার এলাহাবাদী সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। তার সম্পর্কে আমি আমার আব্বার কাছে শুনেছি যে, লোকেরা একবার তাকে লুঙ্গি পরে কলারওয়ালা শার্ট গায়ে দিয়ে, মাথায় হেট লাগিয়ে সড়ক দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে। এখন যেই তাকে দেখে সেই অবাক হয় যে, এ কেমনতর পোশাক হলো। একজন তো তাকে জিজ্ঞাসাই করে বসলো, জনাব! আপনি এ কেমনতর পোশাক পরেছেন? উত্তরে তিনি বললেন– তোমার কী সমস্যা? আমার যেটাতে আরামবোধ হয়েছে আমি তাই পরেছি। আমার লুঙ্গি পরতে আরামবোধ হয়েছে তাই লুঙ্গি পরেছি। কলারওয়ালা শার্ট পরতে আরামবোধ হয়েছে তাই কলারওয়ালা শার্ট পরেছি। রোদ্র ছিলো তাই হেট পরেছি। আমার আরাম মতো আমি পোশাক পরেছি। তাতে তোমার কী সমস্যা?

মন মতো খাও মন মতো পরো

প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, 'খাবে নিজের পসন্দে এবং পরবে অন্যের পসন্দে।' অর্থাৎ, যার মনে যেটা ভালো লাগবে সে সেটা খাবে। অন্যের পসন্দ মতো তুমি খাচ্ছো এমন যেন না হয়। এটা অর্থহীন কাজ। তাই সেটা খাবে যেটা তোমার ভালো লাগবে। যেটা তোমার রুচিসম্মত হবে। আর পরবে এমন পোশাক যা

মানুষ পসন্দ করবে। অর্থাৎ, যুগচাহিদা অনুপাতে পোশাক পরবে। এটা প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ।

কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, এ প্রবাদটি সঠিক নয়। বরং মানুষ খাবেও নিজের পসন্দ মতো এবং পরবেও নিজের পসন্দ মতো। খাওয়ার ক্ষেত্রে যে নিয়ম পরার ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম। তোমার পসন্দ মতো খাবার তুমি খাবে এবং তোমার পসন্দ মতো পোশাক তুমি পরবে। তোমার পসন্দের পোশাক একটি, কিন্তু যুগের ফ্যাশন বদলে যাওয়ার কারণে তুমি যুগের চাহিদার অনুসরণ করে তোমার অপসন্দনীয় পোশাক তুমি পরলে এমন যেন না হয়। এমন করা নির্বুদ্ধিতা।

যুগচাহিদার অনুসরণে অপচয় হয়

যুগচাহিদার অনুসরণ করলে অবশ্যই অপচয় হবে। কারণ, পূর্বের বানানো পোশাক এখন আর কাজে লাগবে না। কারণ, আগের ফ্যাশন আর নেই। তাই নতুন পোশাক তৈরি করতে হবে। তাই ফ্যাশনপূজার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো অপচয়।

দু'টি বিষয় অবলম্বন করো

যাহোক, হযরতের মালফূয পড়ে বুঝে আসলো যে, সব যুগে আলেম ও নেককার লোকদের পোশাক এবং তাঁদের পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা উচিত। এক্ষেত্রে এ নিয়ত থাকা উচিত যে, আমি তাঁদের পোশাক এজন্য পরছি, যেন আল্লাহ তাআলা তাঁদের বেশ ধারণ করার বরকতে তাঁদের মতো স্বভাব-চরিত্রও আমাকে দান করেন। তবে এ পোশাক এবং পদ্ধতিকে সুন্নাত বা ওয়াজিব মনে করবে না। তাই অন্য কোন মানুষ এ পদ্ধতি এবং এ পোশাক ছাড়া শরীয়তের বৈধ সীমারেখার মধ্যে থেকে অন্য কোন পোশাক পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাকে বাধাও দিবে না এবং খারাপও মনে করবে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, বিশেষ কোন পদ্ধতিকে এমনভাবে আবশ্যক বানিয়ে নেওয়া যে, কখনোই এর ব্যতিক্রম করে না, এটাও ভালো নয়। যখন যে পোশাক জুটবে সে পোশাকই পরবে। কখনো এক রকম টুপি পরলো, কখনো আরেক রকম টুপি পরলো। কখনো এক রকম জুতা পরলো কখনো অন্য রকম জুতা পরলো। এক ধরনের পোশাকের প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করা উচিত নয়। এক পোশাকের প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করায় 'অনাবশ্যককে আবশ্যক করে নেওয়া'র আশংকাও রয়েছে। দ্বিতীয়ত: এতে করে একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়, যা কিনা অকৃত্রিমতা এবং বিনয়ের পরিপন্থী।

ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো

হযরত থানভী (রহ.) দ্বিতীয় উপদেশ এই দিয়েছেন যে–

> 'তীব্র প্রয়োজন ছাড়া ঋণ করবে না। তাতে যদি সমাজের প্রচলিত প্রথা পুরা করা না যায়, না যাক। ঋণগ্রস্ত হলে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। এর পরিণতি খুবই খারাপ। প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহওয়ালাদের অনুসৃত পথেই চলা উচিত।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯২)

এই নসীহতের মধ্যে হযরত 'অপচয়' থেকে বাঁচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করেছেন। তাহলো ঋণ করা থেকে দূরে থাকো। তীব্র প্রয়োজন ছাড়া ঋণ করো না। পরিস্থিতির শিকার হয়ে পেটে পাথর বাঁধতে হলে তাই করো, কিন্তু ঋণ নিয়ো না। যদিও মানুষ কোন কোন সময় ক্ষুধার তাড়নায় ঋণ করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় কেউ ঋণ করলে তা হারাম বা নাজায়েয হবে না। কিন্তু নিজের মন-মানসিকতা এভাবে গড়বে যে, কোন গায়রুল্লাহর সামনে হাত পাতবো না। ভিক্ষার জন্যেও না ঋণের জন্যেও না। এমন চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলো।

ব্যয় কমাও

যখন তুমি ঋণ না নেওয়াকে তোমার নীতি বানিয়ে নিবে, তখন আপনা আপনি তোমাকে ব্যয় কমাতে হবে। কারণ, এমতাবস্থায় নিজের আয় অনুপাতে ব্যয় করতে হবে। কারণ, আয় থেকে ব্যয় বেশি করলে তখন ঋণ করতে হবে। আর তুমি নিয়ম বানিয়ে নিয়েছো যে, ঋণ করে কোন কাজ করবে না।

সামর্থ্যের অধিক কাজ করা

আমাদের সমাজে এক মারাত্মক ব্যাধি বিস্তার লাভ করেছে যে, মানুষ তার সামর্থ্যের চেয়ে অধিক ব্যয় করে। আর সেই ব্যয় যখন তার সীমিত আয় দ্বারা সম্ভব হয় না তখন ঋণ করে। এভাবে ঋণের পর ঋণ করাতে চরম অবস্থা ধারণ করে। ঋণ করার এ বদ অভ্যাস আমাদের ব্যক্তি পর্যায়ে তো ছিলই, কিন্তু এখন জাতীয় পর্যায়ে আমাদের পুরা দেশও ঋণের উপর চলছে।

আয় বুঝে ব্যয় করো

পূর্বের মুরুব্বীরা বলতেন যে, 'আয় বুঝে ব্যয় করো।' অর্থাৎ, তোমার সামর্থ্য অনুপাতে ব্যয় করো। তারচেয়ে বেশি করো না। কিন্তু বর্তমানের নিয়ম হলো, ব্যয় অনুপাতে আয় করো। আয় না বাড়লে ভিক্ষা করো। পরিণতিতে

আজ পুরা জাতি ঋণগ্রস্ত। বর্তমানে আমাদের দেশের বাজেটের ৪৬% শুধু ঋণ পরিশোধ করতে ব্যয় হয়। শয়তান সুদের এমন আবর্ত সৃষ্টি করেছে যে, সমগ্র বিশ্ব আজ ঋণের তলে ডুবে আছে। শুধু পাকিস্তানই নয়, বরং আমেরিকাও এত বড় ঋণের তলে ডুবে আছে যে, তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু সেটি ধনী রাষ্ট্র বিধায় ঋণের বোঝা বহন করতে পারছে। কিন্তু এটি এমন এক বেলুন, যা যে কোন মুহূর্তে ফেটে যাবে। আমাদের দেশ যেহেতু গরীব দেশ, তাই ঋণের বিরাট বোঝা আমাদের মাথায় চেপে আছে। বর্তমানে আমাদের স্বাধীনতা এবং আমাদের মান-সম্মান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যাহোক, বিনা প্রয়োজনে ঋণ করো না।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা নামায পড়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্বীকৃতি

হাদীস শরীফে এসেছে যে, জানাযার নামায পড়ার জন্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি লাশ আনা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন– তার কোন ঋণ আছে কি? সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) বললেন– তার দায়িত্বে ঋণ আছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ 'তোমরাই তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়ো। আমি পড়বো না।' অপর দিকে নিম্নোক্ত হাদীসটিও মনে রাখা উচিত।

সাধারণ এক মহিলার কবরে জানাযার নামায আদায়

অপর দিকে এ হাদীসটিও মনে রাখা উচিত যে, এক দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, একজন মহিলা, যে মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতো তাকে অনেক দিন ধরে দেখছি না, সে কোথায় গেছে? এক বর্ণনায় আছে যে, সে একজন পুরুষ, আর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সে একজন মহিলা। সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, সে মারা গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে জানালে না কেন?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে সময় জানাযার নামাযে অংশ নিতে আপনার কষ্ট হতো, তাই আপনাকে জানাইনি।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না এমন করবে না। কেউ মারা গেলে আমাকে জানাবে।

তারপর তিনি বললেন, তার কবর কোথায় আমাকে দেখাও। সুতরাং তিনি তার কবরে গেলেন এবং কবরের উপর জানাযার নামায পড়লেন। তারপর তিনি বললেন–

إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمًا فَيُنَوِّرُهَا اللّٰهُ بِصَلَاتِيْ (مسند احمد ج ۲، ص ۳۸۸)

'এ সমস্ত কবর অন্ধকারে ভরা থাকে। আল্লাহ তাআলা আমার নামায পড়ার বরকতে সেগুলোতে নূর পয়দা করে দেন।' (মুসনাদে আহমাদ)

এ কারণে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন যে, এটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাই অন্য কোন মানুষ কবরের উপর নামায পড়বে না। কারণ, 'ওলী' ছাড়া অন্যের জন্যে কবরের উপর নামায পড়া জায়েয নেই। তবে 'ওলী' জানাযা নামায না পড়ে থাকলে তার জন্যে কবরের উপর নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে।

লক্ষ্য করুন, একদিকেতো এ অবস্থা যে, যে মহিলার জানাযার নামায পড়া হয়েছে এবং তাকে দাফনও করা হয়েছে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু সংবাদ পাননি। তিনি যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি তার জানাযার নামায পড়ার প্রতি এ পরিমাণ গুরুত্বারোপ করলেন যে, কবরস্থানে গিয়ে তার জানাযার নামায পড়লেন। যেন আল্লাহ তাআলা তার কবরকে নূর দ্বারা ভরে দেন।

অপর দিকে এ অবস্থা যে, লাশ সামনে রাখা আছে। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায আদায় করেন। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা তার নামায পড়ো। আমি পড়বো না। কারণ, তার দায়িত্বে ঋণ আছে।

ঋণের দায়িত্ব নেওয়ার পর জানাযার নামায পড়ালেন

এ সময় হযরত আবু কাতাদাহ (রাযি.) দাঁড়ালেন এবং নিবেদন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তার ঋণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন– সম্পূর্ণ ঋণ নিজ দায়িত্বে নিচ্ছো?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পূর্ণ ঋণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়ালেন।

পরিশোধ করার শক্তি না থাকা সত্ত্বেও ঋণ কেন করলে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, এই ঋণগ্রস্থ লোকটির জানাযার নামায পড়লেন না, তার কারণ কী ছিলো? বাহ্যত: সে তো অন্যদের চেয়ে অধিক

দুর্দশাগ্রস্ত লোক ছিলো এবং অন্যদের চেয়ে অধিক করুণার পাত্র ছিলো। কিন্তু এরপরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তার জানাযার নামায পড়লেন না? এর দ্বারা তাঁর এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিলো যে, যেহেতু তার ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য ছিলো না তাহলে সে ঋণ করল কেন? এতে বোঝা গেলো যে, তীব্র প্রয়োজন ছাড়া ঋণ করা এবং একথা জেনে-বুঝে ঋণ করা যে, আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না– এটি এত বড় বিপদের কথা যে, তার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযার নামায পড়ানোর বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই যতদূর সম্ভব কোন মানুষেরই ঋণ করা উচিত নয়।

আমাদের সমাজে ঋণের মহামারি

বর্তমানে আমাদের সমাজে এ বিষয়ে খুব বেশি ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে এ রোগটি বিশেষভাবে মহামারীর রূপ ধারণ করছে। না তাদের ঋণ না নেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আছে, আর না ঋণ নিলে যথাসময়ে তা পরিশোধ করার ফিকির আছে। ফলে বছর বছর সময় পার হয়ে যায়, কিন্তু ঋণ ফেরত পাওয়া যায় না। তাই আমি যতদূর সম্ভব ঋণ না দেওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা কাউকে সহযোগিতা করার তাওফীক দিলে তা করি, কিন্তু ঋণ দেওয়া থেকে পরহেয করি। কারণ, ঋণ দেওয়ার পর তা লিখে রাখো। তারপর সর্বক্ষণ তা ফেরত পাওয়ার এক চিন্তা মাথায় সওয়ার হয়ে থাকে। অথচ সময় মতো তা ফেরত পাওয়া যায় না। সারা জীবনে অল্প কয়টি ঘটনা ছাড়া আমার মনে পড়ে না যে, কেউ ঋণ নিয়ে তা ফেরত দিয়েছে। অথচ ঋণ নিয়েছে বিশিষ্ট দ্বীনদার, আলেম এবং বুযুর্গগণের সোহবতে দীর্ঘসময় কাটিয়েছে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সেই যে, ঋণ নিয়েছে, আজ পর্যন্ত আর খবর নেই যে, সে ঋণ কোথায় গেলো।

এ যুগে গোনাহের কাজের জন্যে ঋণ নেওয়া হয়

যাই হোক, প্রথমত: মানুষ ঋণই নিবে না। আর নিলেও তা যথাসময়ে পরিশোধ করার ব্যাপারে যত্নশীল হবে। এ কারণে হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এ মালফূযে বলছেন যে– 'তীব্র প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রকারেই ঋণগ্রস্ত হবে না। এমনকি প্রচলিত প্রথা প্রচলনের বিপরীত করতে হলেও ঋণ করবে না।' অর্থাৎ, এ কারণে ঋণ নিচ্ছে যে, আমাদের সমাজে এক্ষেত্রে দাওয়াত করা হয়, তাই ঋণ করে দাওয়াতের প্রথা পালন করছে, নাউযুবিল্লাহ। এর অর্থ হলো, গোনাহের কাজের জন্যে ঋণ নিচ্ছে।

সূচিপত্র

এরপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'ঋণগ্রস্থ হওয়ায় মারাত্মক পেরেশানী হয়। যার পরিণতি হয় খুবই খারাপ। তাই প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহওয়ালাদের পন্থা-পদ্ধতিতেই চলা উচিত।'

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তেহাত্তরতম মজলিস

ঘর থেকে অতিরিক্ত আসবাবপত্র বের করে ফেলো

ঘর থেকে অতিরিক্ত আসবাবপত্র বের করে ফেলো

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

অপচয়ের একটি দিক

হযরত থানভী (রহ.) 'অপচয়' থেকে বাঁচার উপায় সংক্রান্ত যে সমস্ত নসীহত করেছেন, তার মধ্য থেকে কয়েকটি নসীহতের আলোচনা কালকে করা হয়েছে। সামনে আরেকটি নসীহতে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'সর্বপ্রথম ঘরকে চিহ্নিত করো। ঘরের যে সমস্ত জিনিস কাজে আসে তা রেখে দাও, আর যে সমস্ত জিনিস কাজে আসে না তা বের করে দাও। বিক্রি করে দাও বা মিসকীনদেরকে দান করে দাও। নফল সদকা হিসেবে দেওয়ার মনোবল না থাকলে যাকাত হিসেবেই দিয়ে দাও।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯২)

এ নসীহতের সারকথা এই যে, বাড়িতে বেশি জিনিসপত্র জমা করা বা রাখা এটিও 'অপচয়ে'র একটি দিক। খোলামেলাভাবে যে পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজন সেগুলো রেখে ঘরের অতিরিক্ত জিনিসসমূহ হয় দান করো, নতুবা সেগুলো বিক্রি করে টাকাগুলোকে প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করো। কিন্তু খামাখা ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রের স্তূপ করা– যেগুলো না কোন কাজে লাগে, না কোন উপকারে আসে– অর্থহীন কাজ। তাই প্রত্যেকের নিজ নিজ বাড়িতে সমীক্ষা চালানো প্রয়োজন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র তো নেই। থেকে থাকলে সেগুলো হয় গরীবদেরকে দিয়ে দিবে অথবা বিক্রি করে দিবে।

প্রত্যেকের প্রয়োজন ভিন্ন মাপের হয়ে থাকে

তবে 'প্রয়োজনে'র পরিমাণ নির্ধারণে অর্থাৎ, কতোটুকু আসবাবপত্রের প্রয়োজন রয়েছে, আর কতটুকুর প্রয়োজন নেই– স্থান ও কালভেদে তা ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষের অবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। সেই অবস্থার ভিত্তিতে প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে। আমার শায়খ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব (রহ.) একবার এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তাতে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনের মাপকাঠি ভিন্ন। একজন মানুষের বেশি মানুষের সাথে সম্পর্ক নেই, তার বাড়িতে একটি বাটি, একটি থালা আর একটি পিয়ালাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে একজন মানুষের ঘরে অনেক মেহমান আসে, তার জন্য দশটি বাটিও তার প্রয়োজনের তুলনায় কম হতে পারে। একজনের বাড়িতে বেশি মেহমান আসে না, তার জন্যে একটি বিছানাই যথেষ্ট। অপরজনের বাড়িতে অনেক মেহমান আসে, তার জন্যে দশটি বিছানাও কম হতে পারে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা অনুপাতে প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

এ পরিমাণ আয় যথেষ্ট নয়

আমি একবার হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব (রহ.)-এর নিকট পত্র লিখি যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের লাইব্রেরী থেকে এ পরিমাণ আয় হয় যে, এর অধিক প্রয়োজন পড়ে না। এজন্যে বিনা বেতনে মাদরাসায় পড়াতে মন চায়। উত্তরে হযরত (রহ.) জানতে চান যে, লাইব্রেরী থেকে কত আয় হয়? আমি লিখলাম যে, মাসে তিন হাজার টাকা আয় হয়। উত্তরে হযরত লিখেন যে, আপনার জন্যে এতটুকু আয় যথেষ্ট নয়। তাই এখনই বিনা বেতনে মাদরাসায় পড়ানোর ইচ্ছা করবেন না। যাহোক, প্রত্যেক মানুষের অবস্থা অনুপাতে প্রয়োজনের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

অধিক আসবাবপত্রের কারণে মনের একাগ্রতা কমে যায়

তাই নিজের অবস্থা অনুপাতে পরিমাণ ঠিক রেখে দেখো যে, ঘরের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস পড়ে আছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে সেগুলোকে কাজে লাগাও। নিজের মস্তিষ্ক এবং বাড়ির লোকদের মস্তিষ্ককে অনর্থক কেন বিক্ষিপ্ত রাখো? কারণ, সামানাপত্র যত বেশি হয়, মানুষের মনের একাগ্রতা ততোই কম হয়। অধিক সামানের কারণে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কখনো এদিকে মন ধাবিত হয়, কখনো ওদিকে ধাবিত হয়।

খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.) অনেক বড় আল্লাহর ওলী এবং বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। শুরুতে তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। বিশেষ কোন ধার্মিক লোক ছিলেন না। ইবাদত-বন্দেগী এবং যিকির-আযকারের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিলো না। সাধারণ ব্যবসায়ীদের মতোই একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আতর, হেকিমী ঔষধ, শরবত ইত্যাদি বিক্রি করতেন।

একদিন তিনি দোকানে বসে আছেন। এমন সময় 'মাজযূব' ধরনের এক লোক দোকানের সামনে এসে একবার দোকানের উপর থেকে নিচের দিক, আবার নিচ থেকে উপর দিক, একবার ডান দিক আবার বাম দিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। শায়খ আত্তার (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কী করছো? সে বললো : দেখছি আর কি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিছু কিনবে কি? সে বললো: না, কিছু কিনবো না। শুধু শিশিগুলো দেখছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কেন দেখছো? সে বললো : আসলে আমি শিশিগুলো দেখছি আর ভাবছি যে, মৃত্যু আসলে এতগুলো শিশির ভিতর থেকে তোমার জান কীভাবে বের হবে। কারণ, মৃত্যুর সময় তোমার জান একবার এ শিশির ভিতর ঢুকবে, আবার ঐ শিশির ভিতর ঢুকবে। তখন তোমার জান বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। এ কারণেই আমি অবাক হয়ে শিশিগুলো দেখছি।

অন্তরে আঘাত হানলো

শাইখ আত্তার (রহ.) তার কথায় রাগ হলেন যে, আমার জান কীভাবে বের হবে তা নিয়ে সে অবাক হচ্ছে কেন? তার জান যেভাবে বের হবে, আমার জানও সেভাবেই বের হবে। তিনি বললেন : এই তোমার জান কেমনে বের হবে? মাজযূব লোকটি বললো, আমার জান তো এইভাবে বের হবে। একথা বলে সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে মাটিতে শুয়ে চাদর মুড়ি দিলো। একটু পর দেখে যে, সে মারা গেছে।

আসলে আল্লাহ তাআলা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর জন্যে একটি 'গায়েবী লতীফা' পাঠিয়ে ছিলেন। মাজযূবের এ অবস্থা দেখে তাঁর অন্তরে বিরাট আঘাত লাগলো। সত্যিই মাজযূব লোকটি তার জান দিয়ে বড় শিক্ষণীয় কথা বলে গেলো। বাস্তবিকই আমার জানতো এ সমস্ত বোতল আর শিশির মধ্যে আটকে আছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাওবার তাওফীক দিলেন। তারপর তিনি নিজেকে আল্লাহর কাজে নিয়োজিত করলেন। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন মর্যাদা দান করলেন যে, এখন বড় বড় আল্লাহর ওলীদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়।

আসবাবপত্র কম হলে চিন্তা কম হয়

যাই হোক, মানুষের নিকট আসবাবপত্র যত বেশি থাকে তার মন ততই বিক্ষিপ্ত হয় এবং তার মন-মগজ তত বেশি সেগুলোতে জড়িয়ে পড়ে। আর আসবাবপত্র যত কম হয় মানুষ তত নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। মানুষের সামানা যখন সাধারণ হয়, তখন তার কোন পরোয়া হয় না। তার না চোরের ভয় থাকে, না ডাকাতের ভয় থাকে। তাই মধ্যপন্থা হলো, মানুষ তার অবস্থানুপাতে প্রয়োজন পরিমাণ সামানা রাখবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানা জমা করে কেন চিন্তার বোঝা মাথায় নিবে। তাই সমস্ত সামানার সুব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সবচেয়ে উত্তম হলো, দান করে দিবে। যাতে কোন গরীব মানুষের উপকার হয়। আর যদি তা না করে তাহলে তা বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে সেগুলোকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যয় করবে বা তা দ্বারা আল্লাহর বান্দাদেরকে সহযোগিতা করবে।

এটি কৃপণতা নয়

কতক পরিবারের মহিলারা ঘরের অকেজো ও পরিত্যক্ত জিনিসপত্র জমা করে। যেমন, পুরাতন পত্রিকা, বোতল ইত্যাদি জমা করে। তারপর ভাঙ্গাড়ি আসলে সেগুলো তার নিকট বিক্রি করে দেয়। অনেকে মহিলাদের এ কাজটিকে কৃপণতা বলে আখ্যা দেয়। অথচ এটা কৃপণতা নয়। হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এ মালফূযে যে কথা বলছেন, তার উদ্দেশ্যও এটাই যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত যে সমস্ত আসবাবপত্র ঘরে জমা হয়, সেগুলোকে অনর্থক নষ্ট না করে উপযুক্ত কোন খাতে ব্যয় করো। উপযুক্ত কোন খাত না থাকলে বিক্রি করে ফেলো। এতে পাঁচ-দশ টাকা যাই পাবে তা আল্লাহর নিয়ামত। টাকাগুলো জায়েয কোন খাতে ব্যয় করতে চাইলে ব্যয় করো বা আল্লাহর কোন বান্দাকে দিয়ে দাও তার উপকারে আসবে।

দস্তরখান ঝাড়াও একটি 'বিদ্যা'

আমার ওয়ালিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) তাঁর প্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন সাহেব (রহ.)-এর একটি ঘটনা শোনাতেন। তিনি 'হযরত মিয়াঁ' সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের উঁচু স্তরের উস্তাদ ছিলেন। অনেক বড় বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর ওলী হয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমার ওয়ালিদ সাহেব বলেন যে, আমি একদিন তাঁর বাড়িতে গেলাম। খাবারের সময় হলো। তিনি বললেন, এসো খানা খাও। আমি তাঁর সঙ্গে খানা খেলাম। খাওয়া শেষে আমি ভাবলাম যে, দস্তরখান উঠিয়ে ঝেড়ে আনি। তাই আমি দস্তরখান উঠাতে আরম্ভ করলাম।

মিয়াঁ সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করলেন– কী করছো? আমি বললাম, হযরত দস্তরখান উঠাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– কেন? আমি বললাম, বাইরে থেকে ঝেড়ে আনার জন্যে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জানো, কীভাবে দস্তরখান ঝাড়তে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম– হযরত! দস্তরখান ঝাড়াও কোন বিদ্যা না কি যে, তা শিখতে হবে? তিনি বললেন– হ্যাঁ, এজন্যই জিজ্ঞাসা করছি যে, তুমি দস্তরখান ঝাড়তে জানো কিনা, এটিও একটি বিদ্যা। আমি বললাম– হযরত! এ বিদ্যাটিও আমাকে শিখিয়ে দিন।

আল্লাহর দেওয়া রিযিক যেন নষ্ট না হয়

তিনি বললেন : দেখো, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তারপর দস্তরখানের উপর পড়ে থাকা জিনিসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে ভাগ করলেন। হাড্ডিগুলো পৃথক করলেন। হাড্ডি ছাড়া গোশত পৃথক করলেন। রুটির ছোট ছোট টুকরা পৃথক করলেন। রুটির গুড়াসমূহ একত্রিত করলেন। তারপর বললেন যে, আমার এখানে এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যে পৃথক পৃথক জায়গা রয়েছে। হাড্ডিগুলি অমুক জায়গায় রাখি। কুত্তা এসে সেখান থেকে তার উপযুক্ত হাড্ডিসমূহ নিয়ে যায়। গোশতের টুকরার জন্যে অমুক জায়গা নির্ধারিত। বিড়াল এসে সেখান থেকে গোশতের টুকরাসমূহ খেয়ে যায়। রুটির এসব টুকরা দেওয়ালের উপর ঐ জায়গায় রেখে দেই। চিল, কাক ও অন্যান্য পাখি এসে সেগুলো খেয়ে যায়। রুটির এ গুড়াগুলো পিঁপড়ার গর্তের মুখে ফেলে দিই। পিঁপড়া সেগুলো খেয়ে ফেলে। তারপর বললেন : এগুলো আল্লাহ তাআলার দেওয়া রিযিক। এগুলোর কোন কিছুই নষ্ট করা উচিত নয়।

এ যুগের দাওয়াতের অবস্থা

বর্তমান যুগের দাওয়াতের অবস্থা দেখুন, সেখানে কী পরিমাণ খাবার নষ্ট হয়। পৃথিবীতে কত মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করছে। হা-হুতাশ করছে। কত মানুষ খাবার পাচ্ছে না। একটু চাটনি বা একটি পেঁয়াজ সহযোগে রুটি খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে। আর একই সময়ে দাওয়াতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য নষ্ট করা হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এসব এজন্যেই হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কদর নেই। এগুলো কীভাবে ব্যবহার করলে নষ্ট হবে না বরং আল্লাহর কোন মাখলূকের কাজে আসবে, তা জানা নেই।

কোন জিনিস বেকার নয়

কবি ইকবাল মরহুম শিশুদের জন্যে একটি পদ্য লিখেছেন। এর শেষ পংক্তিটি হযরত ওয়ালিদ সাহেবের খুবই পসন্দনীয় ছিলো। সে পংক্তিটি এই–

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছুকেই আল্লাহ তাআলা কোন কল্যাণ ও উপকারের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে অকেজো ও বৃথা মনে করো না। এগুলোকে অবমূল্যায়ন করো না। এগুলোকে সঠিক নিয়মে ব্যবহার করো।

এমন সব বস্তু ঘর থেকে বের করে দাও

মোটকথা, ঘরে যে সমস্ত অকেজো জিনিস পড়ে থাকে, সেগুলোকে কোন কাজে লাগাও। আজই বাড়ি গিয়ে এর উপর আমল আরম্ভ করে দাও। এ কাজটি যখন এ নিয়তে করবে যে, এটিও আমাদের ধর্মের শিক্ষা, তাহলে ইনশাআল্লাহ এটাকেও তোমার সওয়াবের কাজ বলে লিপিবদ্ধ করা হবে।

পরবর্তী মালফুযেও হযরত থানভী (রহ.) এ ধরনেরই একটি নসীহত করেছেন।

> 'বাড়িতে গিয়ে পরিদর্শন করো। এমন অনেক জিনিস দেখতে পাবে, যেগুলো গলে-পঁচে নষ্ট হচ্ছে। কোনটা পোকা খাচ্ছে। এমন সব জিনিসকে নিজের মালিকানা থেকে বের করে দাও। তাহলে ঘর আলোকিত হবে।' (প্রাগুক্ত)

যে সমস্ত জিনিস ঘরে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে, গলে যাচ্ছে, সেগুলো পৃথক করো। এর একটি ফায়দা তো এই হবে যে, এগুলোও আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। এতে করে এগুলো সঠিক খাতে ব্যয় হবে। দ্বিতীয় ফায়দা এই হবে যে, এ সমস্ত জিনিস ঘরে থাকার ফলে ঘর নোংরা হয়, মলিন হয়। আর সেগুলো বের করে ফেলার দ্বারা ঘর উজ্জ্বল হয়, পরিচ্ছন্ন হয়। এগুলোও দ্বীনেরই অংশ। কিন্তু মানুষ এগুলোকে দুনিয়ার বিষয় মনে করে।

মুসলমান সর্বত্রই মুসলমান

হযরত থানভী (রহ.) বলতেন যে, কাউকে দরবেশ হতে হলে বা ওলী হতে হলে সে অন্য কোথাও চলে যাক। এজন্যে অনেক খানকা খোলা রয়েছে। আর যদি কাউকে মানুষ হতে হয়, তাহলে সে যেন এখানে আসে। এখানে তো মানুষ হওয়ার গূঢ় (রহস্য) শিখানো হয়। মুসলমান সে নয়, যে মসজিদে যতক্ষণ জায়নামাযে বসে থাকে ততক্ষণ মুসলমান। আর মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলে তখন আর ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। যে ব্যক্তি প্রকৃত

মুসলমান, সে তো মসজিদের বাইরেও মুসলমান। সে ঘরেও মুসলমান, বাজারেও মুসলমান, অফিসেও মুসলমান। সর্বত্রই সে মুসলমান। দ্বীনী শিক্ষার সম্পর্ক জীবনের প্রত্যেকটি শাখার সঙ্গে রয়েছে। তাই সর্বত্রই সেগুলো মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

সব কাজ চিন্তা-ভাবনা করে করবে

এরপর তিনি আরেকটি নসীহত এই করেন যে–

> 'দৈনন্দিন কাজে অবধারিত করে নাও যে, যে কাজ করবে চিন্তা-ভাবনা করে করবে। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোন কাজ করবে না।' (প্রাগুক্ত)

'অপচয়' থেকে বাঁচার একটি পথ এটাও যে, প্রত্যেকটি কাজ চিন্তা-ভাবনা করে করবে। কারণ, 'অপচয়' করা যখন স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়, তখন মনে যে জিনিস কেনার চিন্তা জাগে, অনতিবিলম্বে তা কিনে ফেলে। চিন্তা-ভাবনা করে না। তাই একটু চিন্তা করে দেখো, এ জিনিসটি উপকারী কি না? চিন্তা করার অভ্যাস করো। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কাজ করা উদাসীনতা ও অবহেলা। উদাসীনতা ও অবহেলার ফলে মানুষ নিজের সময়ও বরবাদ করছে এবং সম্পদও বরবাদ করছে।

বুঝে-শুনে কাজ করো

হযরত থানভী (রহ.) শেষ নসীহত এই করেছেন যে–

> 'কারো কথায় কোন কাজ করবে না। নিজের সিদ্ধান্ত মতো কাজ করবে।'

سن لاکھ کوئی تجھے سناوے

کیجیو وہی جو سمجھ میں آوے

> 'মানুষের লাখ কথা শুনবে, কিন্তু করবে ঐটাই, যা তোমার বুঝে আসবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯২)

অর্থাৎ, অন্যের কথায় প্রভাবিত হবে না। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষ তাদের প্রচলিত প্রথা এবং ফ্যাশনের ভিত্তিতে যে সব কথা বলে বা পরামর্শ দেয়, সে সমস্ত কথা ও পরামর্শ শুনবে ঠিকই তবে এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিবে। আর যেটা তোমার নিকট সঠিক তার উপর আমল করবে। তাতে মানুষ মন্দ বলে বলুক। গালি দেয় দিক। কিন্তু তুমি আল্লাহর সঙ্গে যেটা সঠিক মনে করো সেটার উপর আমল করবে।

বড়দের কথা না শোনা উদ্দেশ্য নয়

এখানে বড় কারো কথা না শোনা উদ্দেশ্য নয়। যেমন, পীর সাহেব তার মুরীদকে বললো– এভাবে করো, বা উস্তাদ শাগরিদকে বললো– এভাবে করো, বা বাপ বেটাকে বললো– এভাবে করো, বা উপরোস্থ অধীনস্থকে বললো– এভাবে করো; তখন একথার উপর আমল করা যাবে না যে, 'যা তোমার বুঝে আসবে তা করবে।' বরং এসব ক্ষেত্রেতো বড়দের কথা মান্য করা জরুরী। সেখানে নিজের মত মতো চলা নাজায়েয। নিজের মত মতো চলার কারণেই বরং মানুষ ধ্বংস হয়। তাই কাউকে যখন মুরুব্বী বানাবে, তখন মুরুব্বী বানানোর পূর্বে চিন্তা করবে যে, সে মুরুব্বী হওয়ার যোগ্য কিনা? তার মতামত নির্ভরযোগ্য কিনা? তার দ্বীনদারী নির্ভরযোগ্য কিনা? এ ব্যক্তি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী কিনা? যখন দেখবে যে, এ ব্যক্তি আমার হিতাকাঙ্ক্ষীও, দ্বীনদারও এবং তার মতামত বুদ্ধি নির্ভর। এ তিন বিষয়ে যখন নিশ্চিন্ত হবে, তখন নিজেকে তার হাতে সঁপে দিবে। তারপর সে যা বলবে সে অনুপাতে কাজ করবে।

আল্লাহ তাআলাকে কীভাবে মুখ দেখাবে?

এখানে হযরত থানভী (রহ.) যে কথা বলছেন, তা দুনিয়ার মানুষের তিরস্কার ও গালমন্দের কথা বলছেন। যেমন, মানুষ চিন্তা করে যে, এ কাজ যদি করি তাহলে মানুষকে মুখ দেখাবো কীভাবে? আরে ভাই! দুনিয়ার মানুষকে মুখ দেখাতে না পারলে কী আসে যায়? তাদেরকে মুখ দেখালে যদি তারা নিজেদের মুখ বিকৃত করে এবং তোমাকে গালমন্দ করে তাহলে তোমার কী ক্ষতি? এতটুকুই না হয় হবে যে, সে বলবে যে, লোকটি সেকেলে। একথা বলে বলুক। তার সে কথাতো হাওয়ায় উড়ে যাবে। এ কথায় তোমার কী হবে? আসল বিষয়তো হলো, আল্লাহর সামনে গিয়ে কীভাবে মুখ দেখাবে, সেই ফিকির করো।

মানুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাও

যে মানুষ একবার মানুষ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার চিন্তায় লেগে যায়, সেই অবশেষে বিশ্ববাসীর কাছে সম্মান লাভ করে এবং দুনিয়া তার পদতলে লুটে পড়ে। এ দুনিয়ার বৈশিষ্ট্যই হলো, তুমি যদি এর পিছনে পিছনে দৌড়াও তাহলে সে তোমার থেকে পালাতে থাকবে। আর যদি তুমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে পালাতে থাকো তাহলে সে তোমার পিছনে দৌড়াতে থাকবে। দুনিয়া হলো ছায়ার মতো। তুমি যদি ছায়ার পিছনে দৌড়াতে থাকো তাহলে ছায়া তোমার আগে আগে দৌড়াতে থাকবে। কখনোই তুমি তোমার ছায়াকে ধরতে পারবে না। আর যদি তুমি ছায়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে

থাকো তাহলে সে তোমার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকবে। এই একই অবস্থা দুনিয়ারও। দুনিয়ার সম্পদ হোক, সম্মান হোক, সুখ্যাতি হোক, পদমর্যাদা হোক বা অর্থ-কড়ি হোক, যাই হোক না কেন তার নিয়মতো এটাই। তাই এ চিন্তাই পরিত্যাগ করো যে, মানুষ কী বলবে। কারণ, তুমি মানুষের মুখ কখনোই বন্ধ করতে পারবে না।

মেয়ের বিবাহের ঘটনা

এক লোক মেয়ে বিবাহ দিচ্ছিলো। সে ভাবলো, যখনই কোন মানুষ মেয়ে বিয়ে দেয়, তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা সাধারণত: তাকে তিরস্কার করে যে, বাপের বাড়ি থেকে অমুক জিনিস আনে নাই, অমুক জিনিস আনে নাই ইত্যাদি। সে চিন্তা করলো যে, আমি তিরস্কার করার কোন সুযোগই দেবো না। দুনিয়ার সব প্রয়োজনীয় জিনিস আমার মেয়েকে উপঢৌকন দেবো। সুতরাং সে সারা দুনিয়ার জিনিস তার মেয়েকে উপঢৌকন দিলো। যাতে কেউ বলতে না পারে যে, অমুক জিনিস দেয় নাই। বরযাত্রীরা সব উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে যখন রওনা করলো, তখন চলার পথে একটি নদী দেখা দিলো। সেখানে পথ সমতল করার জন্যে একটি বেলচার প্রয়োজন পড়লো। তখন উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে বেলচা তালাশ করা হলো। বেলচা তালাশ করে যখন পাওয়া গেলো না, তখন একজন বললো যে, উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে বেলচাতো দেয় নাই। যদি একটি বেলচা দিতো তাহলে রাস্তাটি সমতল করা যেতো এবং বরযাত্রীরা সহজে পার হয়ে যেতে পারতো। দেখুন, সবকিছু করার পরও তিরস্কার করলো যে, বেলচা দেয় নাই।

দুনিয়ার মুখ বন্ধ করা সম্ভব নয়

তাই এ দুনিয়ার জন্যে তুমি যতকিছুই করো না কেন তোমাকে কিছু না কিছু বলবেই। তুমি কখনই দুনিয়ার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। এ সম্পর্কেই হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, কারো কথায় কোন কাজ করবে না। নিজের সিদ্ধান্তে কাজ করবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহীতার কথা চিন্তা করে যেটিকে সঠিক বুঝবে সে অনুপাতে কাজ করবে। তারপর তোমাকে কেউ যদি কিছু বলে তাহলে তার পরওয়া করো না। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদের সবাইকে ইসলামের এ সমস্ত শিক্ষার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

চুয়াত্তরতম মজলিস

ব্যয় সংকুচিত করুন

ব্যয় সংকুচিত করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

ভূমিকা

কয়েক দিন ধরে অপচয় সম্পর্কে আলোচনা চলছে। অপচয় ও অনর্থক ব্যয় সম্পর্কে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কয়েকটি নসীহত এবং তার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে! এ পর্যন্ত অপচয় সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তার সারকথা এই যে, 'অপচয়ে'র অর্থ হলো, এমন জায়গায় ব্যয় করা যেখানে ব্যয় করার কোন ফায়দা নেই বা ফায়দা থাকলেও সে ফায়দা শরীয়তসম্মত ও বৈধ নয়। ব্যয় করার ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া গেলে তাকেই 'অপচয়' বলা হবে।

বার্ষিকী ও দাওয়াতের মধ্যে পয়সা ব্যয় করা

বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক প্রথায় মানুষ পয়সা ব্যয় করে যেমন, নিজের জন্মবার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, নিজের সন্তানের জন্মবার্ষিকী, বিবাহের অনুষ্ঠান, খাতনার দাওয়াত ইত্যাদি। এ ধরনের হাজার হাজার প্রথা আমরা বানিয়ে রেখেছি। এ ধরনের দাওয়াত মৌলিকভাবে জায়েয আছে, তবে দুই কারণে এ সমস্ত দাওয়াত নাজায়েয হয়ে যায়। একটি কারণ এই যে, এ সমস্ত দাওয়াতকে এত জরুরী এবং আবশ্যকীয় মনে করা হয় যে, এগুলো ছাড়া যেন দ্বীনই পরিপূর্ণ হয় না। জরুরী মনে করার কারণে এ সমস্ত দাওয়াত বিদআত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজে মান রক্ষার্থে এ সমস্ত দাওয়াত করা হয়। তারপর আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে অন্যের নিকট থেকে ঋণ নেওয়া হয়। সন্তানের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সামর্থ্য নেই, কিন্তু যেহেতু এর প্রথা প্রচলিত রয়েছে এবং এ অনুষ্ঠান করা এক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে, তাই তা করতেই হবে। তা না হলে সমাজে মান থাকবে না। আর বার্ষিকী পালনের দ্বারা এতটুকু লাভ তো হবে যে, মানুষ জানবে যে, এরাও বার্ষিকী পালন করে। ফলে খ্যাতি লাভ হবে এবং মানুষ আমাদেরকে 'ফ্যাশনেবল' মনে করবে। তাই বার্ষিকী উদযাপনের মধ্যে ফায়দা তো আছে, কিন্তু এটি একটি নাজায়েয ফায়দা।

ঋণ করে দাওয়াত করা জায়েয নেই

মনে রাখবেন, এমন যে কোন মুবাহ কাজ– যা ছাড়া চলা সম্ভব– তার জন্যে যদি ঋণ নিতে হয়, তবে তা 'অপচয়ে'র অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আমাদের সমাজে এ মহামারি বিস্তার লাভ করেছে যে, এক ব্যক্তি অতি সামান্য বেতনে চাকুরী করে। এ বেতন দ্বারা সে অতি কষ্টে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে। কিন্তু যখন কোন অনুষ্ঠান করার সময় আসে, তখন দুইশ' মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়াবে। কিন্তু যেহেতু নিজের কাছে পয়সা নেই তাই এর জন্যে ঋণ করছে এবং নিজে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এবার বলুন, দুইশ' মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়ানো কি আপনার দায়িত্বে ফরয-ওয়াজিব ছিলো? মনে রাখবেন, যখন আপনার কাছে পয়সা নেই এজন্য অন্যের থেকে ঋণ নিয়ে দাওয়াত করতে হচ্ছে– এভাবে দাওয়াত করা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঈদের সময় নতুন কাপড় বানানো জরুরী নয়

সামনে ঈদের মওসুম আসছে। শরীয়ত তো শুধু এতটুকু বলে যে, হালাল ও জায়েয তরিকায় সর্বোত্তম যে কাপড় তোমার হাতে আসে তা ঈদের দিন পরো। এখন মানুষ ঈদের সময়ে নিজের জন্যে, ছেলে-মেয়ের জন্যে এবং পরিবারের লোকদের জন্যে কয়েক জোড়া করে কাপড় বানানোকে আবশ্যকীয় সুন্নাত মনে করেছে। তারা এটাকে ঈদের অপরিহার্য অংশ বানিয়ে নিয়েছে। অথচ ঘরে ভালো ভালো কাপড় রয়েছে। এগুলো পরলেও কোন সমস্যা নেই। এরপরও ঈদের সময় নতুন পোশাক তৈরি করতেই হবে। কাপড় তৈরি করার টাকা না থাকলে এর জন্যে ঋণ নাও। স্ত্রী ও সন্তানরা গৃহকর্তাকে এজন্যে বাধ্য করে যে, যেখান থেকে পারো টাকার ব্যবস্থা করে আমাদের ঈদের কেনাকাটা করে দাও। এখন হালাল উপায়ে এত টাকার ব্যবস্থা করতে না পারলে তখন গৃহকর্তা কারো থেকে ঘুষ নেয়, কাউকে ধোঁকা দেয় বা কোন নাজায়েয কাজ করে পয়সা

কামায়। অন্য কিছু না করলেও কমপক্ষে ঋণ করে। ঋণ করে সে তার স্ত্রী-সন্তানের চাহিদা পুরা করার চেষ্টা করে।

এ অবস্থা আমাদের সমাজে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এর ফলে হালাল-হারাম একাকার হয়ে গেছে। মানুষ পেরেশানীর পাঁকে নিমজ্জিত হচ্ছে। এসব কিছু 'অপচয়' সংক্রান্ত ইসলামের বিধি-বিধান না মানার ফলেই হচ্ছে।

ব্যয় কমানো মানুষের ক্ষমতাধীন, কিন্তু আয় বাড়ানো ক্ষমতাধীন নয়

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) 'অপচয়' সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন। তিনি বলতেন যে, আয় বাড়ানো মানুষের ক্ষমতাভুক্ত নয়। অর্থাৎ, যত আয় মনে চাইবে তাই হবে– এটা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। বেশির চেয়ে বেশি মানুষ চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু এই চেষ্টার ফলে বাস্তবিকই আয় বেড়ে যাবে এটা মানুষের ক্ষমতাভুক্ত নয়। তবে ব্যয় সংকুচিত করা মানুষের ইচ্ছাধীন। অবাক বিষয় হলো, মানুষ ঐ কাজের পিছনেই লেগে থাকে, যা তার ক্ষমতাধীন নয়। রাত-দিন তার চেষ্টা, তার দৌড়-ঝাপ এবং তার চিন্তা-ভাবনা এদিকেই নিবদ্ধ যে, তার আয় বাড়ুক। আর যা তার ক্ষমতাভুক্ত অর্থাৎ, ব্যয় কমানো তার দিকে মনোযোগ নেই।

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করুন

ব্যয়ের খাত তো আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছে যে, যে কোন মূল্যে আমাকে এ খাতে ব্যয় করতেই হবে। অতএব আমাকে আয় বাড়াতে হবে। আর আয় বাড়ানো যেহেতু তার এখতিয়ারে নয় তাই তিনটি পন্থার যে-কোন একটি তাকে অবলম্বন করতে হয়। হয় হারাম পন্থায় তাকে মাল কামাতে হয়, না হয় ঋণ করতে হয়, না হয় কারো কাছে হাত পেতে দয়ার বোঝা মাথায় বহন করতে হয়। যত খুশি মনেই কেউ তোমার প্রতি দয়া করুক না কেন এবং সে তোমার বন্ধু হোক, আত্মীয় হোক, প্রিয়জন হোক, ভাই হোক, বোন হোক বা বাপই হোক না কেন, কিন্তু তোমার উচিত আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করা এবং এমন খাতে ব্যয় না করা, যার ফলে অন্যের দয়ার বোঝা তোমাকে মাথায় নিতে হয়। তুমি বরং তোমার ব্যয় সংকুচিত করে কাজ চালাও।

আয়ের সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করো

হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) অত্যন্ত উপকারী কথা বলেছেন যে, নিজের আয়ের গণ্ডির মধ্যে থেকে ব্যয় করো। তোমার আয় ডাল-রুটি খাওয়ার মতো

হলে ডাল-রুটি খাও। এমতাবস্থায় পোলাও-জরদা পাকানোর কী দরকার। সারা বছরে এক জোড়া-দুই জোড়া নতুন কাপড় বানানোর মতো আয় হলে সে অনুপাতেই কাপড় তৈরি করো। সেটাই পরিষ্কার করে পরো। তিন জোড়া বানিয়ো না। আল্লাহ তাআলা যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন সেমতে নিজের ব্যয়কে এমনভাবে সাজাও যে, ঐ আয়ে তোমার ব্যয় পুরা হয়ে যায়।

আয় বুঝে ব্যয় করো

প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, 'আয় বুঝে ব্যয় করো'। অর্থাৎ, সামর্থ্য অনুপাতে কাজ করো। কিন্তু এখন এমন উল্টা যামানা এসেছে যে, এখন নিয়ম বানিয়েছে যে, 'আগে ব্যয় করো তারপর আয় করো। তারপর আয় যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে অন্যের নিকট হতে তা ছিনিয়ে নাও।' বর্তমান যুগের অর্থনীতির এটাই মূলনীতি।

যাই হোক, মানুষ অতটুকুই ব্যয় করবে, যতটুকু তার সামর্থ্যের মধ্যে আছে। মানুষ যখন ব্যয় কম করার অভ্যাস গড়ে তোলে, তখন তার দুনিয়ার কোথাও কষ্ট হয় না। পেরেশানী হয় না। কেউ তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে না।

হযরত মুফতী ছাহেব (রহ.)-এর একটি ঘটনা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার 'ইসলামী শিক্ষা বোর্ড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান বানায়। সে সময় পাকিস্তানের সংবিধান তৈরি করা হচ্ছিলো। পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামী ধারাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে আলিমগণের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.)কে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ডেকে আনেন। তিনি তাশরীফ আনলে তাঁকে ঐ বোর্ডের সদস্য বানানো হয়। তিনি খেদমতের নিয়তে তার সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

'ইসলামী শিক্ষা বোর্ড' ছিলো একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। একবার সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্তকৃত কিছু ভুল ধারা জনসমক্ষে চলে আসে। এ সম্পর্কে একজন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলে মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, আমরা তো 'ইসলামী শিক্ষা বোর্ডে'র সাথেও পরামর্শ করে থাকি। তার কথায় বোঝা যাচ্ছিলো যে, এসব বিষয় বোর্ডের সাথে পরামর্শ করার পরই সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হযরত মুফতী সাহেব যখন এ উত্তর সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন যে, মন্ত্রী সাহেব বলেছেন যে, আমরা বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। মূলত: তারা বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ

করেছে ঠিকই, কিন্তু বোর্ডের একটি পরামর্শও তারা বাস্তবায়ন করেনি। এরপর তিনি বিবৃতিতে এ সংবিধানের বিরোধিতা করেন এবং এর ভুলসমূহ তুলে ধরেন।

'ইসলামী শিক্ষা বোর্ড' সংসদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো। এরপর সংসদ কর্মকর্তা হযরত মুফতী সাহেবের নিকট এসে বলেন যে, মুফতী সাহেব! আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এ বিবৃতি দিলেন অথচ আপনি নিজেও আমাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য। আপনার তো এমন বিবৃতি দেওয়া ঠিক না।

হযরত মুফতী সাহেব বললেন যে, আমি এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ শুধুমাত্র দ্বীনের খেদমতের নিয়তে গ্রহণ করেছিলাম। বিবেককে বিক্রি করার জন্যে আমি এ সদস্যপদ গ্রহণ করিনি যে, বিবেকবিরোধী কোন কাজ হলেও আমি চুপ থাকবো। তাই আমি আমার দ্বীনী দায়িত্ব মনে করে এ বিবৃতি দিয়েছি। আমার এ কর্মপন্থা যদি আপনার পসন্দ না হয় তাহলে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যে, যে দিন আমি বোর্ডের এ সদস্যপদ গ্রহণ করেছি সেদিনই আমি পদত্যাগপত্র লিখে পকেটে রেখে দিয়েছি। যখনই দেখবো যে, আমার বিবেকসম্মত কাজ হচ্ছে না তখনই আমি আমার পদত্যাগপত্র দিয়ে দেবো।

তখন মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, মুফতী সাহেব! আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনি হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে পাকিস্তান এসেছেন। এখানে এ চাকুরী ছাড়া আপনার অন্য কোন আমদানীর পথ নেই। কোন ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। এভাবে পদত্যাগপত্র দিয়ে যদি আপনি চাকুরী ছেড়ে দেন তাহলে আপনার দিন যাবে কেমনে? তখন মুফতী সাহেব হেসে বললেন : আপনি যে, ভয় পাচ্ছেন, চাকুরী গেলে চলবে কেমনে? আপনি আপনার চাকুরী যাওয়ার ব্যাপারে এ ভয় করুন। কারণ, আপনি আপনার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত এই যে, স্যুট বানিয়েছেন, এটা তৈরি করতে দু'শ টাকা লেগেছে। ঐ যুগে দু'শ টাকা বিরাট ব্যাপার ছিলো। প্রতিবার স্যুট বানাতে আপনার দু'শ টাকা লাগবে। তাই আপনার এমন চাকুরী প্রয়োজন, যাতে হাজার হাজার টাকা বেতন পাওয়া যাবে। এছাড়া আপনার দিন যাবে না। আর আমার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত এই যে, জামা-পায়জামা এবং টুপি ও জুতা রয়েছে, এসব কিছু দেড় টাকায় বানানো যায়। তাই আমি আপনার এ সমস্ত বেতন-ভাতার পরোয়া করি না। আজ যদি আমি চাকুরী ছেড়ে দেই আমার কোন সমস্যা নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে অল্প-বিস্তর জ্ঞান দিয়েছেন, আমি তার মাধ্যমে সহজেই দেড় টাকা উপার্জন করতে পারবো।

শৃঙ্খলার সাথে ব্যয় করার অভ্যাস গড়ো

এমন কথা সে ব্যক্তিই বলতে পারে, যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে অল্প ব্যয়ে ঢেলে সাজিয়েছে। হযরত ওয়ালিদ সাহেব বলতেন যে, আয় কম হলেও তা শৃঙ্খলার সাথে ব্যয় করবে। টাকা-পয়সা যেন সঠিক খাতে এবং সঠিক জায়গায় ব্যয় হয়। সুতরাং আমরা তো দেখেছি শৃঙ্খলার সাথে ব্যয় করা কাকে বলে। আপনারা শুনে অবাক হবেন, হযরত ওয়ালিদ সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী এবং উঁচু স্তরের উস্তাদ ছিলেন। যখন তিনি পড়ানো আরম্ভ করেন, তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিলো পনেরো টাকা। আর যখন তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ ছেড়ে আসেন, তখন তাঁর বেতন ছিলো মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা।

চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন

এ সময় কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পক্ষ থেকে সেখানকার 'প্রধান শিক্ষক' পদে যোগদানের জন্যে তাঁকে আহ্বান করা হয় এবং বলা হয় যে, আমরা আপনাকে পাঁচশ' টাকা বেতন দেবো। সে সময়ের পাঁচশ' টাকা বর্তমানের পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়। অথচ দারুল উলূম দেওবন্দে সে সময় মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকার চেয়ে কম ছিলো। এই প্রস্তাবের উত্তরে হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) 'মুতান্নাবী'র একটি কবিতা লিখে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। কবিতাটি ছিলো এই-

مَنْ رَكِبَ الثَّوْرَ بَعْدَ الْجَوَادِ
اَنْكَرَ اَطْلَافَهُ وَالْغَبَبَ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি একবার উন্নত মানের ঘোড়ায় আরোহন করেছে সে পরবর্তীতে বলদের পিঠে আরোহন করে না।'

অর্থাৎ, দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ানোর পর এখন কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার পাঁচশ' টাকার চাকুরী গ্রহণ করা আর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়ার পর বলদের পিঠে সওয়ার হওয়া একই কথা।

এ কথা বলে তিনি ঐ চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন।

পঁয়ষট্টি টাকায় চার পরিবারের লালন-পালন

তাঁর পরিবার বড় ছিলো। তাঁর কয়েকজন বোন বিধবা হয়েছিলেন। তাঁদের সবার দেখাশোনা এবং তাঁদের সবার ব্যয়ভার তিনি নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। অথচ তাঁর বেতন ছিলো মাত্র পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন টাকা এবং সর্বশেষ বেতন ছিলো

মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা। এ বেতন দিয়ে তিনি চারটি পরিবারের প্রতিপালন করেন। এমতাবস্থায় তিনি যে, শুধু আরামে দিনাতিপাত করেছেন শুধু তাই নয়, বরং তিনি নিজ হাতে ক্রয় করা কিতাবের একটি অনেক বড় গ্রন্থাগার রেখে যান। কিতাবের প্রতি তাঁর বিশেষ এক আকর্ষণ ছিলো। তাই তিনি অনেক কিতাব সংগ্রহ করেন। বর্তমানে ঐ গ্রন্থাগারের মূল্য কয়েক লাখ টাকা হবে।

আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যয়ের বাজেট করতে হবে

তিনি বলতেন যে, শৃঙ্খলার সাথে ব্যয় করার কারণে এত কিছু করা সম্ভব হয়েছে। চিন্তা-ভাবনা করে সবকিছুর একটি সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি, হযরত ওয়ালিদ সাহেবের নিকট ছোট একটি সিন্ধুক ছিলো। তার মধ্যে অনেকগুলো খাম ছিলো। একটি খামে লেখা ছিলো– 'ঘরের খরচ এবং রেশন'। একটিতে লেখা ছিলো– 'ফল'। অর্থাৎ, আমি আমার বেতন থেকে উদাহরণ স্বরূপ দুই টাকার বা পাঁচ টাকার ফল খাবো এবং পরিবারের সদস্যদেরকে খাওয়াবো। সেমতে বেতন পাওয়ার পর দুই টাকা ফলের খামের মধ্যে রেখে দিতেন। এখন সারা মাসে ঐ দুই টাকারই ফল আনতেন। এমন নয় যে, এক মাসে তো দশ টাকার ফল আনলেন, আরেক মাসে এক পয়সার ফলও আনা হলো না। এই ব্যবস্থাপনার ফলে সারা মাসেই একটি আনুপাতিক হারে ফল আনা হতো। কাপড়ের জন্যে পৃথক খাম ছিলো। জুতার জন্যে পৃথক খাম ছিলো। প্রত্যেক খাতের জন্যে পৃথক পৃথক খাম ছিলো। যে খামের পয়সা শেষ হয়ে যেতো, সে খাতের কেনাকাটা বন্ধ। যেমন, ফলের খাম যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত আর ফল আসবে না। যদি কাপড়ের খাম খালি হয়ে যায় তাহলে কাপড়ের দরজা বন্ধ। পরবর্তীতে আবার যখন কাপড়ের খাতে পয়সা আসবে তখন কাপড় খরিদ করা হবে। এই সুব্যবস্থাপনার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা খুব বরকত দান করেন।

দান-খয়রাতেরও মাসিক হার নির্ধারিত ছিলো

তাছাড়া হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.)-এর সারা জীবনের অভ্যাস ছিলো যে, যে কোন আয় হাতে আসলে তা যদি পরিশ্রম করে হাতে আসত তাহলে তার এক বিংশতি অংশ আর যদি বিনা পরিশ্রমে লাভ হতো তাহলে তার এক দশমাংশ বের করে পৃথক খামে রেখে দিতেন এবং দান-খয়রাত করতে হলে সেখান থেকে ব্যয় করতেন। সেই খামের উপর 'দানের খাত' লেখা থাকতো। সেই খাম থেকে কাউকে হাদিয়া দিতেন। কাউকে উপহার দিতেন। কোথাও মসজিদে দান

করতেন। আমরা এ খামটি কখনো শূন্য দেখিনি। আল্লাহ তাআলা এতে এ পরিমাণ বরকত দান করেছিলেন। এভাবে ব্যয় করার ফল এই হয়েছিলো যে, অনায়াসে কাজ সমাপ্ত হতো। কখনোই এরূপ মনে হতো না যে, খুব বেশি টানাটানি চলছে। এর সাথে সাথে বেতন থেকে বাঁচিয়েও দানের খাতে ব্যয় করতেন।

হযরত ওয়ালিদ সাহেব বলতেন যে, শৃঙ্খলার সাথে ব্যয় করার অভ্যাস করলে অল্প পয়সার মধ্যে আল্লাহ তাআলা অধিক বরকত দান করেন এবং সে পয়সা দ্বারা মানুষ অধিক উপকৃত হতে পারে। আর বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার সাথে ব্যয় করলে এবং অপব্যয় ও অপচয় করলে স্বর্ণের স্তুপ এবং কারুণের ভাণ্ডারও অপ্রতুল হবে। যখন মানুষের অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করার, নির্দ্বিধায় ব্যয় করার এবং অসমীচীন ক্ষেত্রে ব্যয় করার অভ্যাস হয়, তখন বড় বড় ধন ভাণ্ডারও যথেষ্ট হয় না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) একটি ঘটনা শুনাতেন। ঢাকায় বেগম বাজার নামে একটি বিখ্যাত বাজার আছে। এ অঞ্চলটি ছিল একজন বড় মাপের নওয়াব সাহেবের। নওয়াব সাহেব প্রচুর জায়গা-জমির মালিক ছিলেন। তার টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদও ছিলো। এক সময় নওয়াব সাহেবের মৃত্যু হলো। তার এক ছেলে আর এক মেয়ে ছিলো। সমস্ত জায়গা-জমি এবং টাকা-পয়সা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের হাতে এলো। একবার নওয়াব সাহেবের মেয়ের কাপড় কেনার প্রয়োজন হলো। তখন সে এক কাপড় ব্যবসায়ীকে বললো– তুমি আমার নিকট কাপড়ের থান নিয়ে আসবে, আমি সেখান থেকে আমার জন্যে কাপড় পসন্দ করে নেবো। সুতরাং ব্যবসায়ী লোকটি অনেকগুলো থান নিয়ে তার নিকট এলো। তার মধ্যের একটি কাপড় পসন্দ হলে সে লোকটিকে বললো যে, এই থান থেকে আমাকে এক জোড়া কাপড় (তৈরী হয় পরিমাণ কাপড় দাও) চিরে দাও! লোকটি যখন কাপড় চিরলো, তখন কাপড় চেরার আওয়াজ নবাব কন্যার খুব পসন্দ হলো। তখন সে ব্যবসায়ীকে বললো– আরো কাপড় চেরো। সে আরো কাপড় চিরলো। এখন নবাব কন্যার এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো যে, দিন-রাত ব্যবসায়ীর দ্বারা কাপড় আনাতো এবং চেরাতো এবং তার আওয়াজ উপভোগ করতো।

আরেকজন ছিলো তার ছেলে। সে একবার কোথাও গেলে সেখানে বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন পড়লো। ম্যাচ জ্বালিয়ে যখন বাতি ধরানো হলো, তখন

বারুদ জ্বলার গন্ধ তার খুব ভালো লাগল। সে দিন-রাত ম্যাচ আনাতে এবং তা জ্বালিয়ে তার গন্ধ শুঁকতে আরম্ভ করলো। এভাবে ম্যাচের স্তুপ হয়ে গেলো। এভাবে দু'জনই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। অবশেষে তাদের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত জায়গা-জমি এর পিছনে নিঃশেষ হয়ে গেলো। অবশেষে এ অবস্থা হলো যে, সেই ভাই-বোন বাটি হাতে ঐ বাজারে ভিক্ষা করতো। এ কারণে এ বাজারের নাম 'বেগম বাজার' প্রসিদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর থেকে হেফাযত করুন। আমীন। এটা মূলত অপচয়ের শাস্তি।

আয় অনুপাতে ব্যয় করা মিতব্যয়িতা

আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে এ বুঝ দান করেন। আমরা যেন আমাদের ব্যয়কে আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। কারণ, আয় বাড়ানো আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, ব্যয় কমানো আমাদের ইচ্ছাধীন। যা ইচ্ছাধীন তার উপর আমল করো। শৃঙ্খলার সাথে ব্যয় করবে তো ইনশাআল্লাহ তাআলা তাতে বরকত হবে। তখন কৃপণতার প্রয়োজনই হবে না। শৃঙ্খলা এবং মিতব্যয়িতা তো ভালো, কিন্তু কৃপণতা ও কিপটেমী করা ভালো নয়। কৃপণতার অর্থ হলো, শরীয়ত যেখানে খরচ করতে বলেছে সেখানে খরচ না করা বা কম করা। কিন্তু নিজের আয় মতো ব্যয় করা কৃপণতা নয়। এটা হলো শৃঙ্খলা এবং মিতব্যয়িতা। এটি একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নসীহত। আমরা যদি এর উপর আমল করি তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ উত্তমভাবে সমাধান হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ নসীহতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

পঁচাত্তরতম মজলিস

অহংকার ও লজ্জার পার্থক্য

সূচিপত্র

অহংকার ও লজ্জার পার্থক্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

নিম্নোক্ত মালফূযটি হযরত থানভী (রহ.) এক ব্যক্তির পত্রের উত্তরে ইরশাদ করেছেন। তিনি বলেছেন–

> মানুষের সামনে দিয়ে পানির কলস বা আমের ঝুড়ি ইত্যাদি বহন করে নিয়ে যেতে যে, লজ্জাবোধ হয়– মধ্যম স্তরের লোকের জন্যে এর উৎস বা কারণ অহংকার হয়ে থাকে। এর চিকিৎসা হিসেবে লৌকিকভাবে এগুলো বহন করা জরুরী। অভ্যাসের পরিপন্থী কাজ করার দ্বারা যে, লজ্জাবোধ হয় তাকে 'খাজলাত' (خجلت) বলা হয়। তবে অহংকার এবং লজ্জার পার্থক্য এভাবে প্রতীয়মান হতে পারে যে, উদাহরণ স্বরূপ কারো যদি ভরা বাজারের ভিতর দিয়ে মাথায় ঝুড়ি বহন করে নিতে কষ্টবোধ হয় এবং এতে অহংকারের সন্দেহ হয়, তখন দেখতে হবে যে, উদাহরণ স্বরূপ যদি তাকে তার অভ্যাসের বিপরীতে হাতির উপর বসিয়ে জনসমাগমসহ শান-শওকতের সাথে বাজারে বের করা হয় তাহলে এতেও কি তার সংকোচ ও লজ্জাবোধ হয়, কি না? এতেও যদি সংকোচবোধ হয় তাহলে এমন ব্যক্তির ঝুড়ি উঠানোতে যে, সংকোচবোধ হয় একে 'অহংকার' বলা হবে না, বরং 'লজ্জা' বলা হবে।
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯২)

অহংকার ও লজ্জার একটি দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তাআলা হযরত থানভী (রহ.)কে অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দান করেছিলেন। এ মালফূযে তিনি বলেন : দু'টি জিনিসের মধ্যে অনেক সময় অস্পষ্টতা ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, একটিকে অপরটি বলে ধারণা হয়। একটি হলো, 'অহংকার'। অহংকার খুবই খারাপ জিনিস। এটি অনেক আধ্যাত্মিক রোগের মূল। আর দ্বিতীয়টি হলো 'লজ্জা'। কোন কাজ করতে লজ্জাবোধ হওয়া খারাপ নয়, বরং তা জায়েয।

হযরত বলেন : কোন ব্যক্তির যদি পানির কলস বা আমের ঝুঁড়ি মাথায় নিয়ে বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে সংকোচবোধ হয়, তো কখনো এ সংকোচ অহংকারের কারণে হয়ে থাকে। কারণ, মানুষ নিজেকে নিজে অন্যের চেয়ে বড় মনে করে। আর চিন্তা করে যে, এ বোঝা মাথায় বহন করে নিয়ে যাওয়া আমার মর্যাদার পরিপন্থী। এটি অহংকার। তার অন্তরে একথা আছে যে, আমি অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল। এ বোঝা বহন করা আমার মর্যাদার তুলনায় অনেক নিম্ন মানের কাজ। এ মনোভাব অহংকার, যা নিষিদ্ধ এবং হারাম। কোন ব্যক্তি যদি এ কারণে বোঝা বহন করা থেকে বিরত থাকে যে, এ কাজ আমার মর্যাদার পরিপন্থী তাহলে তার চিকিৎসা এই যে, এ কাজটিই তার দ্বারা জোর-জবরদস্তি করাতে হবে। যাতে করে তার মন-মগজে নিজের সম্পর্কে যে উঁচু মর্যাদার ধারণা বসে গিয়েছে তা বের হয়ে যায়।

এটি লজ্জা

আর অনেক সময় এ ধরনের কাজ করতে সংকোচবোধ হয় লজ্জার কারণে। অর্থাৎ, এ কাজ করার যেহেতু অভ্যাস নেই, আর অভ্যাস বিরোধী কাজ করতে মানুষের লজ্জাবোধ হয়। এটা এ কারণে নয় যে, এ কাজ আমার মর্যাদার পরিপন্থী, বরং এ কারণে যে, সাধারণত: এ কাজ আমি করি না। হঠাৎ জনসমক্ষে এ কাজ করলে মানুষ কী মনে করবে। একটি অস্বাভাবিক কাজ হবে। এজন্যে এমন কাজ করতে সংকোচবোধ হয়– এটি হলো, 'লজ্জা'। এটি অহংকার নয়। এ কারণে যদি কেউ বোঝা বহন না করে তাতে দোষের কিছু নেই।

অহংকার ও লজ্জা বুঝার উপায়

এখন প্রশ্ন হলো, এটা কীভাবে জানা যাবে যে, এ বোঝা বহন করতে আমার যে সংকোচবোধ হচ্ছে তা কি মর্যাদার পরিপন্থী হওয়ার কারণে এবং অহংকারের কারণে হচ্ছে, নাকি অভ্যাসের পরিপন্থী হওয়ার কারণে এ সংকোচবোধ হচ্ছে? হযরত থানভী (রহ.) বিষয়টি এভাবে পরীক্ষা করতে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি

বোঝা বহন করতে সংকোচবোধ করছে, সে ব্যক্তিকেই যদি তার অভ্যাসের বিপরীতে হাতির পিঠে বসিয়ে মিছিল বের করা হয় তাহলে কি তার লজ্জাবোধ হবে, না কি হবে না? এতেও যদি তার লজ্জাবোধ হয় তাহলে বোঝা যাবে যে, ঝুড়ি বহন করতে তার যে লজ্জাবোধ হচ্ছিলো বাস্তবিকার্থেই তা তার অভ্যাসের পরিপন্থী হওয়ার কারণে হচ্ছিলো।

কিন্তু যদি অবস্থা এই হয় যে, হাতির পিঠে বসিয়ে মিছিল করায় তো সে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমাকে নিয়ে মিছিল বের করা হচ্ছে। আমাকে সম্মান করা হচ্ছে। অথচ ঝুড়ি উঠানো যদি অভ্যাস পরিপন্থী কাজ হওয়ার কারণে লজ্জাবোধ হয়ে থাকে তাহলে মিছিল বের করাতেও লজ্জাবোধ হওয়ার কথা। তাই বোঝা গেলো, ঝুড়ি উঠাতে যে, লজ্জাবোধ হচ্ছিলো তা অহংকারের কারণে হচ্ছিলো বরং নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করার কারণে হচ্ছিলো। ইনিই হলেন বিজ্ঞ চিকিৎসক (হাকীম), যিনি এ কথা বুঝতে পারছেন যে, কোথায় রোগ রয়েছে, আর কোথায় রোগ নেই।

যাই হোক, যেখানে এ ধরনের কাজ করতে মানুষ এ কারণে দূরে থাকে যে, এ কাজ আমার মর্যাদার পরিপন্থী। তাহলে বুঝে নাও ভিতরে অহংকারের রোগ রয়েছে এবং এর চিকিৎসা করানো জরুরী।

হযরত উমর ফারূক (রাযি.) নিজে নিজের চিকিৎসা করেন

এভাবে চিকিৎসা করা হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) থেকে প্রমাণিত আছে। হযরত উমর ফারূক (রাযি.)-এর নিকট তাঁর খেলাফতকালে রোমের তৈরি একটি জুব্বা আসে। জুব্বাটি খুবই সুন্দর এবং জাঁকজমকপূর্ণ ছিলো। তিনি চিন্তা করলেন জুমুআর দিন জুব্বাটি পরে খুতবা দিবেন এবং নামায পড়াবেন। সেমতে তিনি জুব্বা পরে মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনলেন। খুতবা দিলেন এবং নামায পড়ালেন। হযরত উমর ফারূক (রাযি.) এমনিতেও সুন্দর সুঠাম এবং দীর্ঘদেহী ছিলেন। জুব্বা পরার পর তাঁকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিলো। উপস্থিত লোকেরাও দেখলো যে, জুব্বাটি অনেক সুন্দর লাগছে। নামায শেষ করে তিনি যখন ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন একটি মশক নিয়ে তাতে পানি ভরে কাঁধে বহন করে মদীনা শরীফের বিধবাদের ঘরে গিয়ে গিয়ে পানি পৌছাতে লাগলেন। একটু পূর্বেই যিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে জাঁকজমকের সাথে খুতবা দিচ্ছিলেন তিনিই এখন বাড়ি বাড়ি পানি পৌছে দিচ্ছেন। এক লোক জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এমন করছেন কেন? তিনি বললেন যে, আমি যখন ঐ জুব্বা পরে খুতবা দেই, তখন আমাকে খুব জাঁকজমকপূর্ণ দেখাচ্ছিলো। তাই আমার আশঙ্কা হলো যে, আমার মনের মধ্যে আত্মশ্লাঘা ও অহংকার প্রবেশ না করে। এর প্রতিকারের জন্যে আমি এ কাজ করছি।

আল্লাহু আকবার! এভাবে নিজের চিকিৎসা এমন মহান ব্যক্তি করছেন, যাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ

'আমার পর যদি কেউ নবী হতো, তবে উমর নবী হতো।'

কিন্তু তাঁর মতো ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে নিজের নফসের পর্যবেক্ষণ করছেন যে, আমার নফস তো আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে না। যদি নিয়ে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার চিকিৎসা করা জরুরী।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) নিজে নিজের চিকিৎসা করেন

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) মওলবী কিসিমের মানুষ ছিলেন। তাঁর না রাজনীতির সাথে সম্পর্ক ছিলো, না অন্য কিছুর সাথে। সারাটি জীবন আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের বাণী পাঠদানে অতিবাহিত করেন। তিনি সারা জীবন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন। পাঁচ হাজার তিনশ' চৌষট্টিখানা হাদীস তাঁর থেকে বর্ণিত আছে। মারওয়ান বিন হিকাম একবার মদীনা শরীফের গভর্নর ছিলো। এক সময় তাকে সফরে যেতে হয়। তখন সে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতের ফয়েয এবং তাঁর শিক্ষার প্রভাবে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সারা দিন বসে শাসন কাজ চালাতেন। বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান দিতেন। আদালতের বিচার পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন বিষয়ের যাচাই-বাছাই করতেন। একজন গভর্নরের যাবতীয় কাজ তিনি পালন করতেন।

সন্ধ্যায় যখন রাষ্ট্রীয় ভবন ছেড়ে বাড়ি যেতেন, তখন লাকড়ির একটি বোঝা মাথায় নিয়ে মদীনা শরীফের বাজারের ভিতর দিয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে লাকড়ি বিক্রি করতেন। এই লাকড়ি বিক্রি করে তিনি তা দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করতেন। শুধু তাই নয়, বরং লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে এভাবে ঘোষণা করতে করতে বাজারের ভিতর দিয়ে যেতেন যে, 'সরো, সরো আমীরুল মুমিনীন আসছেন। সরো, আমীরুল মুমিনীন আসছেন।' একদিকে তিনি 'আমীরুল মুমিনীন, অপর দিকে তিনি এ কাজ করছেন। কেন করছেন? এজন্যে করছেন যে, সারা দিন বসে যে, রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, এর ফলে যেন মাথায় এ কুচিন্তা না জাগে যে, আমি অনেক বড় ব্যক্তি আর অন্য সবাই আমার চেয়ে তুচ্ছ। এর চিকিৎসা হিসেবে তিনি এ কাজ করতেন।

সূচিপত্র

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) নিজে নিজের চিকিৎসা করেন

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) ইরান বিজয়ী এবং পারস্য সম্রাট কিসরাকে পরাস্তকারী সাহাবী। তিনি তাঁর অগ্নিঝরা বক্তব্য দ্বারা কিসরার রাজপ্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেদজান্তা ছিলেন। হযরত উমর ফারূক (রাযি.) তাঁকে মাদায়েনের গভর্নর বানিয়ে পাঠান। মাদায়েন ইরানের রাজধানী ছিলো। ইরান সে সময়ে সারা পৃথিবীর পরাশক্তি ছিলো। চিন্তা করে দেখুন, তার রাজধানী কেমন জাঁকজমকপূর্ণ এবং প্রভাবশালী ছিলো। বর্তমান যুগের ওয়াশিংটন বা মস্কোর সাথে এর তুলনা হয়। আমি নিজে কিসরার রাজমহল দেখেছি। আজ এতদিন পরে সেই মহল ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও তার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

যাই হোক, হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাযি.) যখন মাদায়েনের গভর্নর হয়ে গেলেন, তখন তিনি একটি গাধার পিঠে সওয়ার ছিলেন। যা সে সময় অতি সাধারণ মানের বাহন ছিলো। তাঁরও নিয়ম এই ছিলো যে, সারা দিন শাসন কাজ চালাতেন এবং সন্ধ্যা বেলা সাধারণ ব্যবসায়ীদের মতো বাজারে গিয়ে নিজের মাল বিক্রি করে জীবিকা উপার্জন করতেন। যদিও শাসন কাজ করে বেতন নেওয়া জায়েয ছিলো, কিন্তু এভাবে ব্যবসা করার আসল উদ্দেশ্য ছিলো শাসনকার্য পরিচালনার কারণে নিজের মধ্যে যেন অহংকার ও আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি না হয়। এর প্রতিকার হিসাবে তিনি সাধারণ মানুষের মতো ব্যবসা করতেন।

পীর-মাশায়েখের নিরূপিত ব্যবস্থা বিদআত নয়

বিধায় পীর-মাশায়েখ তাদের দীক্ষাধীন ব্যক্তিদের জন্যে এ জাতীয় যে সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারণ করেন, সেগুলোর উৎস হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের এ সমস্ত আমলের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কেউ কেউ পীর-মাশায়েখের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যে, এরা যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন বা কষ্ট-সাধনা করিয়ে থাকেন এসব বিদআত। কিন্তু আপনাদের সামনে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম, এগুলো হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের তরীকা। তাঁরা নিজেদের নফসের ইসলাহের জন্যে এ সমস্ত কাজ করতেন। পীর-মাশায়েখ তাঁদের কর্মপন্থা থেকে এ সমস্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নিরূপণ করেছেন।

দারুল উলূম দেওবন্দ এবং আত্মশুদ্ধি

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাথমিক যুগে শুধু কিতাব পড়ানো হতো না, বরং একেকটি বিষয়ের তারবিয়াত প্রদান করা হতো। এ কারণেই দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তির তারিখ হলো– "در مدرسه خانقاه دیدیم" (মাদরাসার মধ্যে

খানকাহ দেখেছি)। অর্থাৎ, এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠদান কেন্দ্র, সাথে সাথে এটা খানকাহও। এখানের মানুষের তারবিয়াত করা হয়। আল্লাহওয়ালা তৈরি করা হয়। এখানে উস্তাদগণ তাদের ছাত্রদেরকে শুধু সবকই পড়াতেন না, বরং তাদের আধ্যাত্মিক রোগসমূহের ইসলাহেরও ফিকির করতেন।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এবং তালিবে ইলমদের তারবিয়াত

সায়্যিদুত তায়েফাহ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ ছাহেব গাঙ্গুহী (রহ.) সম্পর্কে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী (রহ.) 'আরওয়াহে সালাসা' নামক কিতাবে লিখেছেন যে, কোন তালিবে ইলমের মধ্যে যখন তিনি তাকাব্বুর এবং উজবের আলামত দেখতে পেতেন, তখন তিনি তাকে মানুষের জুতা সোজা করার কাজে লাগিয়ে দিতেন বা এ জাতীয় অন্য কোন কাজ করাতেন। আর যখন কোন তালিবে ইলমের মধ্যে দেখতেন যে, তার মধ্যে বিনয় আছে, তখন তিনি নিজে তার জুতা উঠাতেন।

একবার সবক পড়াচ্ছেন। এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বৃষ্টির কারণে সেখান থেকে উঠে যেতে হলো। ছাত্ররা নিজ নিজ কিতাব তুলে নিয়ে ভিতরে যেতে আরম্ভ করলো, আর হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) ছাত্রদের জুতা জড়ো করে নিয়ে ভিতরে গেলেন। একদিকে নিজের ছাত্রদের তারবিয়াত করছেন, অপর দিকে নিজের আমল দ্বারা একথা বোঝাচ্ছেন যে, এ কাজ এমন নয় যে, একে তোমরা নিজেদের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করবে।

হযরত মাওলানা ই'যায আলী ছাহেব (রহ.)-এর বিনয়

আমার ওয়ালিদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (রহ.) এ ঘটনা শোনান যে, শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ই'যায আলী ছাহেব (রহ.) একবার কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব এবং দারুল উলূম দেওবন্দের আরো কিছু উস্তাদ– যাঁরা হযরত মাওলানার শাগরিদ ছিলেন, তাঁরাও সফরসঙ্গী ছিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত মাওলানা ই'যায আলী ছাহেব (রহ.) বলেন যে, হাদীস শরীফে আছে যে, যখন কিছু মানুষ সফরে যাবে, তখন তারা একজনকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত করবে। তাই একজনকে আমীর বানানো হোক। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব বললেন– আমীর বানানোর কী দরকার। আমাদের আমীর তো বানানোই আছে। উদ্দেশ্য ছিলো আপনিই তো আমাদের আমীর। হযরত মাওলানা ই'যায আলী ছাহেব (রহ.) বললেন যে, তোমরা আমাকে আমীর বানাতে চাও? আমরা বললাম, জী হাঁ। আপনি থাকতে আর কে আমীর হবে! তিনি বললেন : কাউকে আমীর বানালে

তার হুকুম মানতে হয় এবং তার আনুগত্য করতে হয়। আমরা বললাম : ইনশাআল্লাহ আমরা আপনার হুকুম মানবো। তিনি বললেন : আচ্ছা ঠিক আছে।

সেমতে আমরা সবাই দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে রওয়ানা হয়ে স্টেশনে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ পর রেল আসলো। তখন হযরত মাওলানা ই'যায আলী ছাহেব (রহ.) কয়েকজনের কয়েকটি বিছানা বহন করে গাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। আমরা ছাত্ররা বললাম : হযরত! এ কী করছেন? তিনি বললেন : না, আমীরের হুকুম মানতে হবে। সুতরাং উস্তাদ সামানা বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, আর ছাত্ররা পিছে পিছে চলছে। এরপর সফরের মধ্যে যখনই কোন খেদমতের অবকাশ আসতো, তখনই মাওলানা সবার আগে সে খেদমত আঞ্জাম দিতেন। যখনই আমরা বলতাম যে, এ কাজটি আমরা করি, তখনই বলতেন, না আমীরের হুকুম। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব বলেন যে, আমীরের হুকুম মানা আমাদের পুরা সফরকেই জটিল করে দেয়। এঁরাই ছিলেন আমাদের আকাবির, বর্তমানে আমরা নিজেরাই নিজেদের শান বানিয়ে নিয়েছি যে, এ কাজ আমাদের শানের খেলাফ। এ পদ্ধতি কেবলই অহংকার।

হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব (রহ.)-এর বিনয়

হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব কান্ধলবী (রহ.) অনেক উঁচু স্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর বেলায়াত এবং তাঁর ইলম ও তাকওয়া খুব প্রসিদ্ধ ছিলো। তাই মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতো। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সুখ্যাতি শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে কান্ধলা আসে। লোকটি পায়ে হেঁটে চলছিলো। হাতের মধ্যে কিছু মাল-সামান ছিলো। সামানগুলি ভারি ছিলো। এজন্যে কিছুদূর গিয়ে সামানগুলো মাটিতে রাখতো এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পুনরায় সামান তুলে নিয়ে হাঁটা দিতো। হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব (রহ.)ও ঘটনাক্রমে অন্য এক শহর থেকে ঐ পথ দিয়ে আসছিলেন। পথের মধ্যে তিনি দেখলেন, একজন বৃদ্ধ লোক মাল-সামান বহন করে যাচ্ছেন। কিন্তু সামান ভারি হওয়ার কারণে কিছুদূর গিয়ে তা নামিয়ে রাখছেন। লোকটির সামান বহন করতে কষ্ট হচ্ছে। হযরত মাওলানা তাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন যে, আপনি অনুমতি দিলে আপনার সামান আমি বহন করতাম। বৃদ্ধ লোকটি বললেন : আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। আপনি বহন করে দিলে তো বড় মেহেরবাণী হতো। হযরত মাওলানা তার সামান বহন করে চলতে আরম্ভ করলেন।

পথের মধ্যে উভয়ের কথা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় যাচ্ছেন? বৃদ্ধ লোকটি উত্তর দিলো– কান্ধলা যাচ্ছি। মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন : কেন

যাচ্ছেন? বৃদ্ধ লোকটি উত্তর দিলো– শুনেছি সেখানে একজন বড় মাওলানা ছাহেব আছেন। তাঁর নাম মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। এবার বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞাসা করলো : আপনি কোথায় থাকেন? হযরত মাওলানা বললেন– আমিও কান্ধলায় থাকি। বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞাসা করলো : আপনি মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব সম্পর্কে জানেন? মাওলানা বললেন, হ্যাঁ, জানি। বৃদ্ধ লোকটি বললেন : তিনি তো বড় আলেম। বড় আল্লাহর ওলী, মুত্তাকী, বুযুর্গ। মাওলানা বললেন : হ্যাঁ, নামায তো পড়ে। সারা রাস্তা এভাবেই অতিক্রম করলেন।

যখন কান্ধলা এলাকায় পৌঁছলেন এবং লোকেরা দেখলো যে, তিনি সামান কাঁধে বহন করে এভাবে যাচ্ছেন। তখন সবাই সামান বহন করার জন্যে এগিয়ে আসছিলো। কেউ তাঁকে সম্মান করছিলো। বৃদ্ধ লোকটি তো এ অবস্থা দেখে হতভম্ব! এসব কী হচ্ছে? পরে বৃদ্ধ লোকটি জানতে পারলো যে, ইনিই মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব। আল্লাহ তাআলা এ সকল হযরতকে এ যামানায় হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের আখলাকের নমুনা বানিয়েছিলেন।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর বিনয়

হযরত কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব ছাহেব (রহ.)-এর শ্বশুর অনেক বড় নবাবের সন্তান ছিলেন। ধনী ঘরের সন্তান ছিলেন। তাঁর বাবার ইচ্ছা হলো, তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দে পড়তে পাঠাবেন। দারুল উলূম দেওবন্দের আবাসন ব্যবস্থা ছিলো অতি সাধারণ মানের। তাঁর আব্বা চিন্তা করলেন, দারুল উলূম দেওবন্দের আবাসন কক্ষে তার অবস্থান করা মুশকিল হবে। যাই হোক তিনি তার সন্তানকে ভর্তি করানোর জন্যে দারুল উলূম নিয়ে এলেন। ভর্তির কাজ সম্পন্ন হলো। মসজিদের হুজরায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর সঙ্গে তাঁর বাবার সুসম্পর্ক ছিলো। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর জানা ছিলো যে, ইনি নবাবজাদা। তাই শায়খুল হিন্দ (রহ.) ঘরে বসে বসে চিন্তা করছিলেন যে, এ বেচারা পড়তে এসেছে। মসজিদের হুজরায় তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মসজিদের কামরার মেঝেতে সে এখন শুবে। ইতিপূর্বে কখনো মেঝেতে শোয় নাই। তাই মেঝেতে শুতে তার কষ্ট হবে। তাই তিনি বাড়ি থেকে একটি চৌকি কাঁধে বহন করে তার হুজরা পর্যন্ত নিয়ে এলেন। দেখুন, একদিকে তিনি 'শায়খুল হিন্দ', বরং হযরত থানভী (রহ.)-এর কথা মতো তিনি ছিলেন 'শায়খুল আরব ওয়াল আজম'। তাঁর মতো মহান ব্যক্তি তাঁর এক হবু ছাত্রের জন্যে কাঁধে করে চৌকি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। অপর দিকে শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর চিন্তা হলো যে, যখন ছাত্রটি দেখবে যে, আমি তার জন্যে চৌকি বহন করে আনছি, তখন সে লজ্জিত হবে যে, এত বড় মানুষ আমার জন্যে

সূচিপত্র

চৌকির বহন করে আনছে। তাই তিনি হুজরার কাছে এসে তাঁকে বললেন যে, 'নাও মিঞা ছাহেবজাদা! তোমার চৌকি নাও! আমিও শায়খজাদা। নিজের চৌকি নিজে বহন করে নাও।' একথাগুলো এজন্যে বললেন, যেন তার লজ্জা কিছুটা লাঘব হয়।

সম্মান আল্লাহ তাআলার হাতে

যাই হোক, বলছিলাম যে, নিজেকে উচ্চ মর্যাদাশীল ভাবা, এ পথেই শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে যে, অমুক কাজ আমার শানের খেলাফ। আরে তুমি কী, আর তোমার শান কী। মূলত আল্লাহ তাআলা দয়া করে মানুষের অন্তরে তোমার সম্মান বসিয়ে দিয়েছেন। এটি তাঁর দয়া। মানুষ যদি তোমার বাস্তব অবস্থা জানতে পারে তাহলে তো মানুষ তোমাকে ঘৃণা করবে। থুথু নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাআলা দয়া করে তোমার দোষ ঢেকে রেখেছেন। এ কারণে মানুষ তোমাকে সম্মান করে। এ সম্মান তো আল্লাহ দিয়েছেন। শান বানানোর দ্বারা সম্মান পাওয়া যায় না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

'সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরই।' (সূরা মুনাফিকুন : ৮)

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

'এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো।'

(সূরা আলে-ইমরান : ২৬)

আল্লাহ যখন কাউকে সম্মান দান করেন, তখন ছেঁড়া এবং ময়লা কাপড়ের মধ্যেও সম্মান দান করেন। আর যদি তিনি সম্মান না দেন, বরং লাঞ্ছিত করেন তখন রাজমুকুট ও রাজসিংহাসনেও অপমানিত করেন। তাই এরূপ চিন্তা করা যে, অমুক কাজ আমার শান মোতাবেক, আর অমুক কাজ আমার শানের খেলাফ– এসব কিছু শয়তানের ধোঁকা। অহংকার এবং আত্মশ্লাঘার পথ। এ চিন্তা দূর করে দাও। কোন কাজ শানের খেলাফ নয়। তুমি কী? আরে তুমি তো মাটির তৈরি। মাটিতেই ফিরে যাবে। এই যখন অবস্থা, তাহলে কোন কাজ তোমার শানের খেলাফ?

মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব (রহ.)-এর বিনয়

আমার ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) শুনাতেন যে, হযরত মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব (রহ.), যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ছিলেন এবং হযরত

ওয়ালিদ সাহেবের উস্তাদ ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত ফতওয়াসমূহ 'ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে দশ ভলিউমে ছেপে বের হয়েছে। তারপরও সব ফতওয়া এখনো ছাপা হয়নি। তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস ছিলো, সকাল বেলা যখন মাদরাসায় যেতেন, তখন মাদরাসার আশেপাশের যত বিধবা ছিলো তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন– বাজার থেকে তোমাদের কোন সদাই আনতে হবে কি? আনতে হলে বলো, আমি এনে দিবো। তখন বিধবারা বলতো, অমুক জিনিস বাজার থেকে এনে দিন। চার-পাঁচজন বিধবার বাড়িতে গিয়ে কী কী সদাই লাগবে জিজ্ঞাসা করে বাজারে যেতেন। সেখানে সদাই খরিদ করতেন। কারো জন্যে পেঁয়াজ, কারো জন্যে টমেটো, কারো জন্যে আলু, কারো জন্যে ঢেঁড়শ, কারো জন্যে রসুন ইত্যাদি ক্রয় করতেন। তারপর সবার ঘরে ঘরে গিয়ে সেগুলো পৌঁছে দিতেন। কখনো এমন হতো যে, কোন মহিলা বলতো– মৌলভী ছাহেব! আমি আপনাকে অমুক জিনিস আনতে বলেছিলাম, কিন্তু আপনি অমুক জিনিস এনেছেন। তিনি বলতেন– কোন সমস্যা নেই, আমি বদলিয়ে আনছি। কোন মহিলা বলতো– আমি আধা সের বলেছিলাম, আপনি তিন পোয়া এনেছেন। তিনি বলতেন– আচ্ছা কোন সমস্যা নেই, আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসছি। এসব কাজ করে মাদরাসায় যেতেন, তারপর ফতওয়া লিখতেন। ইনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের 'মুফতীয়ে আযম'।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (রহ.)-এর বিনয়

আমরা আমাদের ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.)কেও এমনই দেখেছি। নিজেকে মর্যাদাশালী ভাবার চিন্তাও কখনো তাঁর মাথায় আসেনি। সাধারণ মানুষের মত হাতে দুধের হাড়ি নিয়ে বাজারে গিয়ে দুধ খরিদ করতেন। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ ছাহেব মাদানী (রহ.) এক দিন হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.)কে দেখলেন যে, তিনি পাতিলে করে দুধ ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছেন। পরের দিন হযরত মাদানী (রহ.) হযরত ওয়ালিদ ছাহেবকে ডেকে বললেন– মুফতী ছাহেব! আপনি এখন দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী হয়েছেন। আপনি যে পাতিল নিয়ে বাজারে গিয়ে দুধ খরিদ করেন। এটা এখন আপনার জন্যে মুনাসিব না। আপনার কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

হযরত মাদানী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, যদিও নিজের সম্পর্কে কোন শান ও মর্যাদার চিন্তা থাকবে না এবং ঐ কাজও শানের খেলাফ নয়। কিন্তু কতক সময় এমন কাজ করার দ্বারা মানুষের অন্তরের ভক্তি কমে যায়। আর একজন মুফতীর জন্যে মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভক্তি থাকাও জরুরী। এজন্যে হযরত মাদানী (রহ.) বললেন যে, এখন আর আপনি এ কাজ করবেন না। কিন্তু

ওয়ালিদ সাহেবের এমন কাজ করতে কোন দ্বিধা ছিলো না। কারণ, তাঁর অন্তরে নিজের কোন মর্যাদার কথা কখনো কল্পনাতেও আসে নাই। আল্লাহ তাআলা এ অবস্থাতেই তাঁকে সম্মান দান করেছিলেন। অনেক বড় বড় ব্যক্তিকে তাঁর সামনে নত করিয়েছেন। এই পোশাকেই, এই অবস্থাতেই এবং এই জীবন প্রণালীতেই বড় বড় মন্ত্রী-মিনিস্টার এবং ধনী ব্যক্তিরা এসে অবনত হতো। এ সম্মান আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন।

মর্যাদার পিছনে পড়ো না

ভাই! সম্মান তো মহান আল্লাহর দান। মানুষ নিজেকে মর্যাদাশালী করার দ্বারা মর্যাদা পাওয়া যায় না। পোশাক-পরিচ্ছদের দ্বারা, দামী জুতার দ্বারা, সুন্দর টুপির দ্বারা এবং জাঁকজমক দ্বারা সম্মান পাওয়া যায় না। এ তো মহান আল্লাহর দান। তিনি যখন সম্মান দেন, তো কুঁড়ে ঘরের মধ্যেও দেন। দেখুন, বড় বড় প্রাসাদে অবস্থানকারী, বড় বড় কুঠি এবং বাংলোয় বসবাসকারীদের বাংলো এবং কুঠি মানুষ দেখে, সেগুলোর শান-শওকত দেখে, আবার একই সাথে তাদের উপর লানত ও অভিশাপ করে। এটা তো কোন সম্মান হলো না। এটা তো বরং অসম্মান। মোটকথা, কোন কাজকে নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়।

অহংকার বহু গোনাহের মূল

আল্লাহ রক্ষা করুন, একবার যখন অহংকার এবং নিজের মর্যাদার চিন্তা অন্তরে জন্ম নেয়, তখন এর কারণে এত অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক রোগের সৃষ্টি হয়, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। ক্রোধ এর থেকে সৃষ্টি হয়। বিদ্বেষ এর থেকে সৃষ্টি হয়। হিংসা এর থেকে সৃষ্টি হয়। মানুষকে কষ্ট দেওয়া এর থেকে সৃষ্টি হয়। অবিচার এর থেকে সৃষ্টি হয়। কত আধ্যাত্মিক রোগের মূল যে, এই অহংকার তা আল্লাহই ভালো জানেন। মানুষ নিজের মনে নিজেকে বড় মনে করতে থাকে, আর প্রকৃতপক্ষে সে ছোট হতে থাকে।

একটি সুন্দর দু'আ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ শিখিয়েছেন যে−

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ فِیْ عَیْنِیْ صَغِیْرًا وَفِیْ اَعْیُنِ النَّاسِ کَبِیْرًا

'হে আল্লাহ! আমাকে আমার চোখে ছোট বানান এবং অন্যদের চোখে বড় বানান।'

কী বিরল ও বিস্ময়কর দু'আ শিখিয়েছেন। আমি আমার দৃষ্টিতে ছোট থাকবো এবং আমি আমাকে ছোট মনে করবো, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে যেন বড়

সূচিপত্র

থাকি। কেন বড় থাকবো? সে কারণে, যা হযরত মাদানী (রহ.) বলেছেন– আমি যদি মানুষের চোখে বড় না হই তবে মানুষ আমাকে কষ্ট দিবে, জ্বালাতন করবে। আর যদি আমি তাদের চোখে বড় থাকি তাহলে তাদের দেওয়া কষ্ট এবং জ্বালাতন থেকে নিরাপদ থাকবো। এ কারণে অন্যদের চোখে বড় থাকতে হবে। এখানে তাদের থেকে উপকৃত হওয়া উদ্দেশ্য নয়, তাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা উদ্দেশ্য। কিন্তু নিজের চোখে সব সময় যেন নিজেকে ছোট দেখি। আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদের সবাইকে এ গুণ দান করুন। আমীন। একবার যখন এ হাকীকত মগজে বসে যায় যে, আমি কী আর আমার শান কী এবং অন্তরে বিনয় এসে যায়, তখন এ সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাধি আপনা-আপনি দূর হয়ে যায়।

অহংকারের উত্তম চিকিৎসা হলো নিয়ামতের শোকর আদায় করা

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই ছাহেব আরেফী (রহ.) অহংকারের একটি চিকিৎসা বলেছেন। খুবই উপকারী সে চিকিৎসা। হাজার হাজার মুজাহাদা একদিকে আর এ চিকিৎসা একদিকে। তিনি বলেন যে, যখনই নিজের কোন ভালো গুণের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে, নিজের সুস্থতা, ইলম, ইবাদত, তাকওয়া, পোশাক ইত্যাদির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে এবং মনে হবে যে, আমার এ জিনিসটি একটি ভালো গুণ, তখন সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে এবং শোকরের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে শোকর আদায় করবে। 'শোকরে'র অর্থ হলো– কেউ তোমার প্রতি কোন দয়া করেছে, এই দয়ার স্বীকৃতির নাম শোকর। শোকর আদায় করা মূলত এ কথা স্বীকার করা যে, আমি এ জিনিসের হকদার বা যোগ্য নই, তবে আপনি আপনার মহানুভবতা এবং দয়াদ্রতার কারণে আমাকে এ জিনিস দান করেছেন।

শুকরিয়ার হকদার কে?

যেমন, একজনের নিকট কেউ টাকা ধার নিয়েছে। এ ধারের টাকা সে এক বছর নিজের কাছে রেখেছে। এক বছর পর সে ঐ ধারের টাকা এনে ফেরত দিলো। এই ধার নেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে সে কি কোন দয়া করলো? না, বরং দয়া তো ঋণদাতা করেছিলো। যে ব্যক্তি এক বছর পর ধার নেওয়া টাকা পরিশোধ করছে সে শুকরিয়া পাওয়ার হকদার নয়। কারণ, সে তো তার দায়িত্ব পালন করেছে। শুকরিয়ার হকদার তো সেই হয়, যে তার দায়িত্বের অধিক কোন ভালো কাজ করে। তাই যে ব্যক্তি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করলো, আর আমি সেই ভালো ব্যবহারের হকদার বা দাবিদার না, তারপরও সে আমার সাথে এই ভালো ব্যবহারটি করলো তাহলে সে শুকরিয়ার হকদার সাব্যস্ত হলো।

শুকরিয়ার মধ্যে হকদার না হওয়ার স্বীকৃতি

তাই যখন কেউ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে, তখন তার শোকর আদায়ের মধ্যে একথার স্বীকৃতিও থাকবে যে, হে আল্লাহ! আমি এ নিয়ামতের হকদার ছিলাম না, কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি কেবলই দয়া করে আমাকে এ নিয়ামত দিয়েছেন। আমার স্বাস্থ্য ভালো, তা তো আপনারই অনুগ্রহ। আমি তো এর হকদার ছিলাম না। আমার যে ইলম আছে, হে আল্লাহ! এতো আপনারই অনুগ্রহ। আমি তো এ ইলমের যোগ্য নই। আপনি কেবলই দয়া করে আমাকে এ ইলম দান করেছেন। আমার যদি কোন ইবাদতের তাওফীক হয়, তাও তো হে আল্লাহ! আপনারই অনুগ্রহ।

جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے

جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا

'যা কিছু হয়েছে তা আপনারই অনুগ্রহে হয়েছে, যা কিছু হবে তা আপনারই অনুগ্রহে হবে।'

জিগার ছাহেব বড় চমৎকার কবিতা বলেছেন–

میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے

قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں

'আমার অন্বেষাও তাঁরই দয়ার দান। এ পা ওঠে না, উঠানো হয়।'

ইবাদত, নামায, রোযা, তারাবীহ, তেলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি যা কিছু তাওফীক হচ্ছে, সব তাঁরই পক্ষ থেকে হচ্ছে। এ সমস্ত ইবাদত করা কি তোমার সামর্থ্যভুক্ত ছিলো? কেউ তাওফীক দিয়েছেন বলেই তো এ সমস্ত ইবাদত হচ্ছে। তাই কিসের ভিত্তিতে গর্ব করো যে, আমি এ কাজ করেছি, আমি সে কাজ করেছি। আরে! তুমি তো লেখকের হাতের কলমের মতো। লিখছে তো অন্য কেউ আর নাম হচ্ছে কলমের।

অধিক হারে শোকর আদায় করো

মোটকথা, আমলের যা কিছু তাওফীক হচ্ছে সব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হচ্ছে।

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

'হে আল্লাহ! আপনি যদি তাওফীক না দিতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। না আমরা সদকা করার তাওফীক পেতাম, না নামায পড়ার তাওফীক পেতাম।'

যখন তাঁর তাওফীকেই সব কাম হচ্ছে, তাই এটা শোকরের মাকাম–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

'হে আল্লাহ! আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা এবং আপনারই জন্যে সমস্ত শোকর।'

এজন্যেই বলেছেন যে, যখনই কোন ইবাদত করবে, তখনই বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

'হে আল্লাহ! আপনার বড় দয়া যে, আপনি আমার দ্বারা এ ইবাদত করিয়েছেন। এ ইবাদতের মধ্যে আমার দ্বারা যা কিছু ত্রুটি হয়েছে, এজন্যে আমি আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি।'

সারকথা

তাই যখনই কারো নিজের কোন ভালো গুণের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে, তখনই আল্লাহর শোকর আদায় করবে এবং একথা মনে জাগ্রত রেখে আল্লাহর শোকর আদায় করবে যে, এ ভালো কাজের যোগ্যতা আমার ছিলো না। আল্লাহ তাআলাই আমাকে এ যোগ্যতা দান করেছেন। যেহেতু এটা আল্লাহর দান, তাই এ নিয়ে আমার না গর্ব করার অধিকার আছে, না অহংকার করার অধিকার আছে, না অহমিকা দেখানোর অধিকার আছে। সবকিছুই তাঁর দান এবং তাঁর দয়া। যখন ইচ্ছা তিনি এ গুণ এবং যোগ্যতা ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তাআলা অপার অনুগ্রহে আমাদের সবাইকে অহংকারের আযাব থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ছিয়াত্তরতম মজলিস

গোনাহের প্রতিষেধক : তাওবা

গোনাহের বিনাশক তাওবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এ বাণীতে বলেন যে–

'আল্লাহ তাআলা বলেন যে, আমার বান্দারা যদি জমিন ও আসমানের সমপরিমাণও গোনাহ নিয়ে আমার কাছে আসে এবং আমার কাছে মাফ চায় তাহলে আমি সবাইকে মাফ করে দিবো এবং গোনাহের আধিক্যের পরোয়া করবো না। অতএব বিগত জীবন নষ্ট হওয়ার প্রতিকারও রয়েছে। দূরারোগ্য কোন ব্যাধি নেই। সেই প্রতিকার হলো, তাওবা করো। আর তাওবার পদ্ধতিও কোন শায়খের কাছেই জিজ্ঞাসা করো। আর তিনি যা কিছু বলেন তার মধ্যে নিজের মত যোগ করো না। বর্তমান যুগে নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়া ব্যাপক রূপ ধারন করছে। এ কারণেই মানুষ পথ পাচ্ছে না।'

আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৭)

আক্ষেপের পরিবর্তে তাওবা করো

অনেক মানুষের মনেই একথা জাগে যে, আমি সারাটা জীবন গোনাহের মধ্যে বরবাদ করেছি। এর সমাধান হযরত থানভী (রহ.) এ মালফূযে এই দিচ্ছেন যে, বসে বসে শুধু এ আফসোস করা যে, আমি আমার জীবন বরবাদ করে দিয়েছি– এতে কী ফায়দা? তুমি যদি নিজের জীবন বরবাদ করে থাকো, তাহলে তার প্রতিকারও আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। তাহলো আল্লাহর কাছে তাওবা করো। কোন রোগই দূরারোগ্য নয়।

বর্তমান অবস্থার উপযোগী। তাওবা সংক্রান্ত অনেক শাখাগত বিষয় হযরত থানভী এখানে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ 'তাওবা'

'তাওবা' আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ। যখন কোন মানুষ নিজের সংশোধনের জন্যে অগ্রসর হবে, তখন সর্বপ্রথম তাকে পরিপূর্ণরূপে 'তাওবা' করতে হবে। অর্থাৎ, অতীতে তার দ্বারা যত গোনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, আল্লাহর দরবারে সবগুলোর বিষয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

ইমাম গাযালী (রহ.) 'ইহইয়াউল উলূমে' 'তাওবা'র আলোচনার শুরুতেই লিখেছেন যে–

اَوَّلُ اَقْدَامِ الْمُرِيْدِيْنَ

অর্থাৎ, যে সকল মুরীদ আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে শায়খের কাছে যাবে, তাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো– পরিপূর্ণ 'তাওবা' করা। এজন্যে আল্লাহওয়ালাদের নিকট প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা আত্মশুদ্ধির ফিকির দান করেন এবং তারা নিজেদের আত্মশুদ্ধির জন্যে কোন শায়খের নিকট যায়, তখন তাকে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ তাওবা করতে বলা হয়। অর্থাৎ, প্রথমে নিজের অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ্ থেকে খাঁটি তাওবা করবে এবং তাওবার মাধ্যমে অতীত জীবনের যাবতীয় গোনাহের পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে নিজে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিবে। এভাবে তাওবা করে যখন নতুন জীবন আরম্ভ করবে, তখন তার প্রতি আল্লাহর রহমত ধাবিত হবে। এজন্যে 'তাওবা'র গুরুত্ব অপরিসীম এবং আত্মশুদ্ধির পথে এটি সর্বপ্রথম ধাপ।

সংক্ষিপ্ত 'তাওবা'

তাওবা দুই প্রকারঃ

ক. সংক্ষিপ্ত তাওবা।

খ. বিস্তারিত তাওবা।

সংক্ষিপ্ত তাওবা এই যে, এ পর্যন্ত যত গোনাহ্ হয়েছে, একবার বসে ঐ সমস্ত গোনাহ্ থেকে এক সঙ্গে আল্লাহর দরবারে তাওবা করবে। তাওবা করার পূর্বে তাওবার নিয়তে দু' রাকাআত নফল নামায পড়বে। তারপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এভাবে বলবে যে,

'হে আল্লাহ! এ পর্যন্ত আমার দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে, যত ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, যত ত্রুটি হয়েছে হে আল্লাহ! ঐ সমস্ত গোনাহ থেকে আমি মাফ চাই। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আগামীতে এ সমস্ত গোনাহ না করার সংকল্প করছি।' এ হলো সংক্ষিপ্ত তাওবা। এটি হলো প্রথম কাজ।

বিস্তারিত তাওবা

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে হলো, বিস্তারিত তাওবা। বিস্তারিত তাওবার ব্যাখ্যা এই যে, যত গোনাহ হয়েছে তার মধ্যে যে সমস্ত গোনাহের ক্ষতিপূরণ সম্ভব সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

ক্ষতিপূরণ সম্ভব হলে ক্ষতিপূরণ করতে হবে

তাওবার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, যে গোনাহের ক্ষমা চাচ্ছো, কোনভাবে যদি তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। যেমন, কারো টাকা আত্মসাৎ করেছে, এখন সে বসে বসে তাওবা করছে যে, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন– এ তাওবা কবুল হবে না। এ কারণে যে, যে ব্যক্তির টাকা আত্মসাৎ করেছো, যতক্ষণ পর্যন্ত তার টাকা ফেরত না দিবে বা তার থেকে মাফ না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে না। কারণ, এ অবস্থায় ক্ষতিপূরণ সম্ভব। কিংবা যেমন কারো অন্তরে ব্যথা দিয়েছো বা কাউকে কষ্ট দিয়েছো– তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব। তা এই যে, তার থেকে মাফ নিয়ে নিবে।

আল্লাহর হকের বিষয়ে তাওবা করার ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। যেমন, তুমি যাকাত দাওনি, যেহেতু এর ক্ষতিপূরণ সম্ভব, তাই যাকাত পরিশোধ করতে হবে। তাই তাওবা করার সাথে সাথে ক্ষতিপূরণও করতে হবে। এমনিভাবে যদি নামায ছুটে গিয়ে থাকে বা রোযা বাদ পড়ে থাকে তাহলে আগে সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করো, তারপর মাফ চাও।

উমরী কাযার বিধান

আজকাল খুব জোরেশোরে এ মাসআলা প্রচার করা হচ্ছে যে, উমরী কাযা বলে কোন জিনিস নেই। একথার দলিল হিসেবে এই হাদীস পেশ করা হয় যে,

اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি নতুন মুসলমান হলে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে সমস্ত গোনাহ সে করেছিলো সে সমস্ত গোনাহ মিটে যায়। যেমন, কেউ সত্তর বছর বয়সে ঈমান আনলো তাহলে ইসলাম গ্রহণের পর বিগত সত্তর বছরের নামায কাযা করার প্রয়োজন নেই। বরং আজ যখন সে ঈমান আনলো তখন আজ থেকেই সে নামায আরম্ভ করবে।

তাওবাকে ইসলাম গ্রহণের সাথে তুলনা করা

কিছু কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে তাওবা করাকেও তুলনা করে থাকে। তারা বলে যে, যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন নামায না পড়ে থাকে আর এখন তাওবা করে নেয় তাহলে এখন বিগত দিনসমূহের নামায কাযা করতে হবে না।

একথাটি ঠিক নয়। তাওবাকে ইসলামের সাথে তুলনা করা সঠিক নয়। এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি এখন মুসলমান হলো, সে যখন কাফের ছিলো, সে অবস্থায় নামায রোযা ইত্যাদি শাখাগত বিধান তার উপর ফরয ছিলো না। তখন তার উপর হুকুম ছিলো যে, আগে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তার উপর নামায তো তখন ফরয হবে, যখন সে মুসলমান হবে। এজন্যে বিগত দিনসমূহের নামায কাযা করা তার জন্যে জরুরী নয়।

পক্ষান্তরে একজন মুসলমান বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তার উপর নামায ফরয হয়ে যায়। তাই সে ঐ নামাযগুলো না পড়ার কারণে সেগুলো তার দায়িত্বে থেকে গেছে। দীর্ঘদিন পর যখন সে নামায না পড়ার গোনাহ থেকে তাওবা করলো, তখন তাওবার মূলনীতি এই যে, যে গোনাহ থেকে সে তাওবা করছে তার ক্ষতিপূরণ যদি সম্ভব হয়, ক্ষতিপূরণ করা ছাড়া সে তাওবা কবুল হবে না। বিধায় ঐ সমস্ত নামায কাযা করা তার জন্য জরুরী। একইভাবে রোযা ছেড়ে থাকলে ঐ সমস্ত রোযা কাযা করতে হবে। কারণ, ঐ রোযাগুলো তার দায়িত্বে রয়ে গেছে।

তাওবা করার দ্বারা নামায মাফ হয় না

তা না হলে এর তো কোন যৌক্তিক কারণ নেই যে, এক ব্যক্তি আশি বছর ধরে অবিরাম নামায পড়ছে। আর অপর এক ব্যক্তি আশি বছর যাবত নামায না পড়ে পরিশেষে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিল যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং মাফ চাচ্ছি। আর এই তাওবার ফলে তার সমস্ত নামায মাফ হয়ে যাবে, এটা তো কোন যৌক্তিক কথা হল না। কতক লোক বলে যে, যদি এক দিনের নামায ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে সেগুলোর কাযা করবে। আর যদি এক দিনের বেশি নামায ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে সেগুলোর কাযা করতে হবে না। শুধু তাওবা করে নিবে। এ এক বিস্ময়কর মাসআলা। নিজেরা বানিয়ে নিয়েছে। এর ফলে মানুষের হাতে বড় চমৎকার উপায় চলে এসেছে যে, যখন নামায ছুটে যায় তখন এক দিনের চেয়ে বাড়িয়ে দাও আর পরে তাওবা কর। এসব ভিত্তিহীন কথা। কারণ, তাওবার মূলনীতি হল, যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব তার ক্ষতিপূরণ ছাড়া তাওবা কবুল হবে না।

মদ পান থেকে তাওবা

যেমন, এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন মদ পান করে আসছে। এখন তাওবার তাওফীক হল। এক্ষেত্রে শুধু তাওবা করাই যথেষ্ট। কারণ এর ক্ষতিপূরণের কোন উপায় নেই। তাই ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করে নিবেন।

চুরি থেকে তাওবা

কিংবা যেমন কোন ব্যক্তি কিছু টাকা চুরি করে তা খেয়ে ফেলল। পরবর্তীতে তাওবার তাওফীক হল। তাহলে যেহেতু এর ক্ষতিপূরণ সম্ভব অর্থাৎ, যার টাকা চুরি করেছে তাকে টাকা ফেরত দিবে বা তার থেকে মাফ চেয়ে নিবে এতদ্ভিন্ন তাওবা কবুল হবে না।

যাকাত না দেওয়া থেকে তাওবা

অথবা যেমন বিগত বছরসমূহে যাকাত প্রদান করেনি। এখন যখন তাওবার তাওফীক হল তখন বিগত বছরসমূহের যাকাত না দেওয়া পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে না। একই অবস্থা নামায এবং রোযার ক্ষেত্রেও। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো আদায় না করবে শুধু তাওবা করার দ্বারা মাফ হবে না।

নামায আদায় করবে এবং অসীয়তও করবে

মোটকথা, বিস্তারিত তাওবা এই যে, মানুষ তার অতীত জীবনের জরিপ চালিয়ে দেখবে যে, আমার দায়িত্বে আল্লাহ তাআলা বা মানুষের কোন ওয়াজিব হক রয়েছে কিনা। আল্লাহর হকের মধ্যে নামাযের ব্যাপারে দেখবে যে, আমার দায়িত্বে কতগুলো নামায বাকী রয়েছে। সেগুলো কাযা করার ফিকির করবে। তার পদ্ধতি এই যে, একটি খাতা বানিয়ে নিবে। তাতে লিখবে যে, আমার দায়িত্বে এতগুলো নামায রয়েছে। নামাযের সঠিক সংখ্যা মনে না থাকলে সতর্কতার সাথে অনুমান করে তার সংখ্যা লিখবে এবং একথাও লিখবে যে, আমি আজ এত তারিখ থেকে ঐ সমস্ত নামায আদায় আরম্ভ করছি এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের সাথে একটি করে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করব। যতগুলো নামায আদায় করব সেগুলো এই খাতায় লিখে রাখব। আমি যদি সবগুলো নামায কাযা করার পূর্বে মরে যাই তাহলে আমি আমার ওয়ারিশদেরকে অসীয়ত করছি যে, আমার সম্পদ থেকে ঐ সমস্ত নামাযের ফিদইয়া আদায় করবে।

অসীয়ত ছাড়া ফিদইয়া আদায় করা ওয়াজিব নয়

যদি কোন ব্যক্তি এভাবে অসীয়ত না করে, সে যদি লক্ষ টাকাও পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে যায় তারপরও উত্তরাধিকারীদের দায়িত্বে তার নামাযসমূহের

ফিদইয়া আদায় করা ওয়াজিব হবে না। উত্তরাধিকারীদের দায়িত্বে নামায রোযার ফিদইয়া আদায় করা তখন ওয়াজিব হয়, যখন মৃত ব্যক্তি অসীয়ত করে যায়। আর এই ওয়াজিবও মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এক তৃতীয়াংশের অধিকের ক্ষেত্রে অসীয়ত কার্যকরী হবে না।

যাকাত ও রোযা আদায় করবে এবং অসীয়ত করবে

একই অবস্থা রোযার ক্ষেত্রেও। এ পর্যন্ত যত রোযা ছুটে গিয়েছে সবগুলো খাতায় লিখবে। ছুটে যাওয়া রোযার সংখ্যা নিশ্চিতভাবে মনে না থাকলে সতর্কতার সাথে অনুমান করে সংখ্যা লিখবে। তারপর সেগুলো আদায় করতে আরম্ভ করবে এবং খাতায় লিখতে থাকবে যে, আমি এতগুলো রোযা আদায় করেছি। ঐ খাতায় এই অসীয়তও লিখে রাখবে যে, এ সময়ের মধ্যে আমার মৃত্যু হলে আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অবশিষ্ট রোযাসমূহের ফিদইয়া আদায় করবে।

একইভাবে যাকাতেরও হিসাব করবে যে, বিগত বছরসমূহে আমার উপর কী পরিমাণ যাকাত ফরয হয়েছে যেগুলো আমি এ পর্যন্ত আদায় করিনি। এরপর তা খাতায় লিখবে এবং সেগুলো পরিশোধ করতে আরম্ভ করবে। পরিশোধকৃত যাকাতের পরিমাণ খাতায় লিখে রাখবে। সাথে এই অসীয়তও লিখে রাখবে যে, এ সময়ের মধ্যে আমার মৃত্যু হলে অবশিষ্ট যাকাত আমার সম্পদ থেকে পরিশোধ করবে। এই হল বিস্তারিত তাওবার বর্ণনা।

মোটকথা, আত্মশুদ্ধির জন্য যখন কোন মানুষ কোন শায়খের নিকট যায় তখন তার দ্বারা এ দুটি কাজ করানো হয়। একটি সংক্ষিপ্ত তাওবা আর একটি বিস্তারিত তাওবা। তাওবার ব্যাপারে হযরত থানভী (রহ.) এখানে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসবগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গোনাহ না করার সংকল্প ব্যর্থ হয়

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে চিঠিতে লিখল যে–

> 'প্রতি সপ্তাহে তাওবা করি, কিন্তু একদিন পর সমস্ত প্রস্তুতি ব্যর্থ হয়ে যায়।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৪)

এটি এমন এক অবস্থা, যা প্রায় সবার জীবনেই দেখা দেয় যে, তাওবা করল এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের বিগত জীবনের সমস্ত গোনাহ থেকে মাফ চেয়ে নিল এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি ও সংকল্পও করল যে, আগামীতে গোনাহ করব না, কিন্তু পরের দিনই সমস্ত প্রস্তুতি ও সংকল্প ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ, যখন

গোনাহ না করার সংকল্প করেছিল, তখন তো পাকাপোক্ত সংকল্পই করেছিল যে, আগামীতে এ গোনাহ আর করবে না। কিন্তু যখন কিছু সময় পার হয়ে যায় এবং পরিবেশ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন পূর্বকৃত সংকল্প ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে মানুষ পুনরায় সেই গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। কম-বেশি সবার সামনেই এ অবস্থা আসে।

তাওবার প্রথম শর্ত : গোনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া

বরং আরেক ধাপ এগিয়ে বলছি যে, প্রথমত মানুষের এ বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায় যে, আমার তাওবা সত্যিকারের তাওবা হল কিনা। কারণ, তাওবার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যখন এই তিনটি শর্ত পাওয়া যায়, তখন খাঁটি তাওবা হয়। প্রথম শর্ত এই যে, অতীতের সমস্ত গোনাহের জন্য অন্তরে অনুতাপ-অনুশোচনা থাকতে হবে এবং লজ্জিত হতে হবে এবং ভুল স্বীকার করতে হবে। যদি ভুল স্বীকার না করে এবং গোনাহের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা না জাগে বরং গোনাহ করেও বুক ফুলিয়ে চলে তাহলে তার তাওবা হল কোথায়। এজন্য গোনাহকে গোনাহ না মনে করা একটি মারাত্মক আশঙ্কাজনক বিষয়। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে এ থেকে হেফাযত করুন। আমীন। এজন্য তাওবার প্রথম শর্ত হল অনুতপ্ত হয়ে বলা যে, হে আল্লাহ! আমার দ্বারা চরম ভুল হয়েছে। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আপনি আমাকে মাফ করে দিন।

তাওবার দ্বিতীয় শর্ত : গোনাহ ছেড়ে দেওয়া

তাওবার দ্বিতীয় শর্ত– যা ছাড়া তাওবা পূর্ণ হয় না– তা এই যে, অবিলম্বে ঐ গোনাহ ছেড়ে দিবে। এছাড়া তাওবা হতে পারে না। এটা তো হতে পারে না যে, মানুষ এক দিকে তাওবা করবে আর অপর দিকে ঐ গোনাহ করতে থাকবে। এটা তো কোন তাওবা হলো না।

তাওবার তৃতীয় শর্ত : গোনাহ না করার সংকল্প করা

তৃতীয় শর্ত এই যে, আগামীর জন্য অন্তরে এই সংকল্প করবে যে, আমি ভবিষ্যতে এ গোনাহ করব না এবং এর কাছেও যাব না। যাইহোক, তাওবার এই তিনটি শর্ত রয়েছে। যেগুলো ছাড়া তাওবা পরিপূর্ণ হয় না।

সংকল্প না হওয়ার সংশয়

প্রথম শর্ত অর্থাৎ, গোনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া, বেশির ভাগ ঈমানদারেরই এটা লাভ হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ, গোনাহ ছেড়ে দেওয়া, এর উপরেও সাধারণত আমল হয়ে থাকে। তবে তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ, এ

সংকল্প করা যে আগামীতে কখনো এ গোনাহের কাছে যাবে না। এ শর্তটি পুরা হওয়ার ব্যাপারে বেশির ভাগ সময় সংশয় থাকে যে, জানিনা সংকল্প পাকাপোক্ত হল কিনা। কারণ, তাওবা করার সময় অন্তরে এ আশঙ্কা লেগে থাকে যে, তাওবা তো করছি কিন্তু আমি কতটুকু এ তাওবার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবো এবং কতটুকু এই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো, এ ব্যাপারে মনে সন্দেহ থাকে। তখন মনে খটকা হয় যে, এমন সন্দেহ নিয়ে সংকল্প পুরা হল কি হল না। যখন সংকল্প পুরা হওয়ার মধ্যে সন্দেহ থাকল, তখন তাওবা পুরা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকল। কারণ, সংকল্প ছাড়া তাওবা কবুল হয় না।

আশঙ্কা থাকা তাওবার পরিপন্থী নয়

ভাল করে বুঝুন, তাওবা পাকা ও খাঁটি হওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে সংকল্প জরুরী। কিন্তু সাথে সাথে অন্তরে যদি এই আশঙ্কা লেগে থাকে যে, আমি সংকল্প তো করছি, কিন্তু জানিনা এ সংকল্পের উপর টিকে থাকতে পারবো কিনা। নিজের মনের উপর ভরসা নেই। তাহলে এ আশঙ্কা লেগে থাকা তাওবা পরিপূর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। যখন পাকাপোক্ত সংকল্প করল, তখন এ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তার সংকল্প পাকাপোক্তই হল। এ কারণে তাওবার মধ্যে কোন ত্রুটি হবে না, ইনশাআল্লাহ।

আশঙ্কার একটি দৃষ্টান্ত

এর দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, যেমন আপনি একটি ভবন নির্মাণ করলেন এবং আপনি আপনার সাধ্যমত তাকে পোক্ত বানালেন। খুঁটি পোক্ত বানালেন। ভীম পোক্ত বানালেন। লোহা এবং সিমেন্ট যথাযথ পরিমাণ ব্যবহার করলেন, কিন্তু সাথে সাথে এ আশঙ্কাও থাকল যে, যদি কোন দিন ভূমিকম্প হয় তাহলে তা ভেঙ্গে পড়বে বা কোন সময় যদি এর উপর বোমা পড়ে তাহলে এই ভবন বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এখন ভূমিকম্পের আশঙ্কাও রয়েছে। বোমা পতিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটারও আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত আশঙ্কার কারণে একথা বলা হবে না যে, এ ভবন পাকাপোক্ত হয়নি। বরং ভবন তো পাকাপোক্ত হয়েছে তবে যথাস্থনে আশঙ্কাও রয়েছে। এ সমস্ত আশঙ্কার প্রতিকারের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এ কারণে ভবনকে দুর্বল বলা হবে না।

ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প করা তাওবার জন্য যথেষ্ট

একথা আমি নিজে থেকে বলছি না এবং এমন কথা বলার সাহসও আমার নেই। একথা আমি আমার এক মুরুব্বী হযরত বাবা নাজম আহসান সাহেব

(রহ.) থেকে শুনেছি। যিনি হযরত থানভী (রহ.)-এর 'মুজাযে সোহবাত' (খলীফা) ছিলেন। তিনি কাশফ-কারামতের অধিকারী বিস্ময়কর এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি আলোচনায় একথা খুব জোর দিয়ে বলতেন যে, মানুষ মনে করে যে, দ্বীনের উপর চলা খুব কঠিন। আরে মিয়াঁ! প্রতিদিন তাওবা করো।

একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি বলেন যে, তাওবা করো। আমাদের তো এ বিষয়েই সন্দেহ হয় যে, পাকা তাওবা হলো কি হলো না। কারণ, এ কথাই বুঝতে পারি না যে, আগামীতে গোনাহ্ না করার সংকল্প পাকা হলো কিনা? তখন তিনি একথা বলেন যে, নিজের পক্ষ থেকে গোনাহ্ না করার সংকল্প করো। তারপর যদি গোনাহ হয়ে যাওয়ার ভয় ও আশঙ্কা থাকে তা তাওবার পরিপন্থী নয়। পরবর্তীতে হযরত থানভী (রহ.)-এর মাওয়ায়েয ও মালফুযের মধ্যে কয়েক জায়গায় এ বিষয়ের আলোচনা চোখে পড়েছে। হযরত থানভী (রহ.) পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ আশঙ্কা তাওবার পরিপন্থী নয়। তাই একবার যখন নিজের তরফ থেকে পাকাপোক্ত সংকল্প করবে যে, ইনশাআল্লাহ এ কাজ আর করবো না, তাহলেই তাওবা হয়ে যাবে।

তাওবার ফলে আমলনামা থেকে গোনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হয়

তাওবা কবুল হওয়ার অর্থ এই যে, যখন তুমি তাওবা করলে, তখন পর্যন্ত তোমার যত গোনাহ ছিলো, আল্লাহ তাআলা সমস্ত গোনাহ মেহেরবানী করে মিটিয়ে দিলেন। আল্লাহর দয়া দেখুন, তাওবা কবুল করার অর্থ শুধু এই নয় যে, ঐ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিলেন। অর্থাৎ, গোনাহ আমলনামায় ঠিকই লিখিত থাকবে তবে সে জন্যে তোমাকে শাস্তি দিবেন না। বরং তাওবা কবুল করার অর্থ এই যে, ঐ গোনাহ তোমার আমলনামা থেকেও মিটিয়ে দিবেন। এখন আর ঐ গোনাহ তোমার আমলনামাতেও লিখিত থাকবে না, যাতে কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত গোনাহ দেখে তুমি লজ্জিতও না হও যে, আমি এ সমস্ত গোনাহ করেছিলাম।

বর্তমান যুগের প্রচলিত হিসাব পদ্ধতিতে তিনটি ঘর থাকে। একটি আয়ের, একটি ব্যয়ের এবং একটি সঞ্চয়ের। এ কারণে যত টাকা কাউকে দিয়েছে তাও হিসাবের খাতায় লেখা থাকে এবং যত টাকা অন্যের থেকে নিয়েছে তাও হিসাবের খাতায় লেখা থাকে। কিন্তু আল্লাহর হিসাবের পদ্ধতি এই যে, সেখানে গোনাহের আয়ের ঘর নেই। অর্থাৎ, যখন তুমি তাওবা করলে এবং আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে মাফ চেয়ে নিলে, তখন তোমার গোনাহের খাতায় আর কিছু লেখা থাকবে না, বরং যা লেখা থাকবে তা ব্যয়ের ঘরে লেখা থাকবে এবং ইনশাআল্লাহ এর বিনিময়ে তুমি সওয়াব পাবে।

সূচিপত্র

'আল্লাহ্-দোষ গোপনকারী' তিনি দোষ গোপন করবেন

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা এক বান্দাকে ডাকবেন। তারপর চুপিসারে তাকে বলবেন– বলো, তুমি কি দুনিয়ায় থাকতে এই গোনাহ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ করেছিলাম। অমুক গোনাহ করেছিলে? সে বলবে, করেছিলাম। অমুক গোনাহ করেছিলে? জ্বী, করেছিলাম। গোনাহসমূহ তুলে ধরে তার থেকে স্বীকৃতি গ্রহণের পর ঐ বান্দাকে বলবেন– আমি দুনিয়াতে তোমার গোনাহ গোপন করেছিলাম, তোমার দোষ ঢেকে রেখেছিলাম, দুনিয়াতে কেউ এসব গোনাহ সম্পর্কে জানতে পারেনি। এ সমস্ত গোনাহ সম্পর্কে এক আমি জানি, আর এক তুমি জানো। আজ আমি তোমার ঐ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আখেরাতেও ঐ সমস্ত গোনাহ কাউকে দেখাবেন না। আল্লাহ তাআলা এভাবে দোষ গোপন করবেন। মোটকথা, একবার পাকাপোক্ত তাওবা করলে ইনশাআল্লাহ ঐ গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং আমলনামা থেকে তা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

আল্লাহ্ তাআলার কাছেই তাওবার উপর অবিচলতা কামনা করো

এরপরও যদি এ গোনাহ পুনরায় হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে তা হোক। তুমি এ বিষয়েও আল্লাহ তাআলাকেই বলো, হে আল্লাহ! আমি তাওবাতো করেছি, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাওফীক না দিবেন হে আল্লাহ! আমি তাওবার উপর টিকে থাকতে পারবো না। তাই আপনি দয়া করে আমাকে এর উপর অবিচলতা দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনার ক্ষমতাধীন

একটি দু'আয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ بِنَا فَكُنْ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ

'হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর, আমাদের কপাল এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই আপনার কুদরতের অধীন। এগুলোর কোনটিরই মালিক আপনি আমাদেরকে বানাননি। না আমরা আমাদের অন্তরের মালিক, না জিহ্বার মালিক, না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক। যখন এ সমস্ত অঙ্গ আপনারই ক্ষমতাভুক্ত, তাই হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের কর্মবিধায়ক হয়ে যান এবং আমাদেরকে সঠিক পথের হেদায়েত দান করুন।'

হে আল্লাহ! ঐ জিনিস আমাদেরকে দান করুন, যা আপনাকে খুশি করবে

আল্লাহ তাআলার কাছে একথাও বলো যে, হে আল্লাহ! আমি তাওবা তো করেছি কিন্তু এই মন, এই মগজ, এই জিহ্বা, এই হাত, এই পাও এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনার ক্ষমতাভুক্ত, তাই হে আল্লাহ! আপনিই এগুলোকে দৃঢ় রাখুন। কারণ, এগুলো আমাদের ক্ষমতাভুক্ত নয়। সাথে এ দু'আ করবে যে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَاَلْتَنَا مِنْ اَنْفُسِنَا مَالَا نَمْلِكُهُ اِلَّا بِكَ فَاَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের থেকে এমন সব জিনিস চেয়েছেন, যেগুলো পুরা করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অতক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাওফীক না দিবেন। তাই হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐসব জিনিস দান করুন, যেগুলো আপনাকে আমাদের উপর খুশি করবে।'

তাই তোমার তাওবা তুমি পাকা করো এবং এ ব্যাপারে যে আশঙ্কা লেগে আছে তা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করো এবং বলো– হে আল্লাহ! আপনিই এই তাওবায় আমাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

পরিপক্ক হওয়ার জন্য দীর্ঘ সফর প্রয়োজন

সে লোকটি হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে দ্বিতীয় যে সমস্যাটি তুলে ধরেছে তা এই যে, প্রতি সপ্তাহে তাওবা করি। কিন্তু একদিন পরেই সমস্ত প্রস্তুতি মাঠে মারা যায়। একদিন তাওবা করি দ্বিতীয় দিন আবারও গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাই। এ সমস্যাটি আমাদের সবারই খুব বেশি দেখা দেয়। হযরত থানভী (রহ.) ঐ ব্যক্তির চিঠির উত্তরে প্রথমে তিনটি ফারসী কবিতা লিখেছেন। তার প্রথমটি হল–

صوفی نہ شود صافی تا درنہ کشد جامی

بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی

এ কবিতাটি হযরত মাওলানা জামী (রহ.)-এর। যার অর্থ হল–

'কোন আল্লাহওয়ালা দরবেশ ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের দরবেশ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পানির সঙ্গে গাদও পান না করে।'

যখন দরবেশ পানির সঙ্গে গাদ পান করা সহ্য করবে, তখন আল্লাহ তাআলাও তাকে পরিষ্কার করে দিবেন। মানুষের মধ্যে যেই ত্রুটি ও অপক্কতা রয়েছে তা দূর হতে এবং পরিপক্ক মানুষে পরিণত হতে একদিন একরাত যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য দীর্ঘ সফর প্রয়োজন।

আমৃত্যু চেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হবে না

দ্বিতীয় কবিতাটি এখানে হযরত থানভী (রহ.) হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কবিতাটি এই–

اندریں رہ می تراش وی خراش
تادم آخر دمے فارغ مباش

অর্থ: 'এ পথে সর্বদাই ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হয় মৃত্যু পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যাবে না।'

অর্থাৎ, একথা মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যাবে না যে, এখন আমার আত্মশুদ্ধি লাভ হয়েছে। কারণ, তোমার সর্বক্ষণের সঙ্গী এই নফস, যে কোনো সময় তোমাকে দংশন করতে পারে। তাই এক মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যাবে না। যেমন, আপনি একটি ফুলের বাগান করেছেন। ঐ ফুলের বাগানকে সুন্দর ও পরিপাটি রাখার জন্য সব সময় কাটা-ছাটা করতে হবে। কখনও একটি পাতা, কখনও ডাল এবং কখনও বা ফুল কাটতে হবে। যদি পরিচর্যা না করে এমনিতে এ বাগান ফেলে রাখা হয় তাহলে তা ঝোপ-জঙ্গলে পরিণত হবে। এমনিভাবে মানুষকেও নিজের নফসের কাটা-ছাটা ও পরিচর্যা করতে হয়। সর্বদা তার প্রতি কড়া নজর রাখতে হয়। ক্ষণিকের জন্যও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা উচিত নয়।

অবশেষে দয়া বর্ষিত হয়

তৃতীয় কবিতাটি তিনি এই লিখেছেন–

تادم آخر دمے آخر بود
کہ عنایت با تو صاحب سر بود

অর্থ : 'আল্লাহ তাআলা যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার তাওফীক দান করেন, তাহলে অবশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবশ্যই দয়া অবতীর্ণ হয়ে থাকে।'

তাওবা ভেঙ্গে গেলে পুনরায় সংকল্প করো

উপরোক্ত তিনটি কবিতা লেখার পর হযরত থানভী (রহ.) লিখেন যে–

"সারকথা এই যে, চিন্তা ও চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। ইনশাআল্লাহ তাআলা এভাবেই সফলতা লাভ হবে।"

(প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, এই রহস্য ধরে রাখো যে, বারবার যে তাওবা ভাঙছে, এতে নিরাশ হয়ে বসে থাকা যাবে না। বরং এভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে যে, যখনই তাওবা ভাঙবে, তখনই পুনর্বার দৃঢ় সংকল্প করবে। আবারও তাওবা ভাঙবে আবারও দৃঢ় সংকল্প করবে। এই চিন্তা ও চেষ্টা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। নিরাশ হয়ে বসে থাকা যাবে না যে, আমার তাওবা বারবার ভেঙ্গে যাচ্ছে তাই তাওবাই ত্যাগ করে বসল। এভাবে নিরাশ হওয়া ঠিক নয়, বরং পূর্বাধিক দৃঢ় সংকল্প করো।

মানুষের ইচ্ছা একটি বিরাট শক্তি

আল্লাহ তাআলা মানুষের ইচ্ছার মধ্যে বিরাট শক্তি রেখেছেন। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির বলে বড় বড় পাহাড়কে পদানত করেছে। ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে চাঁদে গেছে। মঙ্গল গ্রহে পৌঁছেছে। পারমাণবিক বোমা বানিয়েছে। হাইড্রোজেন বোমা বানিয়েছে। সংকল্পের এই শক্তিকে ব্যবহার করেই মানুষ এসব করেছে। ইচ্ছা ও সংকল্পের এই শক্তিকে শয়তানের মোকাবেলায় ব্যবহার করো। গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য একে ব্যবহার করো। একবার পড়ে গেলে পুনরায় অধিক উদ্যম নিয়ে উঠে দাঁড়াও। নিজের সংকল্পকে অধিক শক্তিশালী করো যে, পূর্বাধিক শক্তির সাথে আমি এই গোনাহের মোকাবেলা করবো।

অস্ত্র সমর্পণ করলে পরাজয় বরণ করবে

প্রথম দিকে টানাপোড়েন হয়ে থাকে। মানুষ যখন কুরআন-হাদীস শোনে বা আল্লাহওয়ালাদের কথাবার্তা শোনে তখন অন্তরে চিন্তা জাগে যে, গোনাহ ছেড়ে দেয়া উচিত। সঠিক পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু গোনাহে অভ্যস্ত নফস তাকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চায়। তখন নেক কাজের চাহিদা ও পাপ কাজের

চাহিদার মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। কিন্তু নফস যেহেতু সবল এবং তার মধ্যে গোনাহের তীব্র শক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে নেক কাজের চাহিদা এখনও অত শক্তিশালী হয়নি। ফলে যখন উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, তখন নফস নেক কাজের চাহিদাকে ধরাশায়ী করে। এমতাবস্থায় নেক কাজের চাহিদা যদি নফসের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে আর চিন্তা করে যে, নফস আমাকে ধরাশায়ী করেছে। এখন তার সঙ্গে মোকাবেলা করা বৃথা, তাহলে নেক কাজের এই চাহিদা মারা গেল।

সব সময় ধরাশায়ী হতে থাকবে

কিন্তু নেক কাজের চাহিদাকে যদি একথা বুঝানো যায় যে, তুমি যতবার মার খাবে ততবার তোমার মধ্যে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় হবে। তখন নেক কাজের চাহিদা নতুন শক্তি নিয়ে, নতুন সংকল্প নিয়ে এবং নতুন উদ্যোম নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। এবার যখন পুনয়ার নফসের সঙ্গে তার মোকাবেলা হবে, তখন নেক কাজের চাহিদা কিছু সময় তার মোকাবেলায় অবিচল থাকবে। প্রথম প্যাঁচেই সে ধরাশায়ী হবে না। বরং প্রথমবারের তুলনায় ভাল মোকাবেলা হবে। তবে আবারও সে ধরাশায়ী হবে। পুনর্বার ধরাশায়ী হওয়ার ফলে আবারও তার মধ্যে অধিক শক্তি ও বলের সঞ্চার হবে। এবার তৃতীয়বার যখন লড়াই হবে তখন সে অবিচল থেকে নফসের সঙ্গে মোকাবেলা করবে। তারপর ধীরে ধীরে নেক কাজের চাহিদাও এক সময় নফসকে ধরাশায়ী করবে। সারা জীবন এ অবস্থা চলতে থাকবে। কখনও এ ধরাশায়ী করবে, আর কখনও সে ধরাশায়ী করবে। কখনও এ বিজয়ী হবে, আর কখনও সে বিজয়ী হবে। যখন বারবার লড়াই হতে থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে এমন শক্তি দান করবেন যে, নেক কাজের চাহিদা সর্বদাই নফসকে ধরাশায়ী করতে থাকবে। আর নফস সর্বদাই ধরাশায়ী হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ তাআলা।

আমৃত্যু নফসের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে

কিন্তু সাধারণ নিয়ম হল, কোন বড় থেকে বড় পালোয়ানও গাফেল হয়ে বসে থাকে না। সে মনে করে না যে, আমি যখন অনেক বড় পালোয়ান হয়েছি তাই এখন আর আমাকে শরীরচর্চা করতে হবে না এবং কুস্তির কলা-কৌশলের অনুশীলন করার দরকার হবে না। বরং তাকেও প্রতিদিন কসরত করতে হবে। প্রতিদিন বাদাম খেতে হবে। প্রতিদিন খাদ্য তালিকা পুরো করতে হবে। যদি সে এগুলো ছেড়ে দেয় তাহলে দুর্বল হয়ে যাবে। তখন কারো সঙ্গে লড়ার শক্তি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। তাই শক্তি অর্জন করে পালোয়ান হয়ে গেলে এবং

সূচিপত্র

নফস শয়তানকে ধরাশায়ী করলেও সব সময় তার সাধনা করার প্রয়োজন রয়েছে। যেন তার অর্জিত শক্তি যথাপূর্ব ঠিক থাকে। এজন্যই বলেছেন–

تادم آخر دمے فارغ مباش

'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষণিকের জন্যও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার অবকাশ নেই।'

মদিরাপাত্র তাওবাভঙ্গকারী, তাওবা আমার মদিরাপাত্র চূর্ণকারী

যাইহোক! তাওবা ভাঙ্গার বিষয়টি সব মানুষেরই ঘটে থাকে। তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাওবা ভেঙ্গে গেলে পুনরায় তাওবা করো এবং أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاتُوْبُ اِلَيْهِ পড়ো। একজন কবির বড় মজার একটি কবিতা রয়েছে–

جام ے توبہ شکن توبہ میری جام شکن
سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیانوں کے

অর্থ: 'যখন মদিরাপাত্র সামনে আসে, তখন তাওবা ভেঙ্গে যায়, আর যখন তাওবা আসে তখন মদিরাপাত্রকে ভেঙ্গে ফেলে। ফলে আমার সামনে ভাঙ্গা পাত্রের স্তুপ পড়ে আছে।'

কবিতায় ব্যবহৃত 'পায়মানু' শব্দটি কবি এখানে দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন। এক হল, অঙ্গীকারের অর্থে। কারণ, অঙ্গীকারকেও পায়মান বলা হয়। দ্বিতীয় গ্লাসের অর্থে। কারণ, মদের গ্লাসকে পায়মানা বলা হয়। তাই তিনি বলছেন যে, আমার সামনে ভাঙ্গা 'পায়মানের' স্তুপ রয়েছে। অর্থাৎ, একদিকে অঙ্গীকার ভাঙছে, আর অপরদিকে পানপাত্র ভাঙছে। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ তাআলা 'অঙ্গীকারের' মধ্যে এত শক্তি দান করেন যে, তারপর শুধু 'পানপাত্রই' ভাঙতে থাকে। 'অঙ্গীকার' ভাঙে না। কিন্তু মানুষ যদি শুরুতেই ভয় পেয়ে যায় যে, আমার তাওবা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং পরাভূত হয়ে বসে থাকে, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, নফস ও শয়তান বিজয় লাভ করল। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে হেফাযত করুন। আমীন।

তুমি যত বড় পাপীই হও ফিরে আসো

যতবারই তাওবা ভাঙ্গুক না কেন তার প্রতিকার এই যে, অনতিবিলম্বে পুনরায় তাজা সংকল্প করবে। আবারও তাওবার দিকে অগ্রসর হবে। আল্লাহর দরবার তো এমন যেমন এক কবি বলেন–

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ - گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

ایں درگہ ما درگہ نومیدی نیست - صد بار گر توبہ شکستی باز آ

অর্থাৎ, অন্য সব জায়গার নিয়ম তো হল, তুমি একবার অপরাধ করবে, দুবার করবে, তিনবার করবে, তোমাকে মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু প্রতিদিনই অপরাধ করতে থাকবে তাহলে তোমাকে কান ধরে বের করে দেয়া হবে এবং বলা হবে যে, এখানে আর আসবে না। কিন্তু আল্লাহর দরবার এমন যে, তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন যে, যদি শতবারও তাওবা ভেঙ্গে থাক তাহলে আবার আমার কাছে ফিরে আস। আবারও আমি তোমার তাওবা কবুল করবো। মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত, জাঁকানদানীর শেষ অবস্থার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরং চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। ইনশাআল্লাহ এভাবেই সফলতা আসবে। সাহস হারিয়ো না। নিরাশ হয়ে বসে যেও না। চেষ্টা ছেড়ে দিও না। আল্লাহ তাআলা একদিন না একদিন সফলতা দান করবেন।

আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলো

আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, 'মিয়াঁ! আল্লাহ তাআলার সাথে এভাবে কথা বলো– হে আল্লাহ! গোনাহের এই প্লাবন থেকে আমি বাঁচতে পারবো না আমার এ সামর্থ্য নেই। আমি আপনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি। আপনিই আমাকে রক্ষা করুন। অন্যথায় আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না, সবকিছুই আপনার ক্ষমতাধীন। আমি আমাকে আপনার হাতে অর্পন করছি। আল্লাহর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে থাকো। আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল তিনি এমন দু'আ ফিরিয়ে দেন না।

হযরত ইউনুস (আ.) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো

আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা এক অপূর্ব কথা বলেছেন। তা হলো– হযরত ইউনুস (আ.) তিন দিন মাছের পেটে ছিলেন। মাঝখানে আমার ওয়ালিদ সাহেবের একটি কথা বলছি। তিনি বলতেন যে, "জ্ঞানীজনের নিকট বিশ্বজগতের কোন সংবাদই কেবলমাত্র সংবাদ নয়। বরং

প্রত্যেকটি সংবাদের মধ্যেই কোন আদেশ বা নিষেধ নিহিত থাকে। এটি করো, আর এটি করো না। প্রত্যেক সংবাদ থেকেই কোন না কোন শিক্ষা লাভ হয়। তাই কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যত ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে কোন না কোন শিক্ষা রয়েছে।

যাই হোক, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে তিন দিন ছিলেন। সেখানে কেবলই অন্ধকার ছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি নিজের রবকে ডাকলেন এবং বললেন–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

এরপর আল্লাহ তাআলা বড় মজার কথা বলেছেন। তাহলো–

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ (الانبياء : ٨٨)

‘যখন তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে তাঁর এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম এবং এমনিভাবে আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দেই বা মুক্তি দেব।’

প্রত্যেক ঈমানদার কী প্রথমে মাছের পেটে যাবে?

এখন প্রশ্ন হলো, ‘এমনিভাবে আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দেবো’ এই শেষ কথাটির উদ্দেশ্য কী? প্রত্যেক ঈমানদার কি প্রথমে মাছের পেটে যাবে এবং সেখানে গিয়ে لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ কালিমা পড়বে, তখন আমি তাকেও মাছের পেট থেকে মুক্তি দেবো? বলাবাহুল্য যে, একথার উদ্দেশ্য এটা নয়। বরং এ কথার উদ্দেশ্য হলো– তোমরা যে কোন সময় যে কোন ধরনের অন্ধকার বেষ্টিত হবে, গোনাহের অন্ধকার, পরিবেশের অন্ধকার বা অনিষ্টের অন্ধকার বেষ্টিত হবে, তখন আমাকে ডাকো আর বলো لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ এভাবে যখন তোমরা আমাকে ডাকবে, তখন হযরত ইউনুস (আ.)কে যেভাবে আমি মুক্তি দিয়েছিলাম সেভাবে তোমাদেরকেও মুক্তি দেবো।

সেই মহান সত্ত্বাকে ডাকো

তাই আমরা যারা নফস এবং গোনাহের অন্ধকারে বেষ্টিত রয়েছি, তাদের জন্য সমাধান হলো– ঐ মহান সত্ত্বাকেই ডাকো, যিনি এই নফসকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলোরও স্রষ্টা এবং অন্ধকারেরও স্রষ্টা। যিনি কল্যাণেরও স্রষ্টা

এবং অকল্যাণেরও স্রষ্টা। তাঁকেই ডাকো এবং বলো যে, আপনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আপনিই এগুলোকে আমাদের থেকে দূর করে দিন। তোমরা এভাবে ডাকতে থাকলে আল্লাহ তাআলা মুক্তি দান করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তর বার ইস্তিগফার করতেন

সারকথা হলো, তাওবা এমন জিনিস নয় যে, কোন সময় তা ভেঙ্গে গেলে মানুষ নিরাশ হয়ে বসে পড়বে। না, বরং সারা জীবন এ কাজ করতে হবে। আরে আমরা আর তোমরা কী! খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, 'আমি আমার পরওয়ারদেগারের কাছে প্রতিদিন সত্তর বার মাফ চাই।' অথচ তিনি নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। আর কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলেও আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তা সব মাফ। এতদসত্ত্বেও তিনি বলেন যে, আমি সত্তর বার ইস্তিগফার করি।

পূর্বের স্তর থেকে ইস্তিগফার করতেন

বড়রা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য ইস্তিগফার করতেন যে, প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতিক্ষণে তাঁর মর্যাদার উন্নতি হত। যখন তিনি উপরের স্তরে পৌঁছতেন, তখন পিছনের স্তর তাঁর দৃষ্টিতে গোনাহ রূপে দেখা দিত। তাই এজন্য তিনি ইস্তিগফার করতেন। অতএব আমাদের তো সদা-সর্বদাই ইস্তিগফার করা উচিত। যখনই ভুল হবে আবার ফিরে আসো। আবার ভুল হবে তো আবার মাফ চাও। এই একই কাজ করতে থাকো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিজয় দান করবেন। ইনশাআল্লাহ, নফস ও শয়তান তোমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। তবে শর্ত হলো, তাদের সামনে তোমাকে অবিচল থাকতে হবে।

শয়তানের কৌশল দুর্বল

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

অর্থ: 'শয়তানের কৌশল বড় দুর্বল।'

বাহ্যত সে খুব হুট-হাট করে এবং তাকে খুব শক্তিশালী মনে হয়, কিন্তু যখনই কোন মানুষ তার সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় তখনই সে বেলুনের মত চুপসে যায়। তার সামনে বুক টান করে দাঁড়ানোই কেবল শর্ত। কতক লোক খুব

লাফালাফি করে, হৈ-চৈ করে, বড় বড় দাবি করে। কিন্তু তাদের মধ্যে আসলে কিছু থাকে না। যখনই অন্য কোন মানুষ তার বিপক্ষে বুক টান করে দাঁড়ায়, তখনই তারা সেখানেই বসে পড়ে। রুশ-প্রধান খুব অহংকার দেখাত। আমি এই করবো, সেই করবো। সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবো। প্রতিদিন তার এক নতুন বিবৃতি আসত। মানুষ পেরেশান ছিল যে, জানিনা সে কেমনতর জিনিস! কিন্তু যখন মুখোমুখি বসল, তখন বাতাসের মত মিশে গেল। আল্লাহ তাআলা নফস এবং শয়তানকে এমনই বানিয়েছেন। তাদের সঙ্গে লড়া বড় কঠিন মনে হয়। তাদেরকে অনেক শক্তিশালী মনে হয়। কিন্তু মানুষ তাদের সামনে একটু বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে তারা বাতাসের মত মিশে যায়। তাই তাদেরকে ভয় করা উচিত নয়। যতবার ভুল হবে, গোনাহ হবে, ততবার ফিরে আসো।

তাওবার অর্থ ফিরে আসা

তাওবা শব্দের অর্থ কী? তাওবার শাব্দিক অর্থ হল, ফিরে আসা। অর্থাৎ, গোনাহ করার ফলে তুমি পথচ্যুত হয়েছিল, এখন পথে ফিরে আসো। আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তোমরা যখন ফিরে আসবে, তখন আমিও ফিরে আসবো। অর্থাৎ, যখন তোমরা তাওবা করবে, তখন আমি গোনাহ মাফ করবো। তাই যখনই পথ থেকে নেমে যাবে, তখনই আবার পথে ফিরে আসো। আবার নেমে গেলে পুনরায় ফিরে আসো। এমন যেন না হয় যে, পথ থেকে নেমে গেছো তো নেমেই গেছো। এখন আর ফিরে আসার দরকার নাই। এমনটি করো না। বরং আবারো ফিরে আসো। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে তাওবা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

সাতাত্তরতম মজলিস

ইস্তিগফারের জন্যে সময় নির্ধারণ করুন

ইস্তিগফারের জন্য সময় নির্ধারণ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

ইস্তিগফারের সংখ্যা ও সময় নির্ধারণ করা

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-এর নিকট চিঠি লিখলো যে–

> 'ইস্তিগফার করতে বেশি সময়ও ব্যয় হয় না এবং কাজও অতি সহজ। এপরও শুধুই ভুলে যাই।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৪)

অর্থাৎ, ইস্তিগফার এত সহজ বিষয় যে, এতে লম্বা-চওড়া কোন সময় ব্যয় হয় না। এক মুহূর্তে মানুষ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ বলতে পারে। এত সহজ হওয়া সত্ত্বেও আমি এই ইস্তিগফার করতে ভুলে যাই। হযরত থানভী (রহ.) তার উত্তরে লেখেন যে–

> 'এমতাবস্থায় নির্দিষ্ট কোনো সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিমাণ ঠিক করে নিন। যেন সব সময় মনে না থাকলে অস্থিরতা না হয়।'
>
> (প্রাগুক্ত)

এমনিতে ইস্তিগফারের জন্য সময়ও নির্ধারিত নাই এবং সংখ্যাও নির্ধারিত নাই। আল্লাহ তাওফীক দিলে নিজের সমস্ত ভুলের জন্যই ইস্তিগফার করা উচিত। তবে যখন মানুষ ইস্তিগফার করতে ভুলে যায়, তখন তার উচিত বিশেষ কোনো সময় নির্ধারণ করা এবং তার সংখ্যাও নির্ধারণ করা, অমুক সময় এতবার ইস্তিগফার করবো। উদাহরণ স্বরূপ একশ' বার ইস্তিগফার করবো।

ইস্তিগফারের সময় গোনাহের কথা স্মরণ করা উচিত

আল্লাহওয়ালাগণ যখন তাদের মুরীদদেরকে বিভিন্ন আমল দেন, তার মধ্যে একশ'বার ইস্তিগফার অবশ্যই দিয়ে থাকেন। ইস্তিগফারটি এই–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

বা

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَلِىَّ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

এই ইস্তিগফারটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যায় পাঠ করলে উপকার হয়। তবে ইস্তিগফার শুধু মুখে উচ্চারণ করবে না, বরং ইস্তিগফার করার সময় একথার প্রতিও ধ্যান রাখবে যে, আমার দ্বারা নাজানি কত গোনাহ হয়েছে। নাজানি কত ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। অনেক গোনাহের কথা তো আমার জানা আছে। আর অনেক গোনাহের কথা জানাও নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সমস্ত গোনাহ থেকেই মাফ চাচ্ছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্দর দু'আ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দু'আ শিখিয়েছেন। হজ্জ বা উমরার সময় সাফা-মারওয়ার 'সাঈ' করার সময় সবুজ দুই খুঁটির মাঝে যখন তিনি দৌড়াতেন, তখন এই দু'আটি পড়তেন বলে প্রমাণিত রয়েছে। দু'আটি এই–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

'হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। দয়া করুন। ক্ষমা করুন। আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমার ঐ সমস্ত গোনাহ মাফ করুন যেগুলো আপনি জানেন। কারণ, আপনি সেগুলো জানেন যা আমি জানিনা। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বাধিক সম্মানিত এবং মহানুভব।'

এই দু'আয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে, যে সমস্ত গোনাহ আমার জানা আছে, সেগুলো মাফ করুন। বরং বলেছেন যে, যে সমস্ত গোনাহ সম্পর্কে আপনি জানেন, আমি সেগুলো মাফ চাচ্ছি। আপনি দয়া করে সেগুলো মাফ করে দিন। সাথে তিনি একথাও বলেছেন, আপনি ঐ সব জানেন, যেগুলো আমি জানিনা। না জানি এমন কত গোনাহ রয়েছে, যেগুলো গোনাহ হওয়ার অনুভূতিও আমাদের নেই। যার ফলে আমলনামায় গোনাহ বেড়ে চলছে অথচ আমার খবরও নেই। এজন্য প্রতিদিন একশ'বার ইস্তিগফার পড়বে। তাহলে ইনশাআল্লাহ তার বরকতে আল্লাহ গোনাহসমূহ থেকে মুক্তি দান করবেন। আর যদি গোনাহ হয়েও যায়, তাহলে ইস্তিগফারের বরকতে মাফ করে দিবেন।

আগে ইস্তিগফার পরে যিকির

ইস্তিগফার বিষয়ে মাশায়েখের বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতি রয়েছে। কতক মাশায়েখ বলেন যে, যখন মানুষ প্রতিদিনের আমল-অযীফা পুরা করতে বসবে তখন প্রথমে ইস্তিগফার করবে। তারপর অন্যান্য তাসবীহ পাঠ করবে। ইস্তিগফার দ্বারা এজন্য শুরু করবে যে, আগে পাক-সাফ হয়ে নিবে তারপর অগ্রসর হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও অন্যান্য যিকির এসবগুলো হলো, নূর। এ সমস্ত নূর লাভ করার পূর্বে নিজেকে তার উপযুক্ত বানাবে। এ কারণে প্রথমে ইস্তিগফার করবে তারপর অন্যান্য যিকির করবে।

প্রথমে যিকির করবে তারপর ইস্তিগফার করবে

পক্ষান্তরে অন্য কতিপয় মাশায়েখ বলেন যে, ইস্তিগফার সবশেষে করবে। কারণ, কুরআন শরীফে নেক বান্দাদের গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

আল্লাহ তাআলার নেক বান্দারা রাতে কম ঘুমান। যিকির, নামায ও অন্যান্য ইবাদতে রাত অতিবাহিত করেন। তারপর সাহরীর সময় ইস্তিগফার করেন, যাতে করে এ সমস্ত ইবাদতের মধ্যে যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি হয়েছে সেগুলো থেকেও ইস্তিগফার হয়। তারা বলেন যে, হে আল্লাহ! রাতে আমি ইবাদত করেছি ঠিক, কিন্তু তা আপনার মর্যাদার উপযুক্ত হয়নি। مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ঐ সমস্ত ইবাদতের মধ্যে সংঘটিত ত্রুটিসমূহ থেকেও যখন আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চেয়ে নেয়া হলো, তখন এই ইবাদতগুলোও পূর্ণাঙ্গ এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে গ্রহণযোগ্য হলো।

যাইহোক, ইস্তিগফার বিষয়ে মাশায়েখদের রুচি-প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। তাই যে ব্যক্তির রুচি যে দিকে ধাবিত হবে, সে সে দিককে অবলম্বন করবে। কারণ, উভয় পন্থাই আল্লাহওয়ালাদের বাতলানো।

অধীনস্তদের উপর সীমালংঘন হলে সেগুলো মাফ নেওয়ার বিস্তারিত বিবরণ

পরবর্তীতে হযরত থানভী (রহ.) আরেকটি মালফূয (বাণীতে) ইরশাদ করেন–

> 'ছাত্রদের ত্রুটির কারণে তাদেরকে বেওকুফ, পাগল ইত্যাদি বলা দোষনীয় কোন বিষয় নয়। তাই তাদের থেকে মাফ চাওয়ার দরকার নেই। অতএব শ্রেণীর সকল ছাত্রের সামনে

> মাফ চাইবে না। বরং কতক সময় তা ক্ষতির কারণ হয়। কারণ, এতে করে ছাত্রদের দুঃসাহস, নির্ভীকতা ও নীতিহীনতা সৃষ্টি হয়। তবে শাসনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করবে। একইভাবে মুরীদ, সন্তান, খাদেম ও অন্যান্য অধীনস্তদেরও একই বিধান।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৪)

ছাত্রদেরকে শাসন করা

যারা তা'লীম-তাদরীসের কাজে বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন এবং আল্লাহ তাআলা যাদের অন্তরে চিন্তা দান করেন তাদের অন্তরে এই প্রশ্ন জাগে যে, কতক সময় ছাত্রদেরকে শাসন করতে হয়। গালমন্দ করতে হয়। কতক সময় কম-বেশি পিটুনীও দিতে হয়। বলাবাহুল্য, এতে করে তাদের কষ্টও হয়। আর অন্যকে কষ্ট দেওয়া গোনাহের কাজ। আর এ গোনাহ এমন, যার থেকে তাওবার রাস্তা এই যে, যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার কাছে মাফ চাইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে মাফ না চাইবে এবং সে ব্যক্তিও মাফ না করবে ঐ সময় পর্যন্ত ঐ গোনাহ মাফ হবে না।

ছাত্রদের থেকে মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই

এই মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) এই মূলনীতি বলে দিয়েছেন যে, উস্তাদ যদি ছাত্রকে ধমক দেয়, তিরস্কার করে বা অল্প-বিস্তর প্রহার করে তাহলে এ কারণে ছাত্রের থেকে মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং অনেক সময় মাফ চাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ, এতে করে দুষ্ট প্রকৃতির ছাত্রের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হবে। সে ভাববে যে, ভালই হলো: উস্তাদজীইতো আমাদের কাছে মাফ চেয়েছে। তাই আগামীতে আরো বেশি দুষ্টুমী করো, আরো বেশি বেয়াদবী করো। কারণ, উস্তাদ যদি কোনো সময় শাসন করেও পরবর্তীতে তিনিই আমাদের কাছে মাফ চেয়ে নিবেন। এর ফলে তাদের মধ্যে আরো বেশি দুঃসাহস ও নির্ভীকতা জন্মাবে। তাই তাদের থেকে মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার অধীনস্ত ছাত্র, মুরীদ, সন্তান যে-ই হোক না কেন সবার ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

অধীনস্থদের ক্ষেত্রে এ মূলনীতি কেন?

অধীনস্তদের ক্ষেত্রে এ মূলনীতি এজন্য প্রযোজ্য যে, যখন কোন ব্যক্তি আপনার অধীনস্ততা স্বীকার করল এবং সে বা তার পৃষ্ঠপোষক তার তারবিয়্যাতের জন্য আপনার কাছে আবেদন জানালো এবং একজন ছাত্র যখন উস্তাদের কাছে পড়তে এলো, তখন সে যেন আবেদন করল যে, আপনি আমার তারবিয়্যাত করুন। একইভাবে যখন মুরীদ শায়খের কাছে আসে, তখন সে এ

আবেদন নিয়েই আসে যে, আপনি আমার তারবিয়্যাত করুন। তাদের এ আবেদনের মধ্যে এ কথাটিও শামিল থাকে যে, আমি আপনাকে অধিকার দিচ্ছি যে, আপনি আমার তারবিয়্যাতের জন্য যে পন্থা ও পদ্ধতি উপযোগী মনে করবেন, তা অবলম্বন করবেন। তাই আমার তারবিয়্যাতের জন্য ধমক দিতে হলে অবশ্যই আপনি আমাকে ধমক দিবেন। এই তারবিয়্যাতের মধ্যে অল্প-বিস্তর প্রহারও অন্তর্ভুক্ত। তবে সে প্রহার দ্বারা দাগ সৃষ্টি না হতে হবে। এর অধিক মারা কোনভাবেই হালাল নয়। কারণ, এ ধরনের প্রহারের নিষেধাজ্ঞা হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে। যাইহোক, কোন উস্তাদ যদি তার ছাত্রকে পাগল বা বেওকুফ বলে তাহলে এ অধিকার উস্তাদের রয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এজন্য তাকে জবাবদিহী করতে হবে না। তাই এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের কারণে ছাত্রের থেকে মাফ চাওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই।

শাসনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করবে

তবে উস্তাদ এ কথা খেয়াল রাখবে যে, শাসন করার ক্ষেত্রে যেন সীমালংঘন না হয়। প্রয়োজনের অধিক যেন তিরস্কার না করে। প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রহার যেন না করে। বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই সীমারেখা কে নির্ধারণ করে দিবে যে, এতটুকু শাসন করা জায়েয, আর এরচেয়ে অধিক নাজায়েয বা এতটুকু প্রহার জায়েয আর এরচেয়ে অধিক নাজায়েয। এই সীমারেখা নির্ধারণ করা মানুষের জন্য সহজ বিষয় নয়। এর জন্য শায়খের সাহচর্যের প্রয়োজন রয়েছে। শায়খের সান্নিধ্যে থেকে এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আমি কী পরিমাণ শাসন করতে পারবো এবং কী পরিমাণ প্রহার করতে পারবো? কারণ, এ বিষয়ে দুই আর দুয়ে চারের মত কোন মূলনীতি বলে দেওয়া বড় কঠিন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ঘটনা

একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁর গোলামকে প্রহার করছিলেন এবং তাকে ধমকাচ্ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই অবস্থায় দেখে বললেন–

صِدِّيْقِيْنَ وَاللَّعَّانِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

'একদিকে তুমি সিদ্দীক হচ্ছো, অপর দিকে আবার লানতও করছো, কাবার রবের কসম! এই দুই বিষয় একত্রে জমা হতে পারে না।'

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা শুনে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঐ গোলামকেতো আযাদ করলেনই সাথে আরো অনেকগুলো গোলামকে আযাদ করলেন।

হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.) তাঁর গোলামকে তিরস্কার করছিলেন। তখন তিনি ঐ গোলামকে তার দেশের সাথে সম্পৃক্ত করে তাচ্ছিল্য করে একটি কথা বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি শুনে বললেন—

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ الْجَاهِلِيَّةُ

'আবু যর! তুমি এমন এক মানুষ যে, তোমার মধ্যে জাহেলিয়াতের গন্ধ অবশিষ্ট রয়েছে। কারণ, তুমি তোমার গোলামকে দেশের কথা উল্লেখ করে তিরস্কার করেছো।'

মোটকথা, ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই জরুরী। তাই সতর্কতার দাবি হলো, চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছার আগেই থেমে যাবে। যেখানেই এই সন্দেহের সৃষ্টি হবে যে, এটি ভারসাম্যের অন্তর্ভুক্ত কিনা, তখন আর সম্মুখে অগ্রসর হবে না। আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাওফীক এবং আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে থাকার ফলেই মানুষের মধ্যে এই গুণ লাভ হয়। তা না হলে মানুষের দ্বারা এটা করা সম্ভব নয়।

হযরত থানভী (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর একজন খাদেম ছিলেন। তার নাম ছিল ভাই নেয়ায। আমিও তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছি। সরল প্রকৃতির বুযুর্গ। হযরতের খাস খাদেম। একটু কড়াভাষী ছিলেন। তবে হযরতের মন-মেযাজ খুব ভাল বুঝতেন। হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে যে সমস্ত মুরীদ আসত ইনি তাদের সঙ্গে কিছুটা অকৃত্রিম আচরণ করতেন। কখনোও তাদেরকে এ বলে সতর্কও করতেন যে, এ কাজ এভাবে করো এবং এ কাজ করো না। এক দিন জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-এর নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আপনার খাদেম ভাই নেয়ায কড়া কড়া কথা বলে। যারা আপনার নিকট আসে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। একথা শুনে হযরতের কষ্ট হয়। তিনি ভাবেন যে, এখানে আগত ব্যক্তিদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করাতো খারাপ ব্যাপার।

তাই তিনি ভাই নেয়াযকে ডাকলেন এবং শাসন করে বললেন যে, ভাই নেয়ায! এখানে আগত লোকদের সঙ্গে তুমি কটু কথা বলো, তাদেরকে ধমক দাও, এমন করো কেন? তখন ভাই নেয়ায বললেন— 'হযরত! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মিথ্যা বলবেন না।' তিনি আসলে বলতে চাচ্ছিলেন যে, যারা আপনার কাছে এই অভিযোগ করেছে তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং মিথ্যা না বলে। কারণ, তারা অবাস্তব কথা বলছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে একথা

বের হয় যে, হযরত! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মিথ্যা বলবেন না। আপনারাই বলুন, কোন ব্যক্তি যদি তার চাকরকে ধমক দেয় আর উত্তরে চাকর একথা বলে যে, মিথ্যা বলো না, তাহলে তো আরো বেশি রাগ হবে। কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) একথা শুনে মাথা নত করলেন এবং আস্তাগফিরুল্লাহ বলতে বলতে চলে গেলেন।

এক দিকের কথা শুনে শাসন করা

তিনি এমনটি কেন করলেন? কারণ, এই যে, যখন তিনি তাঁর চাকরকে ধমক দিলেন আর চাকর বলল যে, আল্লাহকে ভয় করুন। তখন সাথে সাথে তাঁর মাথায় একথা আসল যে, আমি এক দিকের কথা শুনে তাকে শাসন করতে আরম্ভ করেছি। আমি তাকে একথা জিজ্ঞাসা করিনি যে, মানুষ তোমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করছে। প্রকৃত ঘটনা কী? তার কথা শোনার পর ফায়সালা করা উচিত ছিল। এক দিকের অভিযোগ শুনে শাসন করা সমীচীন হয়নি। তাই তিনি নিজের কথার উপর জিদ না করে আস্তাগফিরুল্লাহ বলতে বলতে চলে গেলেন। এঁরা ছিলেন–

كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللّٰهِ

'আল্লাহ তাআলার বেঁধে দেওয়া সীমানার আগে বাড়েন না।'

হযরত উমর ফারূক (রাযি.)

এই গুণ হযরত উমর ফারূক (রাযি.)-এর বলে বর্ণনা করা হয়েছে–

كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللّٰهِ

'তিনি আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখার সামনে থেমে যেতেন।'

এমনিতে তাঁর মধ্যে রাগ ছিল। তাঁর মেযাজের মধ্যে তেজ ছিল। কিন্তু যখনই আল্লাহ তাআলার বেঁধে দেওয়া সীমারেখা সামনে চলে আসত সাথে সাথে তাঁর সমস্ত তেজ খতম হয়ে যেতো। সমস্ত রাগ প্রশমিত হতো। একবার হযরত উমর ফারূক (রাযি.) মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনলেন। এসে দেখলেন যে, এক বাড়ির পরনালা মসজিদের দিকে লাগানো রয়েছে। তিনি হুকুম করলেন যে, এই পরনালাটি ভেঙ্গে ফেলো। এ কারণে যে, এর পানি দ্বারা মসজিদ খারাপ হয়ে যায়। তাই পরনালাটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই রাগও আল্লাহ তাআলার জন্য এবং মসজিদের জন্য ছিল। যখন হযরত আব্বাস (রাযি.) জানতে পারলেন যে, হযরত উমর (রাযি.) তার ঘরের পরনালা ভেঙ্গে দিয়েছেন, তখন তিনি হযরত

উমর (রাযি.)-এর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে, আপনি এটা কী করেছেন? আপনি আমার ঘরের পরনালা ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত উমর (রাযি.) বললেন, এ পরনালার পানি মসজিদের মধ্যে পড়ছিল এবং মসজিদে নববীকে খারাপ করছিল। তাই আমি তা ভেঙ্গে দিয়েছি। হযরত আব্বাস (রাযি.) বললেন, আপনি জানেন না, এ পরনালা লাগানোর অনুমতি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দিয়েছিলেন। আচ্ছা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন? সুতরাং সেখানেই তিনি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং হযরত আব্বাস (রাযি.)কে বললেন, আপনি আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে পুনরায় ঐ পরনালাটি ঐ জায়গায় লাগিয়ে দিন। তারপর তিনি বললেন, খাত্তাবের ছেলের এই সাহস নেই যে, সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিতে লাগানো পরনালাকে ভেঙ্গে দিবে। সুতরাং তিনি পরনালাটি পুনরায় ঐ জায়গায় লাগিয়ে দিলেন এবং আজ পর্যন্ত ঐ পরনালা মসজিদে নববীতে লাগানো আছে। আল্লাহ তাআলা তুর্কীদের খেলাফতকালে মানুষদেরকে এমন প্রেম দান করেছিলেন যে, এখন ঐ ঘরও নেই এবং অন্য কিছুও নেই। কিন্তু যেহেতু ঐ পরনালাটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগিয়েছিলেন এবং হযরত উমর ফারূক (রাযি.) এ পরনালার প্রতি এভাবে সম্মান দেখিয়েছিলেন, এজন্য ঐ পরনালাটি ঐ জায়গাতেই লাগিয়ে দেয়। এখন পর্যন্ত সেই জায়গায় পরনালাটি লাগানো রয়েছে। মোটকথা, হযরত থানভী (রহ.)কেও আল্লাহ তাআলা এই গুণ দান করেছিলেন যে, كان وقافا عند حدود الله তিনি আল্লাহর সীমার সামনে থেমে যেতেন।

এ গুণ সাহচর্যের দ্বারা লাভ হয়

কিন্তু এ গুণ শুধুমাত্র কিতাব পড়ার দ্বারা লাভ হয় না। বরং কারো কাছে ঘষা-মাজা খাওয়ার দ্বারা লাভ হয়। যখন কারো দুয়ারে মানুষ ঘষা-মাজা খায় তখন আল্লাহ তাআলা এ গুণ দান করেন, তখন সে আল্লাহ তাআলার সীমারেখা চিনতে পারে এবং সে অনুপাতে আমল করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অফুরন্ত দয়ায় আমাদেরকে এই গুণ দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

আটাত্তরতম মজলিস

অতীত গোনাহসমূহ মনে রাখার অর্থ

অতীত গোনাহসমূহ মনে রাখার অর্থ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

তাওবা কবুল হওয়ার আলামত

তাওবার বয়ান চলছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর এক 'মালফূযে' বলেন–

> 'শায়খে আকবার (রহ.) বলেন যে, তাওবা কবুল হওয়ার আলামত এই যে, ঐ গোনাহের নকশা মস্তিষ্ক থেকে পরিপূর্ণরূপে মিটে যাবে। যাতে করে পরবর্তীতে ঐ গোনাহের কথা আর স্মরণ না হয়। অথচ তাসাওউফের কিতাবসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ বুযুর্গগণ ব্যাপকভাবে লিখেন যে, আল্লাহর পথের পথিকের জন্য সব সময় নিজের গোনাহসমূহের প্রতি নজর রাখা জরুরী। এতদুভয় বক্তব্যের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে যে, মস্তিষ্ক থেকে ঐ গোনাহের নকশা মিটিয়ে ফেলার অর্থ হলো, তা স্মরণ থাকলেও বা বিশ্বাসগত অস্থিরতা থাকলেও তার বিশেষ প্রভাব অর্থাৎ, প্রকৃতিগত অস্থিরতা থাকবে না। তাছাড়া শায়খে আকবর (রহ.)-এর এ কথা সবার জন্যে নয়। বরং যে সমস্ত লোকের প্রকৃতিগত অস্থিরতা ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রফুল্লচিত্ততার জন্যে বাধা সৃষ্টি করে তাদের জন্যে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৫)

সূচিপত্র

শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.)-এর উক্তি

এ বিষয়ে বুযুর্গদের থেকে দু' রকম উক্তি পাওয়া যায়। যে দুই উক্তির মধ্যে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। হযরত থানভী (রহ.) এই উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। একটি উক্তি শায়খে আকবার হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.)-এর। তিনি বলেন যে, তাওবা কবুল হওয়ার আলামত এই যে, যে গোনাহ থেকে তাওবা করেছে, তার নকশা অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে মিটে যেতে হবে। পরবর্তীতে ঐ গোনাহের চিন্তা, কল্পনা এবং ধ্যান যেন মনে জাগ্রত না হয়। তাঁর মতে এটি তাওবা কবুল হওয়ার আলামত। বাহ্যত এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে গোনাহ থেকে তাওবা করেছিলো, তা যদি মনে থাকে এবং বার বার তার কথা স্মরণ হতে থাকে যে, আমি অমুক গোনাহ করেছিলাম, তাহলে সে তাওবা কবুল হয়নি। একথা বলেছেন হযরত শায়খে আকবার (রহ.)।

অন্যান্য বুযুর্গের বক্তব্য

কিন্তু সাধারণত আল্লাহওয়ালা বুযুর্গগণ বলেন যে, মানুষের সব সময়ই নিজের গোনাহসমূহ সামনে থাকা উচিত। আর যখন সামনে থাকবে, তখন তো ঐ সমস্ত গোনাহের কথা স্মরণ থাকবেই। যাইহোক, এ সমস্ত হযরত বলেন যে, গোনাহের কথা স্মরণ রাখো, আর শায়খে আকবার (রহ.) বলেন যে, গোনাহসমূহ স্মরণ রাখা তাওবা কবুল না হওয়ার আলামত। তাই এ দুই কথার মাঝে বিরোধ হলো।

শায়খে আকবার (রহ.)-এর কথার ব্যাখ্যা

হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, শায়খে আকবার (রহ.)-এর কথা 'গোনাহের নকশা মন থেকে মিটে যাবে'– এর অর্থ এটা নয় যে, গোনাহের কথা মনে থাকবে না; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গোনাহ করার কারণে সহজাতভাবেই মনের মধ্যে যে ব্যথা-বেদনা এবং পেরেশানী হয়েছিলো যে, আমার দ্বারা এ কী হলো! আমি এ গোনাহ কেন করলাম! যখন খাঁটি মনে তাওবা করলো, তখন এই দুঃখ-বেদনার তীব্রতা কম হয়ে যাওয়া দরকার। এটি তাওবা কবুল হওয়ার আলামত। তবে যদি ঐ গোনাহের কথা অনিচ্ছাকৃতভাবে স্মরণ থাকে তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই।

তাওবার তাওফীক পাওয়ায় শোকর আদায় করবে এবং নিশ্চিন্ত থাকবে

বরং গোনাহের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে অন্তরে ঐ গোনাহ দোষনীয় হওয়ার বিষয় বিবেক জাগিয়ে দেয়। তার বিবেক বলে যে, আমার দ্বারা এ ভুল

কাজ হয়েছিলো অথচ আমি এটাকে খারাপ মনে করি। এর সাথে সাথে অন্তর এ কারণে নিশ্চিন্ত এবং প্রশান্ত যে, আলহামদু লিল্লাহ, এখন আমার তাওবার তাওফীক লাভ হয়েছে। ফলে আমি এ গোনাহ থেকে বের হয়ে এসেছি। এই গোনাহের আযাব থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে রক্ষা করেছেন। তাহলে এতে কোন দোষ নেই।

আমাদের মুরুব্বী হযরত বাবা নাজম আহসান (রহ.) হযরত থানভী (রহ.)-এর 'মুজাযে সোহবত' ছিলেন। কবি ছিলেন। খুব উঁচু মানের কবিতা রচনা করতেন। 'মীর' এবং 'দরদ'-এর মতো প্রতিষ্ঠিত কবিদের মতো কবিতা রচনা করতেন। এক কবিতায় তিনি বলেন−

دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی
ایسی تیسی میرے گناہوں کی

অর্থাৎ, গোনাহের কথা স্মরণ হচ্ছে এবং গোনাহের খারাবীও অন্তরে জাগরুক রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে একথাও অন্তরে জাগছে যে, আল্লাহ তাআলা অনুতপ্ত হওয়ার দৌলত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করার তাওফীক লাভ হয়েছে। তাই এ গোনাহ আর আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

তাই একথা স্মরণ হওয়া যে, আমার দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হয়েছিলো, মন্দ কাজ হয়েছিলো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে তাওবার তাওফীক দিয়েছেন, তাই আমি নিশ্চিন্ত। কারণ, আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, তিনি তাওবা কবুল করে থাকেন। তাই কিয়ামতের দিন যখন আমি আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবো, তখন ইনশাআল্লাহ তিনি আমাকে এর জন্যে পাকড়াও করবেন না। এ কারণে আমি নিশ্চিন্ত। এ হলো, শায়খে আকবার হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.)-এর কথার অর্থ ও তাৎপর্য।

গোনাহকে মনে রাখার তিনটি উদ্দেশ্য

অন্যান্য আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ বলেন, মানুষ নিজের গোনাহকে সামনে রাখবে এবং সেগুলোর কথা মনে করবে। গোনাহকে মনে রাখার তিনটি উদ্দেশ্য হতে পারে। উদ্দেশ্যত্রয়ের ভিত্তিতে সেগুলোর বিধানও ভিন্ন ভিন্ন।

স্বাদ উপভোগ করার জন্য গোনাহের কথা মনে রাখা

গোনাহের কথা মনে রাখার একটি অবস্থা তো এই যে, স্বাদ উপভোগ করার জন্য গোনাহের কথা মনে রাখা, নাউযুবিল্লাহ। যেমন, অমুক সময় আমি এই

গোনাহটি করেছিলাম, তখন তাতে কেমন মজা পেয়েছিলাম তা মনে করার চেষ্টা করা এবং সে কথা কল্পনা করে তা থেকে স্বাদ উপভোগ করা। এ অবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর থেকে হেফাযত করুন। আমীন। এ অবস্থায় স্বাদ উপভোগের জন্য পুনরায় ঐ গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এ কারণে অবস্থাটি খুবই বিপজ্জনক। সর্বাবস্থায় এ থেকে দূরে থাকা জরুরী।

গোনাহের কথা মনে করে তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করা

গোনাহের কথা মনে রাখার দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মানুষ এ কারণেও গোনাহের কথা মনে করে যে, আমি তো অমুক গোনাহটি করেছিলাম। কিন্তু জানিনা আমার তাওবা কবুল হয়েছে, কি না। এখন সে বার বার তার গোনাহের কথা মনে করছে, আর অস্থির হচ্ছে যে, জানিনা এসব গোনাহ মাফ হবে কিনা। এভাবে গোনাহের কথা মনে করা গোনাহ নয়। কিন্তু তা পসন্দনীয় এবং কাঙ্ক্ষিতও নয়। বরং সঠিক নিয়ম হলো, একবার বসে খাঁটি মনে তাওবা করো এবং তাওবার তিন শর্ত অর্থাৎ, অবিলম্বে ঐ গোনাহ ছেড়ে দেওয়া, গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং আগামীর জন্যে এই গোনাহ না করার সংকল্প করা। এই শর্ত তিনটি পুরা করো এবং তাওবার নিয়তে দু' রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করো এবং মাফ চাও যে, হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে। আমাকে মাফ করে দাও। একবার উত্তমভাবে মন ভরে তাওবা করো এবং মাফ চেয়ে নাও। যখন একবার এ কাজ করলে, তখন আর ঐ গোনাহের কথা জপো না এবং ইচ্ছা করে স্মরণ করার চেষ্টা করো না। বরং তা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো।

সন্দেহের দ্বারা অনাস্থা প্রকাশ পায়

এরপর আর গোনাহ মাফ হলো কি হলো না এ আশঙ্কা করো না। কারণ, যখন আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, আমি তোমার তাওবা কবুল করবো। মাফ করবো। তখন অনর্থক অন্তরে সন্দেহকে জায়গা দেওয়া আল্লাহ তাআলার রহমতের অমর্যাদা করা। কারণ, এরূপ সন্দেহ পোষণ করা আল্লাহ তাআলার উপর এক প্রকার অনাস্থা প্রকাশ করা।

একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত

যেমন, মনে করুন, আপনি একজন বাবা। আপনার একটি সন্তান রয়েছে বা আপনি একজন উস্তাদ আর আপনার একজন ছাত্র রয়েছে। এখন ঐ সন্তান বা

ছাত্র কোন অন্যায় করলো তারপর আপনার কাছে এসে মাফ চাইলো। আপনি তাকে বললেন– 'যাও! আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।' কিন্তু ঐ সন্তান বা ছাত্র পুনরায় আপনাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, আমার ভুল হয়েছে, আমাকে মাফ করে দিন। বাবা বলছে, ঠিক আছে, ভুল হয়েছে, কিন্তু আমি তো তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু এরপরও ছেলে পীড়াপীড়ি করছে আর বলছে যে, আমার ভুল হয়েছে, আমাকে মাফ করে দিন। এভাবে সে একই কথা বারবার বলছে। তার এ কাজ ও পদ্ধতি সঠিক নয়। কারণ, এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আপনার কথার উপর ঐ সন্তান বা শাগরিদের বিশ্বাস নেই। আপনি বলছেন যে, মাফ করে দিয়েছি কিন্তু সে বলছে যে, এখনও মাফ হয়নি। সে যেন আপনার উপর অনাস্থা প্রকাশ করছে এবং আপনার কথার উপর ভরসা করতে পারছে না।

মাফ করার উপর আস্থা রাখো

উস্তাদ, বাবা এবং পীর আল্লাহ তাআলার তুলনায় এদের কী মূল্য আছে? আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ দয়া এদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই যখন এদের মাফ করার উপরে মানুষ ভরসা করে থাকে তাহলে কী আল্লাহ তাআলার মাফ করার উপর ভরসা করা উচিত নয়? বরং এদের চেয়ে অধিক ভরসা করা উচিত। তাই যখন একবার তাওবা করেছো, আর আল্লাহ তাআলা তাওবা করলে গোনাহ মাফ করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, 'যে কেউ আমার কাছে তাওবা করবে, আমি তাকে মাফ করে দেবো।' তাই এ কথার উপর ভরসা রাখো যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। তাই ঐ গোনাহের কথা আর জপো না।

গোনাহের কথা জপার পরিণতি

বরং গোনাহের কথা জপতে থাকলে পরিণতিতে ক্রমে ক্রমে আল্লাহ তাআলার সাথে এক প্রকারের পর্দা সৃষ্টি হয়। এ পর্দা ভাল জিনিস নয়। এ পর্দাকে সরিয়ে ফেলো এবং বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। তবে আগামীর জন্য সজাগ, সচেতন থাকো যে, পুনরায় যেন ঐ গোনাহ সংঘটিত না হয় এবং আবার যেন ঐ ভুল না করে বসো। যাইহোক, গোনাহের কথা নিয়মতান্ত্রিকভাবে গুরুত্বের সাথে স্মরণ করা এবং তার জপ করতে থাকা ঠিক নয়।

নিজের বাস্তব অবস্থা সামনে রাখার জন্য গোনাহের কথা মনে রাখা

গোনাহের কথা স্মরণ করার তৃতীয় অবস্থা এই যে, মানুষ একথা মনে রাখবে যে, আমার অবস্থাতো এই যে, আমার দ্বারা এমন এমন গোনাহ হয়েছে, তবে এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তাআলা দয়া করে সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন, তাই ব্যক্তি হিসেবে আমার কোনোই গুরুত্ব নেই। আমার উপর কোনো ভরসা নেই। যে কোনো সময় আমার দ্বারা গোনাহ সংগঠিত হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বাঁচার তাওফীক না হবে। আমি এতো নোংরা ছিলাম। এটাতো আল্লাহর দয়া যে, তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। এটি তাঁর মেহেরবাণী যে, এতসব ভুল করা সত্ত্বেও তিনি আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমার তাওবা কবুল করেছেন। আমিতো এর উপযুক্ত ছিলাম না। তাই নিজের বাস্তব অবস্থাকে সামনে রাখার উদ্দেশ্যে এবং নিজিকে আত্মশ্লাঘা, অহংকার, অহমিকা ও গরিমা থেকে বাঁচানোর জন্য গোনাহর কথা মনে রাখায় কোনো দোষ নেই।

প্রশংসার সময় নিজের বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করো

যদি কোন ব্যক্তি এভাবে তোমার প্রশংসা করে যে, তুমি বড় ভাল মানুষ, বড় আলেম, বড় পরহেযগার, ইবাদতগুজার। এর চিকিৎসাও এই যে, মানুষ এমন সময় একথা চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করেছেন যে, তার সামনে আমার ভাল অবস্থা প্রকাশ করেছেন, এ কারণেই এ ব্যক্তি আমার প্রশংসা করছে। সে যদি আমার বাস্তব অবস্থা জানতে পারে, তাহলে ঐ ব্যক্তিই আমাকে ঘৃণা করবে। আমার উপর থু-থু নিক্ষেপ করবে। কারণ, আমার আসল অবস্থা তো এই যে, আমি ঐ সমস্ত গোনাহে লিপ্ত ছিলাম। তবে আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমার দোষগুলো গোপন করে রেখেছেন। এ ব্যক্তি আমার আসল অবস্থা জানে না। তাই আল্লাহওয়ালা বুযুর্গগণ বলেন যে, নিজের গোনাহের কথা ভুলে যেও না, তাদের উদ্দেশ্য এই তৃতীয় অবস্থা।

যাইহোক, গোনাহের কথা মনে রাখার তিনটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

১. স্বাদ উপভোগের জন্য স্মরণ করা (এটাতো সম্পূর্ণই গোনাহের কাজ)।

২. ঐ সমস্ত গোনাহের কথা মনে করে সন্দেহ পোষণ করা যে, জানিনা ঐ সমস্ত গোনাহ মাফ হয়েছে কি না। এ অবস্থাও পসন্দনীয় নয়।

৩. নিজের প্রকৃত অবস্থাকে সামনে রাখার জন্য গোনাহের কথা স্মরণ করা। এই তৃতীয় অবস্থাটা সমীচীন অবস্থা।

গোনাহ জপার জিনিস নয়

উপরোক্ত তিনটি অবস্থায়ই গোনাহকে স্মরণ করার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু তিনটির হুকুম তথা বিধানের ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। পীর, মাশায়েখ যখন নিজেদের মুরীদদের তারবিয়্যাত করেন, তখন তারা এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখেন যে, তার জন্য কোন অবস্থাটি সমীচীন। কেউ কেউ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থার পার্থক্য বুঝতে পারেনি। যার ফলে তারা নিজেদের মুরীদদেরকে এই হুকুম দিয়েছে যে, প্রতিদিন তাহাজ্জুদের সময় নিজের এককেটি গোনাহের কথা স্মরণ করবে। একবার এক ব্যক্তি আমার কাছে এলো এবং বললো যে, আমার পীর সাহেব আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাহাজ্জুদের সময় যখন উঠবে তখন প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে এবং নামাযের পর তুমি এ পর্যন্ত যত গোনাহ করেছো তার সবগুলোর কথা মনে করো এবং এক, দুই, তিন, চার এভাবে নম্বর দিয়ে দিয়ে তার তালিকা তৈরি করো। তারপর ঐ সমস্ত গোনাহ থেকে ইস্তিগফার করো। আমি বললাম, এ গোনাহগুলোও কী কোন তাসবীহ, যে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় গোনাহের তাসবীহ পাঠ করবে? একথার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সবই ভুল! তবে সংক্ষেপে নিজের গোনাহের কথা সামনে রাখবে এবং চিন্তা করবে যে, আমার আসল অবস্থাতো এরূপ ছিল। তবে আল্লাহ তাআলা বড় দয়া করে আমাকে এ সমস্ত গোনাহের পঙ্কিলতা থেকে বের করে এনেছেন। তাই এটা আমার জন্য গর্বের কোনো বস্তু নয়। গর্ব-অহংকার ও আত্মশ্লাঘার অবস্থা এটা নয়।

শুধু তাওবা করাই যথেষ্ট

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে যে,

> 'যদি কাউকে মনে মনে তুচ্ছ মনে করে বা কারো সাথে হিংসা করে বা মনে মনে এমন কোন মন্দ চরিত্রে লিপ্ত হয়, যার সম্পর্ক অন্যের সাথে কিন্তু হাত ও মুখ দ্বারা কোন অপরাধ করল না, তাহলে এটাও 'হুকুকুল ইবাদ' তথা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং এটাও বান্দার নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে কি না?'

উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'যেহেতু এর দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হয়নি তাই এটা 'হুকুকুল ইবাদ' তথা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধু তাওবা করা এবং আগামীর জন্য সংশোধিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট।'

অন্যের সম্পর্কে মন্দ ধারণা হওয়া বান্দার হক নষ্ট করা নয়

অনেক সময় অন্যের সম্পর্কে অন্তরে খারাপ চিন্তা আসে। যেমন মনে কারো ব্যাপারে হিংসার উদ্রেক হয়। মন চায় যে, সে লজ্জিত হোক, তার উন্নতি বন্ধ হোক তবে মনের মধ্যে শুধু এ কথার চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু মনের এই চাহিদা অনুপাতে বাস্তব ভিত্তিক কোন পদক্ষেপ নেয়নি। কারো সামনে তার নিন্দা করেনি। কোন বিষয়ে তার গীবত করেনি, কূটনামী করেনি। বকা-ঝকা দেয়নি অথবা মনে করুন, অন্তরে কারো বিষয়ে খারাপ চিন্তার উদ্রেক হলো। মনে মনে তাকে তুচ্ছ ভাবলো। অথচ কোন মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করা অনেক বড় গোনাহ। কিন্তু এই তুচ্ছ মনে করার পরিণতিতে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করলো না। অপমানিত করলো না। তাকে বকা-ঝকা দিলো না। এখন যদি এসব কারণে বলা হয় যে, সে বান্দার হক নষ্ট করেছে, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, ঐ বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে মাফ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাফ হবে না। কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, এটি 'হুকুকুল ইবাদ' তথা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধু তাওবা করাই যথেষ্ট।

স্বেচ্ছায় অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না

এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি। অন্তরে যদি অন্য কারো বিষয়ে হিংসা, তাচ্ছিল্য বা মন্দ চিন্তা সৃষ্টি হয় তাহলে এর দু'টি অবস্থা হতে পারে। হয়তো নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কারো বিষয়ে অন্তরে এরূপ চিন্তা জাগ্রত হলো, বা ইচ্ছা করে চিন্তা করে করে অন্যের তাচ্ছিল্য অন্তরে জাগরূক করলো। উপরোক্ত মালফূযে (বাণীতে) হযরত থানভী (রহ.) যে বললেন– এই চিন্তার বিষয়ে তাওবা করা উচিত, এটা ঐ ধরনের চিন্তা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যা মানুষ স্বেচ্ছায় অন্তরে জাগ্রত করে। কারণ, যখন নিজের ইচ্ছায় অন্তরে চিন্তা জাগ্রত করবে, তখন তা গোনাহ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা অন্যের কোন ক্ষতি হয়নি, তাই এটা বান্দার হক নয়। বিধায় এরূপ চিন্তার জন্য শুধু তাওবা করা যথেষ্ট। সে আল্লাহকে বলবে, হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে। আমাকে মাফ করে দিন। এতে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন। এক্ষেত্রে যার বিষয়ে মন্দ চিন্তা এসেছে তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়ার প্রয়োজন নেই।

অনিচ্ছাকৃতভাবে মন্দ চিন্তা আসা

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যের সম্পর্কে অন্তরে এরূপ চিন্তা হচ্ছে যে, অমুক ব্যক্তি এমন, অমুক ব্যক্তি এমন। যেহেতু এই চিন্তা অনিচ্ছাকৃতভাবে জাগ্রত হয়েছে, তাই এরূপ চিন্তা অন্তরে আসা গোনাহ নয়। ইনশাআল্লাহ, এজন্য

পাকড়াও করা হবে না। জবাবদিহী করতে হবে না এবং আযাব হবে না। এর থেকে তাওবা করারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ অবস্থাটিও বিপজ্জনক। কারণ, এ অবস্থা যে কোন সময় তোমাকে গোনাহে লিপ্ত করাবে। হয়তো অবশেষে স্বেচ্ছায় তুমি তার মন্দ চিন্তা অন্তরে জাগ্রত করবে, অথবা ঐ চিন্তার পরিণতিতে তোমার দ্বারা এমন কোনো কাজ সংগঠিত হবে যা গোনাহের কাজ। বিধায় অনিচ্ছাকৃত এই চিন্তাও তোমাকে গোনাহের নিকটে পৌঁছিয়ে দিবে। দুইভাবে এর চিকিৎসা করা জরুরী।

এরূপ চিন্তাকে মন্দ জ্ঞান করবে

একটি চিকিৎসা এই যে, তোমার অন্তরে অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যের প্রতি হিংসার যে মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে বা তাচ্ছিল্যের সৃষ্টি হচ্ছে এ মনোভাবকে অন্তর থেকে মন্দ জ্ঞান করো। তুমি ভাবো যে, আমার অন্তরে যে মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, তা ভালো নয়। এটি একটি মন্দ চিন্তা। এ চিন্তা থেকেও বাঁচার চেষ্টা করবে।

তার জন্য দু'আ করো

দ্বিতীয় চিকিৎসা এই যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার অন্তরে হিংসার উদ্রেক হচ্ছে, তার জন্য এভাবে দু'আ করো যে, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তিকে দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি দান করুন। এমতাবস্থায় তোমার মন তো চাচ্ছে যে, এ ব্যক্তি মাটিতে মিশে যাক। লাঞ্ছিত হোক। কিন্তু মুখে তুমি দু'আ করছো যে, হে আল্লাহ! আপনি একে দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি দান করুন। এভাবে দু'আ করার সময় তোমার অন্তর চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাবে। আর অন্তরকে চূর্ণ করাই এখানে উদ্দেশ্য। সাথে সাথে একথা চিন্তা করবে যে, এ ব্যক্তি লাঞ্ছিত হওয়ায় এবং সে কষ্ট পাওয়ায় আমার কী লাভ? তাই তার জন্য দু'আ করো যে, হে আল্লাহ! আপনি একে উঁচু মর্যাদা দান করুন। এই দুই চিকিৎসা যখন তুমি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইনশাআল্লাহ অনিচ্ছাকৃত এই চিন্তা ভবিষ্যতে তোমার ক্ষতি করবে না এবং তোমাকে গোনাহে লিপ্ত করবে না।

তাওবা করার পর যদি বান্দার হক পরিশোধ করার সুযোগ না পায়

অপর একটি মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) ইরশাদ করেন যে,

> 'যে ব্যক্তি তাওবা করে মরে গেলো এবং সে তাওবা করার পর মানুষের পাওনা পরিশোধ করার সুযোগ পেলো না, তাওবা করার দ্বারা তার জন্য বান্দার হকও মাফ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মাজলুমকে খুশি করে জালেমকে মাফ করে দিবেন। তাওবা না করা অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার এখতিয়ার আছে যে, তিনি তাকে শাস্তি দিবেন অথবা শাস্তি না দিয়ে মাফ করে দিবেন। আর মাজলুমকে জান্নাতের নিয়ামত দিয়ে খুশি করে দিবেন।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৫)

বান্দার হক তাওবার দ্বারা মাফ হয় না

এ মাসআলাটি বারবার আলোচনা করেছি যে, বান্দার হকের সাধারণ নিয়ম এই যে, শুধু তাওবা করার দ্বারা তা মাফ হয় না। যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়, বা যার হক সে মাফ করে দেয়। তাই আপনি যদি নির্জনে বসে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা করেন, কিন্তু অন্যের যে পয়সা আপনি মেরে খেয়েছেন তা শুধু তাওবা করার দ্বারা মাফ হবে না। যাদের পয়সা আপনি নিয়েছেন, হয় তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে কিংবা পাওনাদার খুশি মনে তা মাফ করে দিতে হবে। জোরপূর্বক মাফ করানোও যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে আর্থিক ছাড়াও দৈহিক ও মানসিক যেসব হক রয়েছে, যেমন কাউকে কষ্ট দিয়েছে বা কারো মনে ব্যথা দিয়েছে, এ সমস্ত হকের বিধান এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হকদার তা মাফ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সমস্ত হক মাফ হবে না। যত তাওবা ইস্তিগফারই কর না কেন। মোটকথা, বান্দার হকের বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এটাই, যা উপরে আমি উল্লেখ করলাম।

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের দ্বারা মাফ করিয়ে নিবেন

কিন্তু আল্লাহ তাআলার মহান দরবার অনন্ত অসীম দয়ার দরবার। তাই কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয়, যে খাঁটি মনে তাওবা করেছে এবং সংকল্পও করেছে যে, যাদের হক আমার উপর ওয়াজিব তাদের সবার হক আমি আদায় করবো। কারো টাকা-পয়সা আমার দায়িত্বে ওয়াজিব থাকলে তার পয়সা আমি দিয়ে দেবো। কারো নিন্দা বা গীবত করে থাকলে তার কাছে মাফ চেয়ে নিবো। যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে তার প্রতিবিধান করবো। কিন্তু তাওবা করার পর সে হক আদায় করার সুযোগ পেলো না। বরং হক আদায় করার সূচনা করতেই সে মারা গেলো। এমন ব্যক্তির বিষয়ে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, 'এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা এই তাওবার দ্বারাই তার বান্দার হকও মাফ করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ। তার পদ্ধতি এই হবে যে, হকদারদারকে আল্লাহ তাআলা বলবেন– 'আমি তোমাদেরকে এসব নিয়ামত দিচ্ছি, তোমরা আমার বান্দাকে মাফ করে দাও।'

সূচিপত্র

সারকথা

সারকথা এই যে, বান্দার হকের ব্যাপারে যেই হুকুম রয়েছে যে, হকদাররা তা মাফ করে না দিলে মাফ হয় না। এই হুকুম ঐ সময় যখন ঐ ব্যক্তি তাওবা করার পর হক আদায় করার সুযোগ পেয়েছে এবং প্রতিবিধানের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তারপরও সে হক আদায় করেনি। তার প্রতিবিধান করেনি। তাহলে ঐ সমস্ত হক মাফ হবে না। কিন্তু যদি প্রতিবিধানের সুযোগই লাভ না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা হকদারদের দ্বারা মাফ করাবেন।

বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ঘটনা

ঐ সহীহ হাদীসটি এর দলীল, যার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেন যে– সে ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে। তারপর তার মনে চিন্তা জাগল যে, আমার দ্বারা অনেক বড় গোনাহ হয়েছে। যখন আল্লাহ তাআলার কাছে যাবো, তখন আমার ঠিকানা জাহান্নাম ছাড়া আর কোথাও হবে না। তাই সে এক পাদরীর নিকট গিয়ে বললো যে, আমি নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করেছি। এখন আমি এ গোনাহের কারণে আন্তরিকভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত। আমি এ গোনাহ থেকে পরিত্রাণ চাই। তাওবা করতে চাই। আপনি আমাকে এই আযাব থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিন। পাদরী তার সব কথা শুনে বললো যে, তোমার মুক্তির কোন পথ নেই। তুমি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছো। তারা সকলে মারা গেছে। তাদের থেকে মাফ চেয়ে নেওয়ার কোন পথ নেই। তাদের হয়ে তোমার থেকে যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় এবং কিসাস হিসেবে তোমাকে হত্যাও করা হয়, তবুও এক জানের বদলে এক জান দেওয়া হবে। অবশিষ্ট আটানব্বই জানের বদলা কী দ্বারা হবে? তাই তোমার মুক্তির কোন পথ নেই। তুমি জাহান্নামী। লোকটি বললো যে, নিরানব্বই জনকে তো হত্যা করেছিই, এবার আরেকটাকে শেষ করে দেই। তারপর সে ঐ পাদরীকেও হত্যা করে একশ' পুরা করলো।

তারপর লোকটি অন্য একজনের নিকট গেলো এবং নিজের ঘটনা খুলে বললো। সে বললো যে, তুমি আল্লাহর কাছে তাওবা করো। অমুক এলাকায় নেক লোকদের বসতী আছে, তুমি সেখানে গিয়ে ঐ নেক লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করো। এর পরিণতিতে তোমার অবস্থা ভালো হবে। তার ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে মাফ করে দিবেন। তখন লোকটি চিন্তা করলো যে, আমি এখন সেখানে যাবো, সেখানকার লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করবো এবং গোনাহ মাফ হওয়ার জন্যে যে পন্থা তারা বলবে আমি তা গ্রহণ করবো। এসব কথা চিন্তা করে

সূচিপত্র

সে ঐ বসতীর দিকে রওয়ানা করলো। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথেই সে ইন্তিকাল করলো। হাদীস শরীফে এসেছে যে, তার রূহ নেওয়ার জন্যে সেখানে রহমতের ফেরেশতাও আসে এবং আযাবের ফেরেশতাও আসে। তাদের মধ্যে বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। রহমতের ফেরেশতারা বলে যে, সে আমাদের লোক এবং সে জান্নাতের উপযুক্ত। কারণ, সে তাওবা করে ঘর থেকে বের হয়েছিলো। আর আযাবের ফেরেশতারা বলে যে, সে আমাদের লোক। কারণ, তার ঘাড়ে একশ' মানুষকে হত্যা করার গোনাহের বোঝা রয়েছে। তাই সে জাহান্নামের উপযুক্ত। তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উভয় দলের মধ্যে এই ফায়সালা করে দিলেন যে, তোমরা দেখো যে, এ লোকটি কোন বসতীর অধিক নিকটবর্তী। তখন উভয় বসতীর মাঝের দূরত্ব পরিমাপ করা হলো। পরিমাপ করে দেখা গেলো যে, সে যে বসতী থেকে রওয়ানা করেছিলো তার তুলনায় নেক লোকদের বসতী– যার দিকে সে যাচ্ছিলো– এক হাত কাছে। তখন আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে, একে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে। এ ব্যক্তি জান্নাতী।

হাদীসের মর্ম

উলামায়ে কেরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে– এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, যদিও ঐ ব্যক্তির ঘাড়ে একশ' লোকের খুনের দায় রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঐ নিহত ব্যক্তিদেরকে এই লোকের নিকট তাদের যে হক রয়েছে তা মাফ করে দেওয়ার জন্যে সম্মত করাবেন। কিন্তু এ পন্থা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন মানুষ এ সমস্ত হকের ক্ষতিপূরণের জন্যে পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে এবং তা পুরা করার পূর্বেই যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা এ পথ করে দিয়েছেন।

তাওবার নামায পড়ে তাওবা করার রহস্য

এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে–

> 'যদি গোনাহ সংঘটিত হয়, তাহলে অবিলম্বে তাওবার নিয়তে দু' রাকাআত নামায পড়ো এবং তাওবা করো। এভাবে তাওবা করায় বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে।
>
> ১. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ, নেক কাজ গোনাহসমূহকে দূর করে দেয়।
>
> ২. নামাযের পর তাওবা করলে মনোযোগ থাকবে। আর তাওবা কবুল হওয়ার জন্যে মনের একাগ্রতা জরুরী।

৩. নফসের জন্যে নামায পড়া কষ্টকর, তাই সে গোনাহ করতে ভয় পাবে যে, এ বিপদ ঘাড়ে নেওয়ার কী দরকার! বরং শয়তানও গোনাহ করানো ছেড়ে দিবে। কারণ,, সে দেখবে যে, আমি এর দ্বারা দশটি গোনাহ করালে সে বিশ রাকাআত নফল নামায পড়বে। গোনাহ তো তাওবার দ্বারা মাফ হয়ে যাবে, আর এ বিশ রাকআত তার কাছে উদ্বৃত্ত থেকে যাবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৬)

নেক কাজ গোনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়

হযরত বলেন যে, তাওবা করার জন্যে দু' রাকাআত নফল নামায পড়ার মধ্যে কয়েকটি ফায়দা রয়েছে। একটি ফায়দা এই যে, কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থাৎ, নেক কাজ গোনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। গোনাহ দ্বারা এখানে সগীরা গোনাহ উদ্দেশ্য। যেমন, কোন সগীরা গোনাহ আপনার দ্বারা সংঘটিত হলো, আর আপনি অযু করলেন তো এই অযুর ফলে সে গোনাহ মাফ হয়ে যাবে বা আপনি নামায পড়লেন, ফলে তা মাফ হয়ে যাবে। কারণ, নেক কাজ গোনাহসমূহকে বিলুপ্ত করতে থাকে। তাই তাওবার নিয়তে যখন দু' রাকাআত নফল নামায পড়বে, তখন সগীরা গোনাহতো আপনা আপনি মাফ হয়ে যাবে।

নামাযের পর মনোযোগ থাকে

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, নামাযের পর তাওবা করলে মনোযোগ থাকে। তখন মন নরম থাকে, বিনীত থাকে। আর তাওবার জন্যে মনোযোগ একটি জরুরী জিনিস।

শয়তান গোনাহ করাতে ভয় পাবে

তৃতীয় লাভ এই যে, শয়তান ভবিষ্যতে গোনাহ করাতে ভয় পাবে। শয়তান চিন্তা করবে যে, আমি তার দ্বারা গোনাহ যদি করাইও, তখন সে দু' রাকাআত নামায পড়ে তাওবা করবে। ফলে তাওবার কারণে তার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে, আর দু' রাকাআত নামায তার লভ্যাংশ হিসেবে থেকে যাবে। তাই শয়তান চিন্তা করবে যে, তার দ্বারা গোনাহ না করানোই ভালো। এজন্যে থানভী (রহ.) বলেন যে, যখনই কোন গোনাহ সংঘটিত হবে, তখনই তাওবার নিয়তে দু রাকাআত নামায পড়ে তাওবা করে নিবে। আল্লাহ তাআলা দয়া করে এ সমস্ত

কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থেকে জীবন কাটানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুগত জীবন যাপন করা

দেখুন, যে নাফরমানীর জীবন যাপন করে সেও বেঁচে থাকে, আর যে ফরমাবরদারীর জীবন যাপন করে সেও বেঁচে থাকে। যারা ফরমাবরদারীর জীবন যাপন করে, তারা ফরমাবরদারীর কারণে মরে যায় না। বরং দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এটাই চোখে পড়বে যে, যারা ফরমাবরদারী করে, তারাই প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানো, যখন তোমাদেরকে আহ্বান করেন সেই কাজের দিকে, যার মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে।'

তাই প্রকৃত জীবন তো সেটাই, যা তাঁদের আনুগত্যে অতিবাহিত হয়। আর যে জীবন তাদের নাফরমানীর মধ্যে অতিবাহিত হয়, তা দেখতে জীবন মনে হলেও বাস্তবে তা মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

জীবনের স্বাদ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত

বাস্তব সত্য এই যে, জীবনের স্বাদ ও উপভোগ তারাই লাভ করে, যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং ফরমাবরদারীর মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। আর গোনাহের জীবন, তা বাহ্যত মজার জীবন বলে দেখা গেলেও বাস্তবে তার মধ্যে শান্তি নাই। তা জীবনের খোলস মাত্র। দুনিয়ার খোলস সর্বস্ব জীবনের ভোগ-বিলাসে মত্তরা আত্মহত্যা করে জান দিচ্ছে। কারণ, হাজারো ভোগ-বিলাসের পরও তারা মনের শান্তি পাচ্ছে না। মনের শান্তি কীভাবে লাভ হয়? এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

'মনের প্রশান্তি আল্লাহর যিকির দ্বারা লাভ হয়।' (সূরা রাদ : ২৮)

বিধায় শান্তির জীবন, সুখের জীবন, নিরাপত্তা, আরাম ও মজার জীবন তো ঐটাই, যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যে অতিবাহিত হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদের শান্তি ও সুখের জীবন দান করুন। আমীন।

সূচিপত্র

দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ - يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ - اَللّٰهُمَّ إِنَّا
نَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ
بِكَ - اَللّٰهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا
فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ - اَللّٰهُمَّ إِنَّا
نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ - بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

উনআশিতম মজলিস

গোনাহের বিনাশক ঃ তাওবা

গোনাহের প্রতিষেধক : তাওবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা

এই 'আনফাসে ঈসা' কিতাবে সম্মুখে তাওবার বর্ণনা রয়েছে। তাওবা সম্পর্কে অনেক কথাই হযরত থানভী (রহ.) এখানে বর্ণনা করেছেন। একথাগুলো খুবই উপকারী। এ আলোচনা আমাদের অবস্থারও অনুকূল। কারণ, পবিত্র রমাযান মাস আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস। এ মাসেরও সদ্ব্যবহার তখনই হবে, যখন মানুষ এ পবিত্র মাসে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা করবে এবং ভবিষ্যত জীবনে নিজেকে মহান আল্লাহর হুকুমের অধীন চালানোর জন্যে নতুন সংকল্প করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো।' (সূরা বাকারা : ১৮৩)

মাসব্যাপী এই সাধনা-কোর্সের মূল উদ্দেশ্য হলো, অন্তরে তাকওয়া পয়দা করা। তাকওয়া পয়দা করার অর্থ হলো, মানুষের অন্তরে এই ফিকির পয়দা হওয়া যে, অতীতে যত গোনাহ আমার দ্বারা হয়েছে সেগুলো থেকে তাওবা করবো এবং ভবিষ্যতের জন্যে সংকল্প করবো যে, আগামীতে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন অতিবাহিত করবো। এজন্যে তাওবার এ আলোচনা আমাদের

গোনাহ যেন নিরাশা সৃষ্টি না করে

এ মালফূযের মাধ্যমে হযরত থানভী (রহ.) বলতে চান যে, গোনাহ মারাত্মক হোক বা অধিক হোক এর কোনটাই যেন তোমার মধ্যে নিরাশা সৃষ্টি না করে। অর্থাৎ, যত বড় গোনাহই করে থাক বা যত অধিক গোনাহই করে থাক, এমনকি আসমান ও যমীনের খালি জায়গাও যদি গোনাহ দিয়ে ভরে থাকো এরপর যদি মাফ চাও তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে, আমি মাফ করে দেবো। পরিষ্কার ভাষায় কুরআনে কারীমের মধ্যে তিনি বলেন−

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

অর্থাৎ, হে আমার ঐ সমস্ত বান্দা! যারা নিজেদের জানের উপর জুলুম করেছো, অর্থাৎ, গোনাহ করেছো, নাফরমানী করেছো, কুফুরী, শিরক এবং বিদআতে লিপ্ত হয়েছো− আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেন? কারণ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সমস্ত গোনাহ মাফ করে থাকেন। এরচেয়ে অধিক স্পষ্ট আর কী হবে?

শয়তান নিরাশা সৃষ্টি করে

শয়তান মানুষকে এভাবে বিপথগামী করে যে, সে মানুষের মনে একথা জাগিয়ে দেয় যে, তুই মরদূদ ও বিতাড়িত হয়ে গেছিস। তুই এতো মারাত্মক গোনাহ করেছিস এবং এত বেশি গোনাহ করেছিস যে, তোর মুক্তির আর কোন পথ নেই। তাই তুই এখন যে গোনাহ ইচ্ছা কর। এভাবে তাকে বিপথগামী করে। আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তোমার দ্বারা যেমন গোনাহই হয়ে থাক এবং যত গোনাহই হয়ে থাক, তুমি আমার কাছে ফিরে আসো।

বার বার তাওবা ভঙ্গ হওয়া

অনেক সময় এই চিন্তা হয় যে, আমরা তাওবা তো করি, কিন্তু সেই গোনাহ তো আবারো সংঘটিত হয় এবং তাওবা ভেঙ্গে যায়। পুনরায় তাওবা করি, আবার তা ভেঙ্গে যায়। বারবার এমন হতে থাকে। এর ফলে মনের মধ্যে নিরাশা জাগতে থাকে যে, আমার সংশোধনের কোন আশা নেই। কারণ, আল্লাহর নেক বান্দাগণ তাওবা করে তার উপর দৃঢ়পদ থাকেন। কিন্তু আমি তাওবা করলে তা ভেঙ্গে যায়। পুনরায় তাওবা করি, পুনরায় ভেঙ্গে যায়।

ভালো করে বুঝুন যে, এটাও নিরাশার কথা নয়। তাওবার উপর অবিচল থাকার চেষ্টাতো অবশ্যই করতে হবে এবং গোনাহ করার দুঃসাহস করা যাবে না। এরপরও যদি গোনাহ হয়ে যায় তো আবারও তাওবা করবে। আবার ভুল হলে আবার তাওবা করবে। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন−

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবাকারী এবং উত্তমভাবে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সূরা বাকারা : ২২২)

এ আয়াতে "اَلتَّوَّابِيْنَ" শব্দ আনা হয়েছে, অথচ তাওবাকারীকে "تَائِبٌ" বলা হয়। তাই "تَائِبِيْنَ" শব্দ আনার কথা ছিলো। কিন্তু এখানে تَوَّابِيْنَ শব্দ আনা হয়েছে। এর কারণ হলো, এটা 'মুবালাগা'র (আধিক্যবোধক) শব্দ। তাই এর অর্থ হলো অধিক হারে তাওবাকারীগণ, বেশি বেশি তাওবাকারীগণ।

বার বার তাওবা করার প্রয়োজন কী?

মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে, কোন মানুষ দ্বারা যখন গোনাহ সংঘটিত হলো এবং সে ঐ গোনাহ থেকে তাওবা করে মুক্ত হয়ে গেলো, আল্লাহ তাআলার কাছে সব গোনাহ মাফ চেয়ে নিলো এবং তার উপর সে অটল থাকলো, তাহলে তার পুনরায় তাওবা করার প্রয়োজনটা কী? আর যখন পুনরায় তাওবা করবে না তখন সে বার বার তাওবাকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং এই ফযীলতও সে পাবে না? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ আয়াতের মধ্যে আলোচনাই করা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক সম্পর্কে, যাদের দ্বারা একবার ভুল হয়েছে তো তারা তাওবা করেছে। পুনরায় ভুল হয়েছে, পুনরায় তাওবা করেছে। আবার ভুল হয়েছে তো আবার তাওবা করেছে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে।

অতএব এ আয়াতের تَوَّابٌ শব্দই একথা বুঝাচ্ছে যে, নিজের পক্ষ থেকে তো পাকাপোক্ত তাওবা করো এবং সে তাওবার উপর অবিচল থাকার পরিপূর্ণ চেষ্টা করো, কিন্তু আবারো কোথাও না কোথাও তোমার পদস্খলন ঘটবে, কিন্তু তখন ঘাবড়াবে না এবং নিরাশ হবে না। বরং আবারো আমার নিকট ফিরে আসবে। কারণ, 'তাওবা' শব্দের অর্থই হলো, ফিরে আসা এবং প্রত্যাবর্তন করা। বিধায় এ আয়াতের অর্থ এই হলো যে, আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত লোককে পসন্দ করেন, যারা অধিক হারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসে। তাই নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং ভুল হলে আবার ফিরে আসো। আবার ভুল হলে আবার ফিরে আসো।

তাওবার ফলে গোনাহ কম হতে থাকবে

শুধু এতটুকু বিষয়ে গুরুত্বারোপ করবে যে, কোন গোনাহ যেন তাওবা ছাড়া না থাকে এবং গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করতে বিলম্বও করবে না।

গোনাহ হওয়া মাত্র তাওবা করবে। অবিলম্বে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। নিয়মিত এ আমল করতে থাকলে এই গোনাহ এবং পদস্খলন কম হতে থাকবে। কারণ, যখন আল্লাহ তাআলা দেখবেন যে, এ আমার দিকে বার বার ফিরে আসে, তখন তিনি এমন সমস্ত উপকরণ তৈরি করে দিবেন যে, তারপর ইনশাআল্লাহ পদস্খলনও কম হতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের জন্যে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই একই শব্দ বান্দাদের জন্যেও ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, 'আল্লাহ তাআলা বান্দার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মনোযোগী হন, যেন বান্দারা তাওবা করে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে'। আল্লাহ তাআলার নিয়ম এটাই যে, যে বান্দা বার বার আল্লাহর দিকে ফেরে এবং ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তাআলা তার হেফাযত করেন। তাকে পদস্খলিত হতে দেন না। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে–

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ

অর্থ: যে বান্দা গোনাহ থেকে ইস্তিগফার করতে থাকে সে গোনাহের ব্যাপারে হঠকারী বলে গণ্য হয় না। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫৫৪)

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে 'ইস্তিগফার' রূপে এক 'বিষনাশক' দান করেছেন যে, যখনই নফস ও শয়তান তোমাকে দংশন করবে, তখনই এই বিষনাশক ব্যবহার করবে। অর্থাৎ, ইস্তিগফার করবে এবং তাওবা করবে। বিধায় যতবারই ভুল হয়ে থাক না কেন এর কারণে ঘাবড়াবে না এবং নিরাশ হবে না, বরং আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

অন্তর ময়লা হলে তাকে ধোলাই করাও

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর এক মুরীদ হযরতকে বলেন যে,

> হযরত! আমরা যখন আপনার মজলিসে বসা থাকি, তখন খুব বেশি রূহানিয়াত এবং লিল্লাহিয়াত অনুভূত হয়। আর যখন মজলিস ছেড়ে উঠে যাই, তখন আবার সেই দুনিয়ার ঝামেলা আরম্ভ হয়ে যায়। তাওবা করার পরও এবং ইস্তিগফার করার পরও আবারও গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাই।

সূচিপত্র

উত্তরে হযরত বলেন যে, তোমরা যখন পরিষ্কার কাপড় পরো, তখন সব সময় এ কাপড় পরিষ্কারই থাকে, নাকি এক সময় তা ময়লা হয়ে যায়? সে উত্তরে বললো যে, এক সময় তা ময়লা হয়ে যায়। হযরত জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন ময়লা হয়ে যায় তখন তোমরা কী করো? লোকটি উত্তরে বললো যে, সেটা ধোপাকে দেই। সে ধোলাই করে দিলে পুনরায় তা পরিষ্কার হয়ে যায়। হযরত বললেন, আমিও ধোপা। তোমাদের কাপড় যখন ময়লা হবে, আমার কাছে চলে আসবে, কাপড় ধোলাই করাবে এবং আবার পাক-সাফ হয়ে যাবে।

তাওবা মূলত: গোনাহের ময়লাকে ধুয়ে দেয়। একবার ময়লা লাগলে তাওবা করো। পুনরায় লাগলে পুনরায় তাওবা করো। তবে কাপড় যত ধোলাই করবে, তা তত দুর্বল হতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে তা ফেটে যাবে। আর গোনাহের ময়লা অন্তর থেকে যত ধুবে, ততই অন্তর মজবুত হবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার মধ্যে শক্তি আসবে। তখন ইনশাআল্লাহ গোনাহের সংখ্যাও কমতে থাকবে এবং তার তীব্রতাও কমতে থাকবে।

একটি সুন্দর দু'আ

হাদীস শরীফে এসেছে যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ভাষায় দু'আ করেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاءُوْا اسْتَغْفَرُوْا

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা কোন ভালো কাজ করলে আনন্দিত হয় এবং কোন ভুল হয়ে গেলে ইস্তিগফার করে।

লক্ষ্য করুন, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে চেয়ে নিচ্ছেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন বানিয়ে দিন। এটা যদি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় যে, প্রত্যেক ভুলের সময় আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, ইস্তিগফার করে, তাহলেই সফলতার দরজা খুলে গেলো। তখন ইনশাআল্লাহ সফলতা তার পদচুম্বন করবে।

আমার সব গোনাহ গোল্লায় যাক

হযরত বাবা নাজম আহসান সাহেব নামে আমাদের এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি অনেক উঁচু মানের কবিতা রচনা করতেন। তাঁর এক কবিতায় তিনি বলেন–

دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی - ایسی تیسی میری گناہوں کی

এ কবিতার মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা যখন গোনাহের জন্যে লজ্জিত হওয়ার দৌলত দান করেছেন এবং অন্তর থেকে আক্ষেপের গরম বাতাস বের হচ্ছে যে, হায়! আমার দ্বারা এ কী হলো এবং তাওবার তাওফীক হলো, তাহলে সব গোনাহ গোল্লায় গেলো।

মোটকথা, একবার বসে আল্লাহ তাআলার কাছে সংক্ষেপে তাওবা করে নাও। তারপর পাকাপোক্ত নিয়ত করো যে, হে আল্লাহ! নিজ ইচ্ছায় আর গোনাহ করবো না। হে আল্লাহ! আমি ইচ্ছা তো করছি, কিন্তু এই ইচ্ছার উপর অবিচল থাকা আপনার তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়। তাই হে আল্লাহ! অবিচল থাকার তাওফীকও আপনিই আমাকে দান করুন।

আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলো

আমার শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, আল্লাহ তাআলার সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা বলতে থাকো। এভাবে বলো যে, হে আল্লাহ! আমি তাওবাতো করেছি এবং আমার তরফ থেকে পরিপক্ক সংকল্পও করেছি, কিন্তু এই তাওবার উপর অবিচল থাকা আপনার তাওফীক ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই হয় আপনি আমাকে এর উপর অবিচলতা দান করুন, নতুবা কিয়ামতের দিন এ বিষয়ে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। এরপর চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন সময় পদস্খলন ঘটে তাহলে তাওবা করে নিবে। ইস্তিগফার করবে। সারা জীবন এমনটিই করতে থাকো। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার রহমতের কাছে আশা রয়েছে যে, ঘাঁটি পার হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার দয়ায় আমাকেও এবং আপনাদের সকলকেও এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আশিতম মজলিস

তাওবার পরিপূর্ণতার জন্যে গোনাহ ছাড়ার সংকল্প করা

তাওবার পরিপূর্ণতার জন্যে গোনাহ ছাড়ার সংকল্প করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

কয়েক দিন ধরে তাওবার বয়ান চলছে। আত্মশুদ্ধির পথে সর্বপ্রথম ধাপ হলো, পরিপূর্ণ তাওবা করা। সামনের এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'তাওবার সময় যদি আগামীতে গোনাহ ত্যাগ করার সংকল্প না থাকে, তবে ভবিষ্যতে ঐ গোনাহ করার সংকল্পও যেন না থাকে। বরং গোনাহ করার সংকল্প থেকে মন যেন খালি থাকে। এভাবে খালি মনেও যদি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে তাহলেও তাওবা বিশুদ্ধ হবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৭)

তাওবা পরিপূর্ণ হওয়ার তিনটি শর্ত

এ মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) অল্প কথায় অনেক বড় বিষয় আলোচনা করেছেন। এতে আমাদের মত দুর্বলদের জন্য অনেক বড় সান্ত্বনার উপকরণ রয়েছে। তাওবার বিষয়ে সকল আল্লাহর ওলীই বলেন যে, তিনটি জিনিস দ্বারা তাওবা পরিপূর্ণ হয়। প্রথম জিনিস এই যে, যে গোনাহ সংঘটিত হয়েছে, অন্তর থেকে তার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে। দ্বিতীয় হলো, অবিলম্বে ঐ গোনাহ পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন, এক ব্যক্তি মিথ্যা বলে, এখন সে যদি ঐ মিথ্যা থেকে তাওবা করতে চায় তাহলে প্রথমে অনুতপ্ত হতে হবে যে, আমার দ্বারা এমন ভুল হয়ে গেছে, আমি মিথ্যা বলেছি, এই অনুতাপের সাথে সাথে মিথ্যা বলা

পরিত্যাগ করতে হবে। তৃতীয় হলো, আগামীর জন্য সংকল্প করতে হবে যে, আমি ভবিষ্যতে কখনো এ কাজ করবো না, যখন এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় ঘটে তখন তাওবা পরিপূর্ণ হয়।

তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ

প্রথম দুই বিষয় অর্থাৎ, গোনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং ঐ গোনাহকে পরিত্যাগ করা এ দুটির উপর সাধারণত আমল হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে কোন সংশয় সৃষ্টি হয় না, কিন্তু তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ, আগামীর জন্য পরিপক্ক সংকল্প করা যে, ভবিষ্যতে আর কখনোই এই গোনাহের কাছে যাবো না। এই সংকল্প পরিপূর্ণ হলো কি হলো না, এ ব্যাপারে সাধারণত সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প করা তাওবার আবশ্যকীয় অঙ্গ হওয়ার ফলে তখন তাওবার মধ্যেই সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়। আর সংশয়পূর্ণ তাওবার দ্বারা গোনাহ মাফ হয় না। কারণ, বিশুদ্ধ তাওবার উপরেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গোনাহ মাফ হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। তাই তাওবা বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যেখানে সন্দেহ হচ্ছে, তখন গোনাহ মাফ হওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ থাকবে। যাইহোক, এই তৃতীয় বিষয়ে সচারাচর এ ধরনের চিন্তা জাগ্রত হয়।

রাতে ঘুমানোর পূর্বে তাওবা করে নাও

আমাদের বুযুর্গ হযরত বাবা নাজম আহসান সাহেব (রহ.) তাওবার ব্যাপারে খুব জোর দিতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে গেলাম। সে সময় এক যুবক কোন এক কাজে তাঁর কাছে এসেছিল। ঐ যুবকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দ্বীনদারীর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। হযরত বাবা সাহেব (রহ.)-এর নিয়ম এই ছিল যে, যে কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে এলে তিনি দ্বীনের কোন না কোন কথা তাকে শুনিয়ে দিতেন। সে যে উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন। সেমতে ঐ যুবক যখন ফিরে যেতে চাইলো তখন তিনি তাকে বললেন যে,

'বেটা! একটি কথা শুনে যাও, তা এই যে, মানুষ দ্বীনকে খুব মুশকিল মনে করে, তারা মনে করে যে, দ্বীনের উপর আমল করা খুব কঠিন। আরে কিছু কঠিন না। শুধুমাত্র রাতে ঘুমানোর পূর্বে অল্প সময় বসে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে।'

সে ছিল যুবক ছেলে, নামায, রোযা কিছুই করতো না। কিন্তু হযরত তার কানে এ কথাটি দিয়ে দিলেন যে, শুধু তাওবা করবে।

আল্লাহওয়ালাগণ মানুষদেরকে কাছে টানেন

নতুন কোন মানুষ হলে সে এ ঘটনা দেখে বুঝবে যে, হযরত তাকে খোলা অনুমতি দিয়ে দিলেন, তোমার যা ইচ্ছা করতে থাকো, নামাযও পড়ো না, রোযাও

রেখো না। সব গোনাহ করতে থাকো, তবে রাতে বসে তাওবা করে নিবে, এভাবে ছেড়ে দেওয়া তার জন্য কি করে ঠিক হলো?

আসল কথা এই যে, আল্লাহ তার যেসব বান্দাকে জ্ঞান দান করেন, তারা মানুষদেরকে শিকার করে থাকে। শিকার করার জন্য যেমন, দানা দেয়া হয়, তাদেরও শিকার করার একটি পদ্ধতি রয়েছে। কারণ, ঐ যুবককে যদি তিনি বলতেন যে, তুমি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, এই শরীয়ত বিরোধী পোশাক পরিত্যাগ করবে এবং দাড়ি মুণ্ডানো ত্যাগ করবে তাহলে প্রথম দিনেই ঐ যুবক ভেগে যেতো আর কখনো ফিরে আসতো না। এজন্য হযরত তাকে শুধু একটি কথা বললেন যে, রাতে বসে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে।

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে দিলেন

আসল কথা হলো, এই যুবক যদি এ কথার উপর আমল করে এবং প্রত্যেক দিন আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করতে থাকে, তাহলে এর ফলে আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কারণ, এ পর্যন্ত সে গাফলতের মধ্যে ছিল, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন ছিল। তার অন্তরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা.) চিন্তাও আসতো না। এখন যখন সে তাওবা করবে, তখন সে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়লো। আর প্রতিদিন যখন এর উপর আমল করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের দিকে টেনে না নিয়ে পারবেন না। কারণ, কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

সাধারণত এ আয়াতের তরজমা এরূপ করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান নিজের দিকে টেনে নেন এবং নির্বাচিত করেন অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর যে বান্দাকে হেদায়াত দেয়ার ইচ্ছা করেন এবং নৈকট্য দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি নিজের দিকে টেনে নেন। সাধারণত এ আয়াতের এই তরজমা করা হয়।

আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ

কিন্তু আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, আরবী ভাষাবিদগণকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে যে, এই আয়াতের এ তরজমাও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে নিজের দিকে টেনে নেন, যে চায় যে, আমাকে টেনে নেওয়া হোক। কারণ, يَشَآءُ শব্দের কর্তা সর্বনামটি

সূচিপত্র

اَللّٰهُ এর দিকে যেমন ফিরতে পারে তেমনি مَنْ শব্দের দিকেও ফিরতে পারে। এমনিভাবে يَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ এর অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে।

আল্লাহ তাআলা অবশ্যই টেনে নিবেন

তাই যখন একজন বান্দা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে নিলো। চাই তা অল্প সময়ের জন্যই হোক। আর শুধু বললো যে, হে আল্লাহ! আমি তাওবা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার কাছে টেনে নিন। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই টেনে নিবেন। মোটকথা, বান্দার কাজ এই যে, আল্লাহর দিকে সামান্য প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কেন মাহরূম করছেন। আমাকেও আপনার কাছে টেনে নিন। হে আল্লাহ! আমার মধ্যে আপনার কাছে পৌঁছার শর্তসমূহ না থাকলে ঐ সমস্ত শর্ত আমার মধ্যে পয়দা করে দিন। আমার মধ্যে যদি সে চাহিদা ও গুণাবলী না থেকে থাকে তাহলে হে আল্লাহ! ঐ চাহিদা এবং গুণাবলী আমার মধ্যে সৃষ্টি করা আপনার ক্ষমতায় রয়েছে। হে আল্লাহ! ঐ সমস্ত গুণ এবং চাহিদা আমার মধ্যে পয়দা করে দিন। এভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাকো। একবার যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়বে, তো এটাই হবে জীবনের পরিবর্তনের সূচনা বিন্দু।

যে ব্যক্তি গাফলতের জীবনযাপন করছে, তার না আছে আল্লাহর চিন্তা, না রাসূলের চিন্তা, না নামাযের চিন্তা, না রোযার চিন্তা, না আখেরাতের চিন্তা, না দ্বীনের চিন্তা। এমন এক ব্যক্তিকে হযরত বলছেন যে, তুমি রাতে বসে তাওবা করে নিবে। ঐ ব্যক্তি যদি এর উপর আমল করে থাকে তাহলে আল্লাহর দিকে এবং দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করা অসম্ভব। যাইহোক, অন্যদের ইসলাহের জন্যে আল্লাহওয়ালাগণ এমন সব পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। একইভাবে হযরত বাবা সাহেব ঐ যুবকের কানে এই কথা দিয়ে দিলেন, আর সে চলে গেলো।

সংকল্প সম্পর্কে আমার মনের একটি প্রশ্ন

হযরত বাবা সাহেবের কাছে নিবেদন করি যে, হযরত! আমার মনে তাওবা সম্পর্কে এই প্রশ্নটি জাগে যে, তাওবা তো আমি করলাম, কিন্তু সে তাওবা কবুল হলো, কি না তার কি জানি? কারণ, গোনাহ ছাড়ার যে সংকল্প আমি করলাম তা পরিপক্ক হলো কি না তাই তো জানি না। আল্লাহ তাআলাকে একথা তো বলেছি

যে, হে আল্লাহ! আমার দ্বারা গোনাহ হয়েছে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঐ গোনাহ ছেড়েও দিয়েছি। সারা জীবনে আর ঐ গোনাহের কাছেও যাবো না এ সংকল্প পাকা হলো, কি হলো না, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। অথচ এই সংকল্প তাওবার তৃতীয় শর্ত। যখন এই শর্ত পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলো, তখন তাওবা সঠিক হওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ রয়ে গেলো।

ভবিষ্যতে গোনাহ হওয়ার আশংকা সংকল্পের পরিপন্থী নয়

হযরত বাবা নাজম আহসান সাহেব (রহ.) আমার কথা শুনে বললেন যে, আরে ভাই! তুমি তো তোমার মনের মধ্যে সংকল্পের অনেক লম্বা-চওড়া মাপকাঠি বানিয়ে রেখেছো। আরে ভাই! সংকল্পের অর্থতো হলো, নিজের পক্ষ থেকে ইচ্ছা করবে যে, আমি এ কাজ পুনরায় করবো না। এরপর যদি মনের মধ্যে এ সমস্ত সন্দেহ, সংশয় ও শঙ্কা সৃষ্টি হতে থাকে যে, জানি না আমি এ সংকল্পের উপর অবিচল থাকতে পারবো কিনা? আমি এ সংকল্প পুরা করতে পারবো কিনা? এ সমস্ত সংশয় ও শংকা সংকল্প বিশুদ্ধ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

যেমন, নিজের পক্ষ থেকে সংকল্প করলো যে, হে আল্লাহ! আমি আর মিথ্যা বলবো না। গীবত করবো না। কুদৃষ্টি করবো না। এখন সংকল্প করার পর মনের মধ্যে সংশয় জাগছে যে, জানিনা এ সংকল্পের উপর অবিচল থাকতে পারবো কি না? এরূপ সংশয় আসে আসুক। এ সংশয় সংকল্প পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধক নয়। এতেই সংকল্প পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

অত:পর আল্লাহ তাআলার নিকট অবিচলতা কামনা করো

এরপর আল্লাহ তাআলাকে বল যে, হে আল্লাহ! আমি তো সংকল্প করেছি, তবে আমার বুঝে আসছে না যে, আমি এই সংকল্পের উপর কিভাবে কায়েম থাকবো। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন। আপনি আমাকে অবিচলতা দান করুন। আপনি আমাকে এই সংকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। তাহলেই তাওবা পরিপূর্ণ হবে। কারণ, সংকল্পের অর্থ এই যে, নিজের থেকে ইচ্ছা করা, তবে ঐ ইচ্ছার উপর কতটুকু কায়েম থাকতে পারবো আর কতটুকু পরবো না, তার ভবিষ্যতবাণীতো কেউ করতে পারবে না। এটা মানুষের ক্ষমতাভুক্ত নয়। এটা ক্ষমতার বাইরের জিনিস। আর যেহেতু এটা ক্ষমতা বহির্ভূত; তাই এটা মানুষের দায়িত্বও নয়। কারণ, মানুষ তার ক্ষমতাধীন বিষয়েই দায়িত্বশীল। হযরত বাবা সাহেব এমন কথা বলেছেন যে, তার দ্বারা অনেক প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ।

গোনাহ্ করার সংকল্প থেকে মন খালি থাকতে হবে

পরবর্তীতে হযরত থানভী (রহ.)-এর এই মালফুয চোখে পড়লো, যার মধ্যে সেই কথাই হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, যা হযরত বাবা সাহেব বলেছেন। তিনি বলেন যে–

> "তাওবার সময় যদি ভবিষ্যতে গোনাহ পরিত্যাগ করার সংকল্প না থাকে, তবে ভবিষ্যতে গোনাহ করার সংকল্পও যাতে না থাকে। বরং গোনাহ করার সংকল্প থেকে মন খালি থাকতে হবে। এমন খালি মনেও যদি অনুতাপের সাথে তাওবা করা হয়, তাহলেও তাওবা বিশুদ্ধ হবে।"

অর্থাৎ, আসল কথা হলো এই যে, তাওবার সময় গোনাহ না করার ইচ্ছা থাকতে হবে যে, আমি ভবিষ্যতে কখনো কোন মূল্যেই গোনাহ করবো না। তবে কোন কারণে যদি এই ইচ্ছা মনে হাজির না থাকে তাহলে কমপক্ষে ঐ গোনাহ পুনরায় করার ইচ্ছাও যেন না থাকে। বরং গোনাহ করার সংকল্প থেকে মন যেন মুক্ত থাকে। অর্থাৎ, গোনাহ্ করার ইচ্ছাও থাকবে না এবং না করার ইচ্ছাও থাকবে না। উভয় ইচ্ছা থেকে মন খালি থাকলেও তাওবা সঠিক হবে। কেন সঠিক হবে?

অনুতাপের নামই তাওবা

হযরত থানভী (রহ.) নিজের থেকে একথা বলেননি, এর পিছনে দলিল রয়েছে। এর দলিল হিসাবে তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন–

اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ (مسند احمد ج ١ ص ٣٧٦)

অর্থাৎ, তাওবার আসল উপাদান এবং মূল জিনিস, যার দ্বারা তাওবা অস্তিত্ব লাভ করে তা হলো, অনুতাপ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সামনে লজ্জিত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়া এবং অনুশোচিত হওয়া। বলাবাহুল্য যে, যে ব্যক্তি তার গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হবে, তার অন্তরে একথা থাকবে যে, হে আল্লাহ! আমি এ কাজ পুনরায় করতে চাই না। এই অনুতাপের ফলে তাওবা বিশুদ্ধ হবে। তাওবা যখন বিশুদ্ধ হবে, তখন ইনশাআল্লাহ ঐ গোনাহও মাফ হয়ে যাবে। এখন আর এই সংশয়ে পড়ো না যে, সংকল্প পুরা হলো কি হলো না তা তো জানি না।

তাওবার পর এই দু'আ করো

তবে প্রত্যেক তাওবার পর এই দু'আ অবশ্যই করো যে, 'হে আল্লাহ! আমি তাওবা তো করলাম, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাওফীক না দিবেন, ততক্ষণ

পর্যন্ত আমি এ তাওবার উপর কায়েম থাকতে পারবো না। হে আল্লাহ! দয়া করে, এ তাওবার উপর কায়েম থাকার তাওফীক আপনিই দান করুন। ধরে নেও যে, আবারো যদি ভুলক্রমে, কখনো গোনাহ হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় তাওবা করো। কারণ, আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। তাই ভুল হয়ে গেলে পুনরায় ফিরে আসো।

তাওবা করার ভরসায় গোনাহ্ করো না

তবে কোন ব্যক্তি যেন একথার দ্বারা এরূপ না বুঝে যে, তাওবার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। তাই গোনাহ করতে থাকো আর তাওবা করতে থাকো এবং গোনাহের ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে যাও। এটা ঠিক নয়, বরং গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য নিজের সামর্থ্য অনুপাতে পুরোপুরি চেষ্টা করতে হবে। কোন মানুষ যদি– আল্লাহ না করুন– গোনাহের ব্যাপার নির্ভিক হয়ে যায় এবং তাওবা করার উপর ভরসা করে গোনাহে লিপ্ত হয় তাহলে তা বড়ই বিপজ্জনক বিষয়। এটি শয়তানের মারাত্মক বিপজ্জনক ও বিষাক্ত ফাঁদ। তাওবা করার উপর ভরসা করে গোনাহে লিপ্ত হওয়া এমনই, যেমন বিষ নাশকের উপর ভরসা করে বিষপান করা।

বিচ্ছু দংশন করার তদবীর

আমার ওয়ালিদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য তাঁর একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন যে, দেওবন্দে অনেক সাপ-বিচ্ছু থাকত। নিত্যদিন এগুলো মানুষকে দংশন করত। যে কারণে সেখানে সাপ-বিচ্ছু দংশন করার অনেক তদবীর প্রচলিত ছিল। সেই তদবীরগুলো করলে বিষ নেমে যেত। হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.)ও বিচ্ছু দংশন করার পর তার বিষ নামানোর একটি তদবীর শিখেছিলেন। কাউকে কিছু দংশন করলে হযরত ওয়ালিদ সাহেব ঐ তদবীর করলে অবিলম্বে তার ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে যেত এবং বিষ নেমে যেত। তাই মানুষ অনেক দূরের পল্লী থেকে ওয়ালিদ সাহেবের কাছে রোগী নিয়ে আসত। তিনি দম করে দিতেন আর তার ব্যথা ভাল হয়ে যেত। হযরত ওয়ালিদ সাহেবের এই তদবীরের কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

বিচ্ছু দংশনের একটি ঘটনা

হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.)-এর ঘরে একটি কুঠুরি ছিল। সেটি স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহৃত হত। সে যুগে বিদ্যুৎ ছিল না। লণ্ঠনের যুগ ছিল। একদিন আমার

মা ঐ কুঠুরি থেকে একটি জিনিস বের করতে চাচ্ছিলেন। ঘরে একটিমাত্র লণ্ঠন ছিল। হযরত ওয়ালিদ সাহেব ঐ লণ্ঠনের আলোতে লেখাপড়ার কাজ করছিলেন। আমার মা ওয়ালিদ সাহেবকে বলেন যে, আমি একটু কুঠুরিতে যাবো, লণ্ঠনটি অল্প সময়ের জন্য আমাকে দিন, অমুক জিনিসটা নিয়ে আসি। হযরত ওয়ালিদ সাহেব লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই লণ্ঠন দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন যে, এটি তো ছোট একটি জিনিস, লণ্ঠন ছাড়াই নিয়ে এসো। আমার আম্মা বললেন যে, 'জিনিসটি তো সামনেই রাখা আছে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, অন্ধকারের মধ্যে আমি সেখানে পা রাখলে আমাকে বিচ্ছু দংশন না করে। তখন হযরত ওয়ালিদ সাহেবের মুখ দিয়ে একথা বের হয়ে যায় যে, 'আরে ভাই! বিচ্ছু কাটলে তাতে কি, আমার কাছে চলে আসবে, দম করে দিলে ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বিচ্ছু দংশন করার তো শুধু সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি দংশন করেও আমি তো তার তদবীর জানি, তদবীর করে দিবো।

সমস্ত তদবীর ব্যর্থ হলো

আল্লাহরই হুকুম যে, আমার আম্মা কুঠুরিতে ঢুকে পা রাখা মাত্র তাকে বিচ্ছু দংশন করে। হযরত ওয়ালিদ সাহেব বলেন যে, আমি অবিলম্বে উঠে তাঁর কাছে যাই এবং দ্রুত বিচ্ছু কাটার সেই তদবীর আরম্ভ করি। কিন্তু তাতে কোন কাজই হলো না। যে তদবীর দ্বারা শত শত বিচ্ছু কাটা রোগীর চিকিৎসা করলাম, সেই তদবীর আজো করেছি, কিন্তু কিছু মাত্র কাজ হচ্ছে না। তদবীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করলাম, কিন্তু বেদনার লহর কমছিল না। অবশেষে অন্যের দ্বারা চিকিৎসা করাতে বাধ্য হলাম। আমার সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হলো।

কোন তদবীর আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া কার্যকর নয়

এ ঘটনা শুনিয়ে তিনি বলতেন যে, দেখো, আমি এই আমলের উপর ভরসা করে বিচ্ছুর দংশন থেকে সতর্কতা অবলম্বন করি নাই। আমি চিন্তা করেছি যে, বিচ্ছু দংশন করলেও তাতে কি আসে যায়। আমার তো তদবীর জানাই আছে, কিন্তু এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা একটি শিক্ষা তো এই দান করলেন যে, যত রকমের চিকিৎসা আছে, তা ঔষধের চিকিৎসা হোক, বা আমল-তদবীরের চিকিৎসা হোক, কোন চিকিৎসাই ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুম না হয়। একই ঔষধ এক রোগীর উপকার করে, আরেক রোগীর ক্ষতি করে। অথচ উভয়ের রোগ একই।

সূচিপত্র

ঔষধ আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করে

ডা. হাশেমী সাহেব নামে আমার আব্বার একজন চিকিৎসক ছিলেন। তার বয়স ছিল আশি বছর। তিনি বলতেন যে, আমার সারা জীবনের ডাক্তারীর অভিজ্ঞতা এই যে, যখন ঔষধ রোগীর পেটের ভেতর যায়, তখন ভেতরে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে আল্লাহ! কী করবো?' উপকার করবো না বিরূপ প্রতিক্রিয়া করবো? যখন আল্লাহর কাছ থেকে উত্তর পায়, তখন সে কাজ করে। যাইহোক! হযরত ওয়ালিদ সাহেব বলতেন যে, এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তাআলা একটি শিক্ষাতো এই দেন যে, তোমরা যে নিজেদের তদবীরের উপর ভরসা করে বসে আছো। মনে রেখ, এসব তদবীরের মধ্যে কিছু নেই। কোন অযীফা, কোন তাবীজ, কোন ঝাড়-ফুঁক ঐ সময় পর্যন্ত কার্যকর হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হুকুম না হয়। কোন অযীফা এবং কোন তাবীজের উপর ভরসা করা আর এরূপ বলা যে, রোগ আসে আসুক আমার কাছে তো ঔষধ রয়েছে এটি ভুল কথা। এই ঘটনা একটি শিক্ষা তো এই দেয়-

ঔষধের উপর ভরসা করে অসুখকে দাওয়াত দিও না

দ্বিতীয় শিক্ষা এই দেয় যে, মানুষের কাছে যত উন্নত মানের চিকিৎসাই থাকুক না কেন ঐ চিকিৎসার উপর ভিত্তি করে অসুখকে ডেকে এনো না। বরং অসুখ থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাও এবং দু'আ করো যে, হে আল্লাহ! রোগ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যাইহোক! হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য এ ঘটনাটি শুনাতেন যে, তাওবার উপর ভরসা করে গোনাহ করা এমন, যেমন, কিনা তদবীরের উপর ভরসা করে বিচ্ছু দ্বারা দংশন করানো। ঔষধ আর তদবীর আছে বিধায় বিচ্ছু দ্বারা দংশন করাও! বিচ্ছু দংশন করার পর ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ পাবে কি পাবে না, তার কোন খবর আছে? তাছাড়া ঔষধ ব্যবহারের সুযোগ পেলেও তা কার্যকর হবে কি-না তার কী নিশ্চয়তা আছে?

তাওবার সুযোগ লাভ হবে কি না

একইভাবে যখন তুমি তাওবার উপর ভরসা করে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করছো, তখন গোনাহের পর তাওবার সুযোগ পাবে কি-না, তা কি তোমার জানা আছে? এ কথার কী নিশ্চয়তা আছে যে, গোনাহের পর তাওবা করার সুযোগ অবশ্যই পাবে? আর যদি তাওবার সুযোগ পেয়েও যাও, তখন তাওবার তাওফীক

হবে কি-না জানা আছে? কারণ, গোনাহের মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে, সেই অকল্যাণ এই যে, গোনাহ মানুষের ভিতর আল্লাহর বিষয়ে উদাসীনতা সৃষ্টি করে। মানুষকে উদাসীন বানিয়ে দেয়। তুমি তো একথা চিন্তা করে গোনাহ করছো যে, পরে আমি তাওবা করে নিবো। কিন্তু গোনাহ তার অকল্যাণ দেখাল, তোমার মনের মধ্যে গাফলত সৃষ্টি করে দিল। ফলে গোনাহের স্বাদের মধ্যে তুমি এমন বিভোর হয়ে পড়লে যে, তাওবা করার চিন্তাই জাগলো না এবং তাওবা করার তাওফীকই হল না, তখন কী অবস্থা হবে?

গোনাহের ফলে রুচি নষ্ট হয়ে যায়

তাছাড়া গোনাহের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এক গোনাহ আরেক গোনাহকে আকর্ষণ করে এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। গোনাহের কারণে মানুষের চিন্তা-চেতনা উল্টা হয়ে যায়। ভাল কাজ খারাপ লাগতে আরম্ভ করে এবং খারাপ কাজ ভাল লাগতে আরম্ভ করে। যেমন, কারো রুচি নষ্ট হয়ে গেলে মিষ্টি জিনিসও তার কাছে তিতা লাগে। এমনিভাবে গোনাহের কারণে মানুষের রুচি নষ্ট হয়ে যায়। বিবেক বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিতা জিনিস মিঠা এবং মিঠা জিনিস তিতা মনে করতে থাকে। এমতাবস্থায় তাওবার তাওফীক কিরূপে হবে? তখন মানুষ অন্যান্য গোনাহের দিকে আরো অগ্রসর হয়।

গোনাহের পর্দা বিলুপ্ত হয়ে যায়

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ গোনাহ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনের মধ্যে ঐ গোনাহ করতে একটি বাধা এবং একটি প্রতিবন্ধক থাকে। যখন তুমি তাওবার উপর ভরসা করে ঐ গোনাহটি একবার করলে তখন ঐ বাধা ভেঙ্গে গেল এবং অন্যায় কাজ করার দুঃসাহস জন্মাল। এই দুঃসাহস তোমার দ্বারা আরো গোনাহের কাজ করাবে। এজন্য কখনোই তাওবার উপর ভরসা করে গোনাহ করো না। বরং যে কোন মূল্যে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকো।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা রয়েছে

তবে গোনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি কোন সময় পদস্খলন ঘটে ভুল হয়ে যায় এবং গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত খোলা থাকবে। যখন চাও চলে আসো এবং তাওবা করো। কুরআন শরীফ পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে–

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ

অর্থ: 'তাওবা ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে, সারা জীবন এই ভরসায় গোনাহ করতে থাকে যে, যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখনা তাওবা করে নিবো। তারপর যখন মৃত্যুর সময় আসলো, তখন বলতে লাগল যে, এখন আমি তাওবা করছি'। এমন লোকের তাওবা কবুল হয় না। এমন তাওবাতো ফেরআউনও করেছিল। যখন সাগরে ডুবে যাচ্ছিল, তখন সে বলতে আরম্ভ করে যে−

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

অর্থ: আমি ঐ সত্ত্বার উপর ঈমান আনলাম, যার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, এখন ঈমান আনছো, যখন কিনা সময় হাতছাড়া হয়ে গেছে?

এমন ব্যক্তির তাওবা কবুল হয় না। তাওবা তো ঐ ব্যক্তির কবুল হয়, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন−

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

অর্থ: 'আল্লাহ তাআলা ঐসব লোকের তাওবা কবুল করেন, যারা অজ্ঞতা বশত: মন্দ কাজ করে এবং অবিলম্বে ফিরে আসে।'

অর্থাৎ, যার দ্বারা অজ্ঞতা বশত: গোনাহ হয়েছে এবং বিলম্ব না করে ফিরে এসেছে, সে এই চিন্তা করে না যে, পরে তাওবা করে নিবো, এখনো তো অনেক সময় আছে। মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা আছে, এরূপ চিন্তা করো না। কারণ, শেষ সময় কখন চলে আসে তা তো জানা নেই।

তাওবা ভেঙ্গে গেলে পুনরায় তাওবা করো

এজন্য যারা তাওবা করে, কিন্তু এই পেরেশানীতে থাকে যে, আমাদের তাওবা বার বার ভেঙ্গে যায়, এমন লোকেরা যেন ঘাবড়িয়ে না যায়। তারা যেন পুনরায় ফিরে আসে এবং পুনরায় তাওবা করে। কিন্তু তাদের এ কাজ যেন গোনাহের ব্যাপারে নির্ভিকতা সৃষ্টি না করে। এ কারণে যে, তাওবার উপর ভরসা

করে গোনাহ করা এমন, যেমন, বিষ নাশকের উপর ভরসা করে বিষ পান করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে খাঁটি মনে সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইসলাহী মাজালিস

ষষ্ঠ খণ্ড

সূচিপত্র

একাশিতম মজলিস

অতীতের গোনাহ স্মরণ হলে পুনরায় ইস্তিগফার করা

অতীতের গোনাহ স্মরণ হলে পুনরায় ইস্তিগফার করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

হযরত থানভী (রহ.) এক মালফূযে বলেন :

> "তাওবাতুন নাসূহ" করার পর আপনা আপনিই যদি পুরাতন গোনাহ স্মরণ হয় তাহলে তাওবার নবায়ন করে কাজে লেগে যেতে হবে। এর চেয়ে বেশি চেষ্টা-সাধনা করা বাড়াবাড়ি। আর এই কামনা করা যে, (আমার থেকে) সামান্যও অলসতা পরিলক্ষিত না হোক– এটি এক প্রকারের দাবি যা বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের পর্যায়ভুক্ত। এটি যৌক্তিক দৃষ্টিতে অসম্ভব না হলেও বাস্তবতার দৃষ্টিতে অসম্ভব।
>
> হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :
>
> سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৭)

গোনাহ স্মরণে এলে পুনরায় তাওবা করে নাও

উপরোক্ত মালফূযে হযরতের দু'টি কথা বিধৃত হয়েছে। একটি ব্যাপার তো এমন– প্রতিটি মানুষ যার সম্মুখীন হয় যে, একবার গোনাহ করার পর তাওবা নসীব হয়েছে। সে তাওবাও কেমন তাওবা– 'তাওবাতুন নাসূহ' অর্থাৎ, পূর্ণ

সূচিপত্র

তাওবা করা হয়েছে। কিন্তু তাওবা করার পর সেটি বারবার হৃদয়ে উঁকি মারছে, স্মৃতিপটে ভেসে ওঠছে– এ ব্যাপারে হযরত বলেন, নিজের থেকে জেনে বুঝে গোনাহকে পুনঃস্মরণ করা ভুল। সুতরাং স্বেচ্ছায় ওই গোনাহ স্মরণ করবে না, এমনকি তাওবার নিয়তেও স্মরণে আনবে না। কেননা একবার যে গোনাহ থেকে তাওবা করা হয়েছে, এখন যদি আবার সেই গোনাহকে এজন্যে স্মরণ করা হয় যে ঐ গোনাহ করার সময় নফস বড় রকমের স্বাদ পেয়েছিল, তাহলে পুনরায় স্মরণ করার দ্বারা তা আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। তবে যদি অনিচ্ছায় ওই গোনাহ স্মৃতিতে এসেই পড়ে তাহলে ইস্তিগফার ও তাওবা করে নিতে হবে। বলতে হবে:

"أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ اِلَيْكَ"

তাওবা করার একটি কারণ

প্রশ্ন হতে পারে দ্বিতীয়বার তাওবাকে নবায়ন করতে হবে কেন? পুনরায় কেন ইস্তিগফারের দিকে যেতে হবে? এর উত্তরে বলা যায়, তাওবার নবায়ন এজন্য করতে হবে যে, সে ধারণা করেছে যে, আমার মনে ঐ গোনাহের কারণে যে কল্পনা ও খেয়াল আসছে– এটি না আবার আমার স্বপ্রণোদিত কোন কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা অনিচ্ছায় এমনটি এসে গেলে সেজন্য আল্লাহ পাক কোনও ধর-পাকড় করবেন না। তবে ঐ গোনাহের কল্পনা মনে জাগরুক হওয়ার দ্বারা সামান্যও যদি বান্দার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় তাহলে তা পাকড়াওযোগ্য। এজন্যই পুনরায় তাওবা-ইস্তিগফারকে নবায়ন করতে হবে। এ কারণে পুনরায় তাওবা করতে হবে না যে, প্রথমবারের তাওবা কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। বরং মানুষ প্রতিটি তাওবার ক্ষেত্রেই আল্লাহর প্রতি এই ভরসা রাখবে যে, ইনশাআল্লাহ আমার তাওবা অবশ্যই গৃহীত হবে এবং এর প্রতি ন্যূনতমও সন্দিহান হবে না।

তাওবার দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় কারণ এই যে, ওই গোনাহের খেয়াল ও কল্পনা বারবার হৃদয়পটে ভেসে ওঠা আমাকে না আবার দ্বিতীয়বার গোনাহে লিপ্ত করে ফেলে। এজন্য পুনরায় ইস্তিগফার ও তাওবা নবায়ন করে নিতে হবে। কেননা তাওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা আশা করা যায়, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হেফাযতে থাকা যাবে।

গোনাহ একটি বড় ধরনের মুসিবত

বুযুর্গগণ বলেন যে, যখন মুসিবত এসেছিল, তখন তো "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়া হয়েছিল। পরবর্তীতেও যখন ঐ মুসিবত দ্বিতীয়বার স্মরণে এলো, তখনও 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ে নাও। এমনিভাবে গোনাহ্ও একটি মুসিবত আর এটি পার্থিব মুসিবতের মধ্যে সর্বাধিক বড় মুসিবত। এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا

"হে আল্লাহ! আমাদের মুসিবত যেন আমাদের দ্বীনের মধ্যে না আসে।" যদি ঐ মুসিবত আমাদের দুনিয়ার ওপর আসে তাহলে সেটি খুব একটা বড় মুসিবত হবে না– যদিও আমরা এর থেকে পরিত্রাণ চেয়ে থাকি। কিন্তু দ্বীনের ওপর যেন মুসিবত না আসে। গোনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া দ্বীনের ওপর মুসিবত আসার শামিল। সুতরাং যেভাবে মুসিবত স্মরণে আসতেই 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ার হুকুম আছে, সেইভাবে গোনাহ স্মরণে আসামাত্রই তাওবা ও ইস্তিগফার করে নিবে এবং বলবে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

গোনাহ স্মরণে আসলে পরিত্রাণ চাও

আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) ইরশাদ করতেন, ইস্তিগফারের পাশাপাশি ওই গোনাহ থেকে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাও এবং বলো, 'হে আল্লাহ! আমার এই গোনাহ কল্পনায় আসছে। এমন যেন না হয় যে, আমাকে আবার ফাঁসিয়ে দেয় এবং আমি তাতে লিপ্ত হয়ে যাই।' হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' এই কথাও বলবে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

'হে আল্লাহ! আমি স্বীয় কু-প্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর ক্ষেত্রে পার্থিব-পারলৌকিক এমন কোনও দিক ছাড়েননি যেখানটায় তিনি দু'আ করেননি। একটি দু'আয় তিনি ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ

"হে আল্লাহ! শয়তানের অনিষ্টতা থেকে এবং তার শিরক থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি। সুতরাং যখনই কোন অতীত গোনাহের কথা স্মরণে এসে যাবে তখনই দ্বিতীয়বার ইস্তিগফার করে নেবে। পরে সেই দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয়কামী হবে।

তাওবার উপর কায়েম থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও

বান্দার কাজ হলো, নিজের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেবে এবং সাধ্যের শেষ বিন্দুটুকু খরচ করবে। সাধ্যের বাইরের টুকুন আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে তাঁর থেকে সাহায্য চাইবে। বলবে, 'হে আল্লাহ! আমার সাধ্যে এটুকুই ছিল। এক্ষণে সামনের যাবতীয় পূর্ণতা ও ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা আপনার কুদরতি কব্জায়। আপনিই আমাকে এর শক্তি দান করুন। আমি আমার পক্ষ থেকে তাওবা করেছি। কিন্তু হে আল্লাহ! এই তাওবার পূর্ণতা, এর উপর দৃঢ় থাকা আপনার হাতে। আপনার রহমত দ্বারা আমাকে এর ওপর কায়েম রাখুন। এই দুটি কাজ করলেই কামিয়াব হতে পারবে।

পুনরায় তাওবা করে কাজে লেগে যাও

এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেন, 'তাওবা নবায়ন করে পুনরায় কাজে লেগে যাও। এর চেয়ে অধিক চেষ্টা-তদবির করা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি মাত্র।' অর্থাৎ, গোনাহের কথা স্মরণে আসা মাত্রই 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে কাজে লেগে যাও। পরে এই ধ্যানে পড় না যে, আমার এই খেয়াল এল কেন? কেন বারবার এই খেয়াল আসছে? আমি আবার খবিস হয়ে গেলাম কি? কিংবা শয়তান আমার প্রতি এমন কোন দাওয়াই এস্তেমাল করেনি তো যদ্দরুন ভবিষ্যতে আমি তাঁর ফাঁদে পড়ে যাব? হায়! এক্ষণে আমার ইসলাহের আর কোন পথই বুঝি বাকী নেই। এ ধরণের কল্পনা মনে আনা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি মাত্র। কেননা আল্লাহ পাক যখন বলছেন 'তাওবা কর, আমি তাওবা করেছি'। আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও যখন মনে কল্পনার জাল বিস্তার লাভ করছে এবং এ থেকেও তাওবা করে নেয়া হচ্ছে– তখন খামাখা ওই গোনাহকে অযীফা বানাতে না যেও না বরং কাজে লেগে যাও। এর পেছনে সময় ব্যয় করো না। হাদীসে শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

أَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ

"নিজের করার কাজটি সংক্ষেপে কর, পরে আল্লাহর প্রতি ভরসা কর।"

পরিপূর্ণতা অর্জনের চিন্তা ছাড়

এই মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) দ্বিতীয় আরেকটি কথা এই ইরশাদ করেন যে, এই ধারণা করা যে, সামান্যতম ত্রুটি না হয়ে যায়, এটিও এক প্রকার দাবী ও বাড়াবাড়ি মাত্র।' অর্থাৎ, এটি চিন্তা করা যে, আমি এমন কামেল-মোকাম্মাল বনে যাব যে, কোথাও সামান্যতমও অপূর্ণ হব না, কোথাও কোন ঘাটতি আসবে না– ইবাদত হলে যেন কামেল-মোকাম্মাল হয়। চরিত্র-আখলাকেও যেন এমনটি হয়। দ্বীনের প্রতিটি মানদণ্ডে যেন আমি শতভাগ উতরে যেতে পারি। একথা এই দাবিও করে যে, আমি যেই মানের উঁচু তলার মানুষ সেই মানের পূর্ণতাকামী। এটিও এক প্রকার দাবি। আরে ভাই! সাদাসিধেভাবে কাজ করে যাও, শতভাগ পূর্ণতার চিন্তা মাথা থেকে ছেঁটে ফেল। এই মানের স্তর অর্জন হওয়া (عَقْلاً) যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে অসম্ভব নয় তবে (طَبْعًا) আদত-অভ্যাসগত দৃষ্টিকোণে অসম্ভব। কেননা যুক্তির নিরিখে এটি অসম্ভব নয় যে, কোন লোক নবীদের মত আমল করবে কিংবা সাহাবাদের মত আমল করবে। কিন্তু বাস্তবতা এর বিরোধী। কেননা সাধারণত এমনটা হয় না। তাঁদের সমান্তরাল আমল হয় না।

সোজা হওয়ার চেষ্টা কর

পরে এর দলিল দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন–

سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا (بخارى شريف)

হাদীসের পয়লা ভাষ্য হচ্ছে سَدِّدُوْا 'সোজা হও' অর্থাৎ, দ্বীনের সকল চাহিদা পূরণ কর। তাহলে সোজা হতে পারবে নতুবা সোজা হওয়া যাবে না। তবে এর পাশাপাশি অন্য শব্দে ইরশাদ করেন– "قَارِبُوْا" অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সোজা বা ঠিক হওয়া বড্ড মুশকিল। অতএব নিকটবর্তী/কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা কর। পরে ইরশাদ করেন– "وَاسْتَقِيْمُوْا" অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার বলেন, সোজা হও। পাশাপাশি এও বলেন– وَلَنْ تُحْصُوْا পরিপূর্ণরূপে সোজা হতে পারবে না, কিছু না কিছু কমতি থেকেই যাবে। যেহেতু কমতি থেকে যাবে সেহেতু ইস্তিগফার করতে থাকবে এবং তাওবা চালিয়ে যাবে।

ত্রুটিতে ভরা ইবাদতসমূহ

আল্লাহ তাআলা নামায পড়তে, রোযা রাখতে, ইতিকাফ করতে, কুরআন তেলাওয়াত করতে, যিকির করতে ও তাসবীহ পড়তে তাওফীক দিয়েছেন। কিন্তু

ঐসব ইবাদতের যেটির দিকেই তাকাও না কেন দেখবে সেটি ত্রুটিতে ভরপুর। আমরা কী এভাবে নামায পড়ছি যেভাবে সেটি পড়া উচিত? নামাযে যে ধরনের ভীতিভাব থাকার কথা তা থাকছে কী? যে ধরনের ধ্যান-খেয়াল নামাযে থাকার কথা তা আছে কী? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নামাযে যেভাবে বিনম্র রাখার কথা সেভাবে রাখা হচ্ছে কী? এমনটি যখন হচ্ছে না তখন মনে করতে হবে আমাদের নামাযটি ত্রুটিতে ভরপুর। ওদিকে আমরা রোযা তো রেখে চলেছি, কিন্তু যেমনটি রাখার কথা তেমনটি রাখতে পারছি কি? পরিপূর্ণরূপে যে রোযা রাখার কথা সেটি অর্জিত হচ্ছে কি? তেলাওয়াত যখন করছি, তখন তেলাওয়াতের নিয়ম-কানুন মোতাবেক করছি কি? হরফ উচ্চারণের মৌলিক যে নিয়ম-পদ্ধতি আছে এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করছি কি? শব্দের দিকে যেমন ধ্যান-খেয়াল রাখা দরকার ছিল– তা হচ্ছে কি? ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রতি যেমনটি ধ্যান-খেয়াল রাখার কথা তেমনটি ধ্যান-খেয়াল থাকছে কি? এমনটি যখন হচ্ছে না, তখন মনে করতে হবে আমাদের ইবাদতটি ত্রুটিতে ভরপুর।

ত্রুটির দরুণ হতাশ হয়ো না

এক্ষণে একটি পথ এই খোলা আছে যে, হতাশ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে যাও যে, ইবাদতের হক যখন আদায় করা আমাদের সাধ্যাতীত। না আমাদের নামায আল্লাহর দরবারে উপস্থাপনযোগ্য, না আমাদের রোযা-তেলাওয়াত পেশ করার মত। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হতাশ হয়ে বসে থেকো না। কেননা তোমরা পূর্ণরূপে সবটুকু আঞ্জাম দিতে পারবে না। এজন্য যতটুকু সম্ভব নৈকট্য অর্জনে ব্রতী হও।

আরবী ভাষার প্রশস্ততা

আরবী ভাষা এক অদ্ভুৎ ও বিরল ভাষা। সামান্য পার্থক্যে এর অর্থের মাঝে পরিবর্তন সাধন হয়। পূর্বোক্ত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "قَارِبُوْا" (নৈকট্য অর্জন করো) বলেছেন, যা বাবে মুফায়ালার আদেশসূচক শব্দ। "اُقْرُبُوْا" বলেননি। এমনিভাবে اِقْتَرِبُوْا-ও বলেননি। দেখুন একটি সীগাহ (শব্দ) হচ্ছে قَرُبَ - يَقْرُبُ যা بَابُ كَرُمَ - يَكْرُمُ-এর অন্তর্ভুক্ত। অপর একটি শব্দ হচ্ছে اِقْتَرَبَ، يَقْتَرِبُ যা بَابُ اِفْتِعَالٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে নিকটবর্তী হওয়া। আরেকটি শব্দ হচ্ছে قَارِبُوْا এতে ক্রমান্বয়ে

নৈকট্যের বৈশিষ্ট্য নিহিত। সুতরাং একবার নৈকট্য অর্জন করলে قَارِبُوا হয় না। বরং অর্থ দাঁড়ায় 'নৈকট্যে আসার চেষ্টা করতে থাকো এবং সামান্য সামান্য করে নৈকট্যশীল হও।' আজ এক কদম বাড়াবে তো কাল আরেক কদম। পরশু তৃতীয় কদম। এ ধরনের নৈকট্যকেই مُقَارَبَتْ (পর্যায়ক্রমে নৈকট্য অর্জন) বলে।

জীবনভর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকা

সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- قَارِبُوا অর্থাৎ, পর্যায়ক্রমে নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা শুরু করো। কদম বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে থাকো। এভাবে এক সময় আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও। এই শব্দ দ্বারা মূলত: একটি (উহ্য) প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, হাদীসের ভাষ্যে প্রতীয়মান হচ্ছে, আমরা সরল সঠিক হবার যতই চেষ্টা করি না কেন কোনোদিনও তা পারব না। আর যখন পারবই না তাহলে সঠিক হওয়ার চিন্তাটিই ছেড়ে দেব না কেন? এই প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে, আজীবন নিকটে আসার চেষ্টা করতে থাক। সঠিক হওয়ার মানসিকতা অন্তরে পুষতে থাক। পুরাপুরি সঠিক যদি নাও হতে পারছ তথাপিও নৈকট্য অর্জন করে ফেলবে। সুতরাং এ চেষ্টাটুকুন ছেড়ো না। তোমাদের কাছে চেষ্টা চাওয়া হয়েছে, ফলাফল চাওয়া হয় নাই? প্রচেষ্টার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকো।

সারা জীবন কাটাছাঁটা করতে হবে

এ কথাকে মাওলানা রূমী (রহ.) এভাবে বলেন-

اندریں راہ می تراش و می خراش

تادم آخر دمے فارغ مباش

অর্থাৎ, এ রাস্তায় সারা জীবন কাটাছাঁটা করে যেতে হবে। প্রতি মুহূর্তে ধ্যান-খেয়াল করতে হবে যে, ভুলটি কোথায় হচ্ছে এবং সেই ভুলকে কীভাবে শোধরাতে হবে। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্তও এক মুহূর্তের জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না। সুতরাং কেউ যেন এ কথা না ভাবে যে, সবকিছু যখন ঠিকঠাক মত হচ্ছে না তখন জীবন চাকা যেমন খুশী তেমন ঘুরতে দাও। ইসলাহের অতিরিক্ত চিন্তা সময়ের অপচয় মাত্র। উপরোক্ত হাদীসে এই তথাকথিত চিন্তা রদ করা হয়েছে। পরিপূর্ণ ঠিক হতে পারবে না যে বলা হচ্ছে, তা ফলাফলের দিক থেকে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, ফলাফল সব সময় শত ভাগ ঠিকঠাক মত হয় না, কিন্তু তারপরও চিন্তা-ভাবনায় কমতি করা যাবে না।

গন্তব্য নয় প্রচেষ্টাই মূখ্য

কেননা এ পথের গন্তব্য মূখ্য উদ্দেশ্য নয় বরং প্রচেষ্টাই মূখ্য, লেগে থাকাই মূখ্য। এটিই গন্তব্য। অতএব ফলাফলের পরোয়া করো না বরং প্রচেষ্টায় ব্রতী থাকো। আমিও কখনও কখনও কাব্য— চর্চা করি। আমার রচিত একটি চরণ যা হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর বড় পসন্দ ছিল। এর একটি এই যে–

قدم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی
یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا

"মহব্বতের পথে থাকাকালীন গন্তব্যের চিন্তা কেন? এখানকার গন্তব্য হলো ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়া।"

সুতরাং এখানকার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ চলতে থাকবে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। যেমনটি কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

'অতএব যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন।' (সূরা ইনশিরাহ : ৭)

উক্ত আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, যখন আপনি কাজ-কর্ম থেকে ফারেগ হবেন, তখন ইবাদতের মধ্যে নিজেকে পরিশ্রান্ত করবেন। মোটকথা, ফলাফল হাসিল করা না তোমাদের সাধ্যভূক্ত কাজ, না তোমাদের চিন্তার বিষয়। বরং তোমাদের কাজ হলো, গন্তব্যের রাজপথে চলতে থাকা। এই চলাটাই মূখ্য।

অগ্রসর হতে থাকো

অতএব চিন্তা ছেড়ো না, বরং চিন্তাও জারী রাখো, প্রচেষ্টাও চালাতে থাকো। অবশ্য ফলাফল থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকো। যে পদ্ধতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। বলেছেন তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ওই পথে কদম রেখে চলতে থাকো; গন্তব্যে কবে কীভাবে পৌঁছবে– সে চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

'যখন সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর পা রেখেছো তখন ইনশাআল্লাহ ভ্রষ্ট হবে না।' সুতরাং যে কাজই হোক একে সুন্নত তরিকায় করতে থাকো।

নামায আদায় করতে পারার দরুণ শোকর আদায় কর

এই যে, মনের মধ্যে খেয়াল চাপে 'আমার নামায সহীহ হলো কি-না, রোযা শুদ্ধ হলো কি-না— এই খেয়াল ততক্ষণ ফলপ্রদ যতক্ষণ এর দ্বারা তুমি নামাযটিকে অধিক সুষ্ঠু-সুন্দর করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই খেয়ালের দ্বারা ইবাদতটির অবমূল্যায়ন করবে না। কেননা ইবাদতটি আদায় করার শক্তি আল্লাহই তো যুগিয়ে থাকেন। এটি তাঁর করুণা মাত্র। এই শক্তি যদি না মিলতো তাহলে তুমি কী করতে? সুতরাং এই শক্তিপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করো। বল, আয় আল্লাহ! আপনি আপনার দয়া ও করুণাবশত: আমাকে এই ইবাদত করার শক্তি দান করেছেন। আয় আল্লাহ! আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অনুদানের স্বীকৃতি দিচ্ছি। কেননা কৃতজ্ঞতা ও অনুদানে আপনি আমাকে ধন্য করেছেন। কুরআনুল কারীমে যে আয়াত এসেছে তাতে এ কথার স্বীকৃতি মিলছে। ইরশাদ হচ্ছে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ

'আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না। যদি আল্লাহ আমাদের পথ প্রদর্শন না করতেন।'

(সূরা আরাফ : ৪৩)

সুতরাং নেক আমল করার শক্তি পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করো।

নামাযের ত্রুটির জন্য ইস্তিগফার করো

অবশ্য আমাদের ইবাদতের মধ্যে, নামাযে এবং রোযায় নিঃসন্দেহে ত্রুটি হয়। এই ত্রুটির চিকিৎসা ইস্তিগফার। সুতরাং যখনই ত্রুটির জন্য ইস্তিগফার করবে তখন এর ফলশ্রুতিতে ত্রুটি দূর হয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র ইবাদত ও নেকীই বাকী থাকবে। কেননা ইস্তিগফার ঐ ইবাদতের উপর পালিশ করে দিয়েছে এবং ত্রুটির দরুণ ইবাদতে যে পুঁতিদুর্গন্ধময়তা এসেছিল ইস্তিগফার এর সবটুকুই ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। কুরআন মাজীদে সৎকর্মশীল বান্দাদের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

“তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।’ (সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮)

প্রশ্ন হয়, রাতে তারা এমন কোনও গোনাহ করেছে কি, যদ্দরুণ ইস্তিগফার করছিল? তাহলে তারা কেন ইস্তিগফার করবে? এর জবাবে বলা যায়, তারা এজন্য ইস্তিগফার করত যে, আয় আল্লাহ! রাতে আমরা যদিও ইবাদত করেছি কিন্তু সেই ইবাদত আপনার মর্যাদামাফিক হয়নি। এই ইবাদতে বেশুমার ত্রুটি হয়ে গেছে। অসংখ্য ভুল হয়েছে। আয় আল্লাহ! ওইসব ত্রুটি ও ভুলের দরুণ আপনার সকাশে ইস্তিগফার করছি। এ ইস্তিগফারের ফল এই হবে যে, রাতভর যে ইবাদত করা হয়েছে, এতে যে যে ত্রুটি ও ভুল ছিল, এর দরুণ ইবাদতের দেহে যেটুকু ময়লা পড়েছিল– ইস্তিগফার সেই ময়লা দূর করে দিল এবং ফিনিশিং করে দিল। করে দিল পালিশও। এক্ষণে এই আমল আল্লাহর মহান দরবারে উপস্থাপনযোগ্য হয়ে গেল। সুতরাং প্রতিটি আমল করতে পারার পরে আল্লাহর শোকর আদায় করো এবং ত্রুটির দরুণ ইস্তিগফার কর। এ দুটি কাজ করতে পারলে জেনো, আল্লাহর দরবারে আমলটুকু গৃহীত হয়ে গেছে।

ইবাদত করতে পারা তা কবুল হওয়ার আলামত

আমাদের মহান পূর্বসূরী হযরত মাসীহুল্লাহ খান (রহ.) বলতেন, অনেকে বলেন, জানিনা আমাদের নামায কবুল হয়েছে কি-না? একথা ঠিক যে, মনে এই খটকা রাখতে হবে এবং ভয়ডরও থাকতে হবে। এজন্য একজন মুমিনের কাজ হল, ইবাদত করতে থাকা এবং অন্তরে ভয়ডর রাখা। কিন্তু আমাদের বুযুর্গগণ বলেন, একটি আমল করার পর দ্বিতীয়বার যখন ঐ আমল করার সুযোগ হয়েছে, তখন বুঝতে হবে পয়লা আমলটি কবুল হয়েছে। যদি পয়লা আমলটি কবুল না হত তাহলে দ্বিতীয়বার আমল করার তাওফীক হত না। উদাহরণ স্বরূপ– একবার নামায আদায় করা হয়েছে, পরে ঐরূপ আরেকবার নামাযের তাওফীক হয়েছে, এর দ্বারা বুঝতে হবে, আল্লাহ পাক পয়লা নামাযটি কবুল করে নিয়েছেন। কিংবা একটি রোযা রাখার পর যখন আরেকটি রোযা রাখার সুযোগ পাওয়া গেছে তখন মনে করতে হবে এটি পয়লা রোযা গৃহীত হবার আলামত। তবে প্রতিটি আমলের পর তা কবুল না হবার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকো এবং সাথে সাথে বলো– ‘আলহামদুলিল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ।’ এর দ্বারা অধিক ইবাদত করার তাওফীক মিলবে। অতএব আজীবন নিজ উদ্যোগে কাজ করে যাও এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকো। যতটুকু হয়েছে ততটুকুর জন্য ইস্তিগফার কর। ইনশাআল্লাহ গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে।

অপর একটি বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) ইরশাদ করেন :

"আমলকারী ব্যক্তির অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের মধ্যে নফসানিয়াতের সংমিশ্রণের খটকা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধান আমলকারীর সঙ্গে থাকে। তবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করতে থাকবে।" (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৮)

দ্বীন উভয়টির মাঝে

হযরত থানভী (রহ.) ঐ কথাই বলছেন আমি যা সামান্য পূর্বে আলোচনা করছিলাম যে, এই পথ বড্ড অদ্ভুৎ ও বিরল শ্রেণীর। বাহ্যত: এর কিছু কথা, কিছু ব্যাপার পরস্পর বিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। সুতরাং একদিকে আমল করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে অপর দিকে হতাশ হতেও নিষেধ করা হচ্ছে বরং আমল করতে পারার দরুণ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে বলা হচ্ছে। কেননা তিনি এ আমালের শক্তি যুগিয়েছেন। আমল বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছেন। কাজেই এ আমলকে তুচ্ছ-হেয় জ্ঞান করো না। মনে করো না, এ আমল পরস্পর বিরোধী ইত্যাদি।

অপর দিকে এ হুকুমও দেয়া হচ্ছে যে, এ আমলের দরুন যেন আত্মগৌরব না আসে। আমল করার পর যেন এমন মনে না হয় যে, বেশ বড় সড় একটা কাজ করে ফেলেছি। এতে লিপ্ত হয়ে নিজকে আল্লাহওয়ালা ঠাওরে বসো না। মোটকথা! মানুষকে এই উভয়টির মাঝেই থাকতে হবে।

আমল করার পর শঙ্কিত থাকো

সুতরাং একদিকে আমল করো অপরদিকে মনে এই শঙ্কাও রাখো যে, আমার নফসের সংমিশ্রণ যেন একে বরবাদ করে না দেয়। এই কথাটিই আমাদের মহান বুযুর্গ দুটি শব্দে বিধৃত করেছেন যে, আমল করতে থাকবে এবং ভয় করতে থাকবে। যতক্ষণ এই চিন্তা-ফিকির থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তাআলার হেফাযত সঙ্গী থাকবে। এর পাশাপাশি ইস্তিগফারও করে যেতে থাকবে। বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি এই ইবাদত করলেও মনে শঙ্কা জাগছে যে, নফসের কুপ্রবৃত্তিবশত: আমার আমল খারাপ না হয়ে যায়। আয় আল্লাহ! আমি নফসের এই কুপ্রবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ চাই। কাজেই এই আমল থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না এবং আত্মগর্বীও হওয়া চলবে না। উভয়টিই ভুল।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর ভাষ্য

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বড় অদ্ভুৎ কথা বলেছেন, যা স্মরণযোগ্য। ইরশাদ করেছেন, যে লোক আমল করে এই মনে করবে যে, তার এই আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে— তো সে খামাখা এই মেহনত করছে। আর যে লোক আমল না করেই ধারণা করছে যে, সে আল্লাহর রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে– তো এ লোকও আত্মপ্রবঞ্চিত হচ্ছে। হযরত জুনায়েদ (রহ.)-এর এই বাণীর মর্ম হচ্ছে, মানুষ আমল করবে কিন্তু এর প্রতি ভরসা থাকবে না বরং ভরসা থাকবে আল্লাহ তাআলার রহমতের ওপর। এজন্য যে, আল্লাহ তাআলার রহমতকে আকর্ষণ ও আহ্বানকারী হচ্ছে এই আমল। কাজেই এ আমলকে বেকার মনে না করে যথারীতি আমল করে যাবে। এর পাশাপাশি ঐ আমলের প্রতি ভরসা রাখবে না যে উহা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে যতক্ষণ না আল্লাহর রহমত কার্যকর হয়।

কোনও ইবাদত আল্লাহ তাআলার মর্যাদামাফিক নয়

সুতরাং আমলটি যতই ভাল হোক তাকে আরো ভালো করলেও তা আল্লাহ পাকের মর্যাদামাফিক হবে না। সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

“আপনার মর্যাদা অনুযায়ী আমরা আপনার ইবাদত করতে পারছি না। আবার আপনাকে চেনার মত চিনতেও পারিনি।”

সুতরাং কোনও ইবাদতের সত্ত্বাগত এমন কোন যোগ্যতা নেই যা আপনাকে জান্নাতে পৌছে দিতে পারে। কেননা আপনি যে আমলটি করছেন তা আল্লাহর দরবারে উপস্থাপনযোগ্য কি? আমলটি যতই মাধুরী মেশানো হোক না কেন, যতই ভয়-নিষ্ঠাস্নাত হোক না কেন তারপরও তা আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন যোগ্য নয়।

ইবাদতের শক্তি ও অঙ্গসমূহ কে দিয়েছেন?

দেখুন, ওই আমলটি করার শক্তি কে দিলেন? যে হাত-পায়ের মাধ্যমে আপনি আমলটি করছেন, ঐ হাত-পা কে দিয়েছেন? দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে দিয়েছেন? যদি আপনি যিকির করে থাকেন তাহলে সুন্দর করে করা আপনার উচ্চারণ-মাধ্যম জিহ্বাটি কার অনুদান? জিহ্বায় বাকশক্তি কে দিয়েছেন?

সবকিছুই তো তাঁরই দয়ার দান। এরপরও কি ওগুলো তাঁর দরবারে উপস্থাপনযোগ্য? এখানে কি তাঁরই দেয়া বস্তু তাঁরই দরবারে পেশ করা হচ্ছে না?

জনৈক গ্রাম্য লোকের কাহিনী

আমাদের আমলের তুলনা জনৈক গ্রাম্য লোকের পানির মটকার মত। এক গ্রাম্য লোক বাদশাহর সাক্ষাতেচ্ছু হল। বিবির সাথে পরামর্শ করে বলল, আচ্ছা, বলো তো বাদশাহর জন্য কী হাদিয়া নেওয়া যায়? বিবি বলল, আমাদের কুপের পানি খুবই মিষ্ট ও পরিচ্ছন্ন— শহরে বসে তিনি এই পানি কোথায় পাবেন? সুতরাং মটকাভর্তি পানি নিয়ে যাও তার জন্য। গ্রাম্য লোকটির মাথায় প্রস্তাবটি চমৎকার ঠেকল। মটকা ভরে পানি মাথায় তুলে নিল। বাগদাদের পথে পদাতিক রওয়ানা হোল। পথিমধ্যে ধূলোবালি ওই পানিতে পড়ল। বেশ কদিন সফর করার পর বাগদাদ পৌঁছল। মটকায় ধূলাবালির স্তর পড়ে গেছে। সে রাজপ্রাসাদে উপনীত হল এবং সাক্ষাতের প্রার্থনা করল। সাক্ষাতের সময় সে বাদশাহর সম্মুখে পানির মটকা পেশ করে বলল, বাদশাহ নামদার! নিন, আমাদের গ্রামের স্বচ্ছ মিঠা পানি। একান্তই আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ এনেছি। বাদশাহ দেখলেন, মটকায় ধূলিস্তর পড়ে গেছে। ভোটকা গন্ধ আসছে। কিন্তু বাদশাহ ভাবলেন, আমি যদি ফিরিয়ে দেই তাহলে লোকটা মনে ব্যথা পাবে। বেচারা কতদূর থেকে বোঝা বয়ে নিয়ে এসেছে। মহানুভব বাদশাহ তাই হুকুম দিলেন, তার মটকা সোনা-রূপা দ্বারা ভরে দাও। পরে তাকে দজলা-ফোরাতের তীর দিয়ে বাড়ির পথ ধরাও। যাতে সে বুঝতে পারে যে, এখানেও স্বচ্ছ মিঠা পানি পাওয়া যায়। লোকটাকে যখন নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হোল তখন সে হয়রান হয়ে গেল। এখানেও তো স্বচ্ছ-মিষ্টি পানি মওজুদ। তারপরও বাদশাহ কেবল আমার তোহফাই কবুল করেননি দিয়েছেন অশেষ প্রতিদানও।

নিষ্ঠা ও মহব্বতের জবাব

ঘটনাটি বর্ণনা করে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে ওই গ্রাম্য লোকটি শাস্তির যোগ্য ছিল যে, সে অনেক দূর থেকে পানি বয়ে নিয়ে এসেছে, তাও আবার পুঁতিগন্ধময়। এই পানি কী বাদশাহর পানযোগ্য?

কিন্তু মহানুভব বাদশাহ ঘোলা কিংবা ধুলিমাখা অবস্থাদির প্রতি নজর দেননি বরং গ্রাম্য লোকটার নিষ্ঠা দেখেছেন। বুঝেছেন, সে যদিও একটা ছেলেমি করেছে কিন্তু এর মধ্যে আছে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও নিখাঁদ ভালবাসা। এজন্য নিষ্ঠা ও মহব্বতের জবাব দিয়েছেন যে, তার মটকা সোনা-রূপা দ্বারা ভরে দিয়েছেন।

আমাদের ইবাদতের জবাবে মাগফিরাত

দুনিয়ার সাধারণ এক বাদশাহ যদি মানুষের এই মটকার কদর করতে পারেন তখন রাজাধিরাজ ও মহান অধিকর্তার দরবারে আমরা যে ইবাদতগুলো পেশ করি তা ঐ গ্রাম্য লোকটির পানির মটকার চেয়েও মর্যাদার অধিক অযোগ্য ও মূল্যহীন। আমাদের টোটাফাটা ইবাদতের দরুণ বরং শাস্তি দেওয়ার দরকার ছিল যে, এগুলো তাঁর দরবারে উপস্থাপনযোগ্য নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ পাক দেখেন আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণচিত্তে ইবাদতটুকুন করেছি। কাজেই তিনি আমাদের মটকাও সোনা-রূপা দ্বারা ভরে দেবেন। আর তা এইভাবে যে–

يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

আল্লাহ তাআলা অসৎকর্মকে সৎকর্মে রূপান্তর করে দেবেন।

(সূরা ফুরকান : ৭০)

সারকথা

মোদ্দাকথা, এই যে, আমলের প্রতি আত্মগর্বী হওয়া যাবে না আবার উদাসীনও হওয়া চলবে না। বরং আমলও করতে থাকবে, ভয়ও করে যাবে। সর্বোপরি আল্লাহ পাকের ক্ষমাপ্রত্যাশী হবে। এই কাজটুকু করতে পারলেই ইনশাআল্লাহ গন্তব্যে পৌঁছা যাবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অগাধ করুণা ও অশেষ দয়ার বদৌলতে উপরোক্ত কথার ওপর আমলের তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

বিরাশিতম মজলিস

'বান্দার হক' থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

বান্দার হক থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

এক মালফুযে হযরত থানভী (রহ.) ইরশাদ করেন–

> ‘আ‘মালে সালেহা’ (সৎকর্ম) কিংবা তাওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু বান্দার হক মাফ হয় না। সুতরাং যতদূর সম্ভব (বান্দার হক) আদায় করবে এবং সবটুকু শোধ করার পরিপক্ক সংকল্প রাখবে। যদি কিছু অনাদায়ী থেকে যায় এবং সে অবস্থায় মারা যায় তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখবে– তিনি দায়মুক্ত করে দেবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মজলুমকে খুশি করে জালেমের মাগফিরাত করে দেবেন।’ (আনফাসে ঈসা : ১৯৮ পৃষ্ঠা)

গোনাহে সগীরা মাফ করার পদ্ধতি

এই বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) প্রথমে একথা বর্ণনা করেন যে, আ‘মালে সালেহা অর্থাৎ, সৎকর্ম দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তাওবা দ্বারাও মাফ হয়ে যায়। উভয়টির মাঝে পার্থক্য এই যে, নেক আমল দ্বারা শুধু গোনাহে সগীরা মাফ হয়ে যায় আর তাওবা দ্বারা গোনাহে কবীরাও মাফ হয়ে যায়। গোনাহে সগীরার ব্যাপারটি এই যে, আল্লাহ তাআলা নেক কাজের বদৌলতে এমনিতেই সেগুলো মাফ করে দিয়ে থাকেন। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন অযু করে, অযুর মাঝে যখন সে হাত ধৌত করে তখন হাত দ্বারা কৃত গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। চেহারা ধৌত করার দ্বারা চোখ দ্বারা কৃত

গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। পা ধৌত করার দ্বারা চলাফেরার সময় হওয়া গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অবশ্য উক্ত হাদীসে বর্ণিত গোনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য গোনাহে সগীরা যা আল্লাহ পাক এভাবে মাফ করে দেন।

ইবাদত দ্বারা গোনাহে সগীরা মাফ হয়ে যায়

হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন নামায পড়ার জন্য মসজিদে যায় তখন প্রতিটি কদমে আল্লাহ পাক গোনাহ মাফ করেন। এর দ্বারাও উদ্দেশ্য সগীরা গোনাহ। এভাবে নামায পড়ার দ্বারাও সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

একবার জনৈক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। পরে একটি গোনাহে সগীরার কথা বর্ণনা করে বললেন, আমার থেকে গোনাহটি হয়ে গেছে। তিনি ইরশাদ করলেন–

ঐ গোনাহের পরে তুমি কী আমার সাথে মসজিদে নামায পড়োনি? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায তো পড়েছি। ইরশাদ হলো, ব্যস নামায পড়ার দ্বারা তোমার ঐ গোনাহ মাফ হয়ে গেছে। পরে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"নেক কাজ বদ কাজকে খতম করে দেয়।" (সূরা হূদ : ১১৪)

মানুষ নেককাজ করা মাত্রই তার গোনাহে সগীরা ক্ষমা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার স্বীয় রহমতের ব্যবস্থাপনা এমনই যে, গোনাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমা হতে থাকে। তবে এগুলো সবই সগীরা গোনাহের বেলায় প্রযোজ্য।

গোনাহে কবীরার জন্য তাওবা জরুরী

কবীরা গোনাহের জন্য নিয়ম এই যে, তা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। তবে আল্লাহ পাক স্বীয় করুণা বলে তাওবা ব্যতিরেকে যদি কাউকে মাফ করে দেন সেটি রুখবে কে? কিন্তু নিয়ম ও পদ্ধতি এই যে, গোনাহে কবীরা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। উক্ত বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) যে বলেছেন, 'আ'মালে সালেহা' বা 'তাওবা' দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায়— এর মর্ম এই যে, আ'মালে সালেহা দ্বারা 'সগীরা গোনাহ' আর তাওবা দ্বারা 'কবীরা গোনাহ' মাফ হয়ে যায়।

'বান্দার হক' এবং 'আল্লাহর কিছু হক' শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয় না

তিনি আরো বলেন, কিন্তু 'অন্যের হক' মাফ হয় না। 'অন্যের হক' দ্বারা উদ্দেশ্য 'বান্দার হক' আর 'আল্লাহর এমন কিছু হক' যা মেটানো সম্ভব। যেমন: নামায ছুটে গেল। অথচ নামাযী সুস্থ। এই নামাযগুলো কাযা করা সম্ভব। সুতরাং নামায মাফ হবে না। কিংবা যেমন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে অথচ যাকাত আদায় করা হয়নি তাহলে যাকাত মাফ হবে না। হজ্জ ওয়াজিব হয়েছিল, আদায় করা হয়নি– এই হজ্জ মাফ হবে না। রোযা ওয়াজিব হয়েছিল, আদায় করা হয়নি– তাও মাফ হবে না। মোটকথা, তাওবা দ্বারা 'আল্লাহর ঐ সকল হক' যা মেটানো সম্ভব তা মাফ হবে না। আর বান্দার হক বান্দা ক্ষমা করা ছাড়া কিংবা অধিকার মিটিয়ে দেয়া ছাড়া মাফ হবে না।

অতীতের আদায়যোগ্য সব হক আদায় শুরু করে দাও

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, মানুষ তাওবা করার পর যদি বুঝে নেয় যে, ব্যাস আমার স্বার্থোদ্ধার হয়ে গেছে, এক্ষেত্রে আমাকে আর কিছু করতে হবে না– এটি নিছক ভুল ধারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনা। তাওবা করার পর বরং দেখতে হবে, আমার জিম্মায় কী কী অধিকার ওয়াজিব আছে, তা আল্লাহর হক হোক কিংবা বান্দার হক। তাওবা করার পর হকসমূহ পরিশোধ করতে আরম্ভ কর। যার পদ্ধতি তাওবার বয়ান শুরু করতে গিয়ে আরয করেছিলাম যে, একটি খাতা বানাবে, ওই খাতায় লেখবে, আমার জিম্মায় অমুকের অমুকের পাওনা আছে, আমার জিম্মায় এই এই পরিমাণ অনাদায়ী আছে, এত এত রোযা, এই পরিমাণ যাকাত অনাদায়ী। অমুকে এত এত ঋণ পাবে। আজ থেকে আমি শোধ করা শুরু করেছি। শোধ করার পূর্বেই যদি মারা যাই তাহলে আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ওই ইবাদতের ফিদ্‌ইয়া ও ঋণ আদায় করে দিতে হবে।

সব হক মেটানোর পূর্বেই মৃত্যু এসে গেলে

যদি এই লোক নামায আদায় শুরু করে দেয়, রোযা-যাকাত আদায় শুরু করে দেয়, মানুষের প্রাপ্য অধিকারসমূহ শোধ করতে থাকে, এই ব্যক্তির সম্পর্কে থানভী (রহ.) বলেন, এই প্রচেষ্টাকালীন লোকটা যদি মারা যায় অর্থাৎ, যদি এখনও সব ইবাদতের (কাযা) আদায় হয়নি, এখনও সব হক পরিশোধ হয়নি, তখন আল্লাহর রহমতের প্রতি আশাপূর্বক বলা যায়, তিনি একে মাফ করে

দেবেন। মাফ করার পদ্ধতি এই হবে যে, যে সব লোকের অধিকার তার জিম্মায় ছিল ওইসব বান্দাকে বলে দেবেন যে, ও আমার এক বান্দা, ও ওর দায়িত্বে থাকা হকসমূহ আদায় করা শুরু করেছিল, চেষ্টায় এতটুকু কমতি ছিল না, কিন্তু ওর বয়স ফুরিয়ে গিয়েছিল যদ্দরুন সব হক আদায় করতে পারেনি। তবে যেহেতু নিষ্ঠাভরেই আদায় শুরু করেছিল এজন্য আরো বড় অনুদান দিয়ে তোমাদের রাজী-খুশি করে দিচ্ছি। সুতরাং তাকে তোমরা মাফ করে দাও।

বান্দার হক মাফ করানোর উপায়

হযরত থানভী (রহ.) তাঁর বাণীতে সংক্ষেপে এ কথাগুলো বলেছেন। আরেকটি ওয়াজে হযরত একথা বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেন। সেখানে আছে, বান্দার হক আদায়ের কোনও উপায় নেই যতক্ষণ না সে সেই হক আদায় করে কিংবা সংশ্লিষ্ট বান্দার থেকে সেটি মাফ করিয়ে নেয়। এই ভুল বুঝাবুঝির দরুণ মাঝে মধ্যে মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় যে, আমার কাছে এত এত মানুষের পাওনা আছে। আজ থেকেও যদি এই পাওনা মেটানো শুরু করি তাহলে সারা জীবনেও তা মেটানো সম্ভব নয়। অন্তরে যখন এ ধরনের হতাশা একবার সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সামান্য কিছু যা মেটানো সম্ভব হতো, তা মেটানো থেকেও সে নিশ্চুপ বসে থাকে।

নিরাশ হওয়া ঠিক নয়

এজন্যই আমাদের হযরত থানভী (রহ.) মানসিকতা এমন ছিল যে,

سوئے نوامیدی مروامید ہاست

سوئے تاریکی مروخورشید ہاست

অর্থ : হতাশা, অন্ধকার ও তমসার কোনও রাস্তা নেই বরং আল্লাহ তাআলা আশার রাস্তা রেখেছেন। এজন্য এই খেয়াল ভুল যে, বান্দার হক আদায়ের কোনও রাস্তা নেই। কেননা একজন বান্দা যখন অপর এক বান্দার হক আদায়ের জন্য উদ্যোগী হয়েছে, এমনকি আদায় শুরুও করে দিয়েছে। সম্ভব সব চেষ্টাটুকু ব্যয় করছে, এর মধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে তখন আল্লাহ তাআলা প্রাপকদের রাজি ও সন্তুষ্ট করে দিবেন।

শত মানুষ হত্যাকারী ব্যক্তির কাহিনী

এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) বিখ্যাত একটি ঘটনাকে দলিল স্বরূপ পেশ করেন যা হাদীস শরীফে বিবৃত হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জনৈক উম্মত একশ' মানুষ হত্যা করেছিল। ৯৯ জনকে হত্যা করার পর তার মনে অনুশোচনা এলো। আল্লাহর ভয়ে লজ্জিত হল। বলল, হায় আল্লাহ! আমি একি করেছি! একজন মানুষকে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। মানব হত্যার সাজা কুরআনুল কারীমে যে আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে অন্য কোনও সাজা এভাবে বর্ণনা করা হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুমিনকে হত্যা করবে তার পরিণতি জাহান্নাম। অনন্তকাল সে ওখানে থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য মারাত্মক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা : ৯৩)

কুফর ও মানব হত্যা ছাড়া এমন শব্দ আর কোনও শাস্তির বেলায় প্রয়োগ করা হয়নি।

শতক পুরা করল

মোটকথা ৯৯ জন লোক হত্যার পর তার চিন্তা হোল এখন আমি কী করব। সুতরাং সে জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রীর কাছে গেল। বলল, আমি ৯৯ জন মানুষ হত্যা করেছি। আমার নাজাতের কোন রাস্তা থাকলে বলুন। পাদ্রী বললেন, তোমার নাজাতের কোন পথ নেই। কেননা, একজন লোককে হত্যা করাই মহাপাপ আর সেখানে তুমি ৯৯ জনকে হত্যা করেছ। কাজেই নাজাতের কোনও পথ নেই। জাহান্নাম অবধারিত তোমার। লোকটা রেগে গেল। ভাবল, এলাম নাজাতের পথ খুঁজতে। আর সে কি-না বলছে পথ নেই। ভাবল, নাজাতের পথ যখন নেই-ই তখন আর শতক পুরতে অসুবিধে কী? সুতরাং সে পাদ্রীকে হত্যা করে ফেলল।

পরে আরেক পাদ্রীর কাছে গেল। বলল, আমি একশত মানুষ হত্যা করেছি। নাজাতের পথ বাতলে দিন। ওই পাদ্রী বললো, তুমি তাওবা কর, ক্ষমা চাও। আরেকটি কাজ কর, অমুক বসতিতে বহু নেককার লোক আছে। ঐ বসতিতে

গিয়ে বসবাস কর। পাদ্রীর আশা, লোকটা বসতির ভাল মানুষের সংসর্গে থাকলে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং কৃত গোনাহের অনেকখানিই ক্ষমা হবে। লোকটা পাদ্রীর কথামত ঐ বসতির উদ্দেশে চলল।

রহমত ও আযাবের ফেরেশতার ঝগড়া

লোকটা পথিমধ্যে ছিল। এমতাবস্থায় তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং সে মরে গেল। হাদীস শরীফে এসেছে, এ ব্যাপারে রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের মাঝে ঝগড়া বেঁধেছিল। আযাবের ফেরেশতগণ বললেন, এ লোক একশত মানুষের হত্যাকারী। অতএব সে আমাদের অধীন এবং তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাব। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, লোকটা তাওবা করে নেককার হওয়ার জন্য চলছিল। সুতরাং সে আমাদের অধীন এবং জান্নাতে নিয়ে যাব।

আল্লাহ তাআলার ফয়সালা

উভয় দল ঝগড়ায় লিপ্ত হলে আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত দিলেন, যেখান থেকে এই লোক চলা শুরু করেছিল এবং যে বসতিতে যাচ্ছিল এর মধ্যকার দূরত্ব পরিমাপ কর। আর দেখো, যে বসতি থেকে রওয়ানা করেছিল তা কি কাছে— না কি যে বসতির দিকে যাচ্ছিল, তা কাছে? যে বসতির দিকে এ লোকটা নিকটবর্তী সে অনুযায়ী কাজ কর।

সুতরাং উভয় বসতির দূরত্ব পরিমাপ করা হোল। দেখা গেল, যে বসতির দিকে সে যাচ্ছিল সেটি নিকটবর্তী। মোটকথা যে, গন্তব্যের উদ্দেশে সে যাচ্ছিল মাঝপথের চেয়ে ১ গজ সে বেশি অতিক্রম করেছিল। আল্লাহ তাআলার হুকুমে রহমতের ফেরেশতা একে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিলেন।

এ ঘটনা দ্বারা হযরত থানভী (রহ.)-এর দলিল উপস্থাপন

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) উপরোক্ত ঘটনা দলিল স্বরূপ পেশ করে বলেন, ঐ লোক যে এক শত মানুষকে হত্যা করেছিল তা ছিল বান্দার হক। যেহেতু সে বান্দার হক আদায়ের জন্য পরিপক্ক ইরাদা করেছিল এজন্য আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করে নিয়েছিলেন এবং ক্ষমা করেছিলেন। পক্ষান্তরে যে সব মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে সন্তুষ্ট করে দিবেন।

পরিমাপ করার কী দরকার ছিল?

উক্ত ঘটনায় আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে যে নির্দেশ করেছেন যে, উভয় দিক দিয়ে রাস্তা পরিমাপ করে দেখো– কোন বসতি অধিক নিকটবর্তী। এর দ্বারা প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তাআলার যখন ক্ষমা করার ইচ্ছাই ছিল তখন পরিমাপ করার কী দরকার ছিল? মনে করুন, ঐ লোকের মৃত্যু এক দু' গজ পূর্বে হলেও তো সে তাওবার ইচ্ছা করে নিয়েছিল এবং আত্মপ্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। সুতরাং পরিমাপ করানো এবং দূর-নিকটের মানদণ্ডে ফায়সালা করার কীইবা প্রয়োজন ছিল? প্রশ্নটি আমার মনে বহুদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং আমি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছিলাম।

'বান্দার হক' শোধ করার জন্য আত্মপদক্ষেপ শর্ত

পরবর্তীতে আল্লাহ পাক আমার অন্তরে এই উত্তর ঢেলে দেন যে, পরিমাপ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, পরিমাপের পরে ফায়সালা হবে; বরং ক্ষমার ফায়সালা তো আগেভাগেই করা হয়েছিল। এর প্রতি সহানুভূতি প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু মানুষকে এটি বলার জন্য পরিমাপ করানো হয় যে, এই ব্যাপারটি ঠিক তখনি ঘটবে যখন মানুষ আত্ম সংশোধনের জন্য নিজের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক পদক্ষেপ নেবে। এমনটি নয় যে, কেউ আত্মসংশোধন ও পরিবর্তনের দায়সারা পদক্ষেপ নিবে আর অলসতাবশত: মুখ থুবড়ে পড়বে। এমনটি হলে ক্ষমার ব্যাপারটি আসবে না। সুতরাং উক্ত ঘটনা দ্বারা বলা হচ্ছে, ইসলাহ (আত্মসংশোধন) এর পাশাপাশি সন্তোষজনক পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্রহণযোগ্য পথের পথিক হতে হবে। তবেই কেবল আল্লাহর রহমত আসবে। এমনটি না হয় যে, কারো ওয়াজ-নসীহত শুনে ইরাদা করল যে, ওই নসীহতের উপর আমল করবে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করল না। আর যাই কিছু হোক এ ধরণের সংকল্পের কোন মূল্য নেই। সুতরাং বান্দাদেরকে একথা বুঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন যে, যমিনটি পরিমাপ কর এবং দেখো সে সন্তোষজনক পরিমাণ রাস্তা অতিক্রম করেছে কি-না? পরিমাপ করার পর জানা গেল সে সন্তোষজনক পরিমাণ রাস্তা অতিক্রম করেছে। এরপরই তার ক্ষমার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

সার সংক্ষেপ

সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহ তাআলা 'আমলে সালেহা'কে গোনাহে সগীরা ক্ষমার রাস্তা সাব্যস্ত করেছেন এবং গোনাহে কবীরা যা আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট এবং যার দায়মুক্তি সম্ভব নয়– এর ক্ষমা পেতে তাওবা করতে হবে। আর

যে গোনাহে কবীরার সম্পর্ক বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট (حَقُّ الْعِبَادِ) তা পরিশোধ করতে হবে কিংবা যার সম্পর্ক আল্লাহর এমন হকের সঙ্গে যা আদায় করা সম্ভব, তা থেকে দায়মুক্তির জন্য গুরুত্ব সহকারে দায়মুক্তির পদক্ষেপ শুরু করে দিবে। এর পাশাপাশি এই অসীয়তও করবে যে, আমি যদি মানুষের অধিকারগুলোর সব শোধ না করতে পারি তাহলে আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তা আদায় করে দিবো। বান্দা এতটুকু করলে তার করণীয় সবটুকু সে করল। এরপর আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে বলা যায়, তিনি সকল বাধা দূর করে দেবেন।

গোনাহের চাহিদা গোনাহ নয়

অপর এক বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) ইরশাদ করেন–

> "প্রকৃতিগত চাহিদার (امور طبعيه) ওপর কোনও ধরপাকড় নেই এবং (কু-প্রবৃত্তির) চাহিদামাফিক আমল করার দরুণ ধরপাকড় হবে। তাও ওই সময় যখন ইচ্ছাকৃত আমল করা হবে। আর স্বভাবগত অসহিষ্ণুতায় (طبعی ناگواری) পরাভূত হয়ে যদি কোন সময় অসৌজন্যমূলক কোন কথা মুখ ফুটে বেরিয়ে যায় এবং পরে এর জন্য ক্ষমা চায় তখন আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন।" (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৮)

এই বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বড় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বয়ান করেছেন। যার সংক্ষিপ্তসার এই যে, গোনাহের বহি:প্রকাশ হয় প্রকৃতিগত চাহিদা অথবা মানুষের ভেতর যে মন্দ চরিত্র আছে তাই মানুষকে গোনাহের প্রতি উৎসাহিত করে। কিছু লোক এরূপ মনে করে যে, গোনাহের ইচ্ছা ও চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হওয়াই গোনাহ। হযরত থানভী (রহ.) এই ভুল ধারণার অপনোদনপূর্বক বলছেন, অন্তরে চাহিদা বা ইচ্ছা পয়দা হওয়ার দ্বারা গোনাহ হয় না; যতক্ষণ না মানুষ চাহিদাকে কার্যে পরিণত করে।

সবার আগে রাগের চিকিৎসা

যেমন রাগ করা খারাপ। এটি এমন একটি ব্যাপার তাসাওউফ ও তরীকতে সবার আগে এর চিকিৎসা করা হয়। রাগ মানুষের ভেতরকে বিলকুল ধ্বংস করে দেয়। এজন্য কোন আল্লাহর বান্দা যখন ইসলাহের জন্য কোন শায়খের নিকট যায় তখন সবার আগে তার রাগের ইসলাহ করা হয়, যাতে তার রাগ সংবরণ হয়ে যায়।

রাগ ও জৈবিক চাহিদার উপর আমল করা গোনাহ

কিছু লোক মনে করে যে, অন্তরে রাগ সৃষ্টি হওয়াই গোনাহ। হযরত থানভী (রহ.) ইরশাদ করেন, অন্তরে স্রেফ রাগ পয়দা হওয়াই গোনাহ নয়, বরং গোনাহ তখনই হবে যখন সেই রাগের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করবে। জৈবিক চাহিদার ব্যাপারটিও এমন। জৈবিক চাহিদা মনে উদ্রেক হওয়ায় গোনাহ হয় না। কিন্তু যদি জেনে-বুঝে মনে এই ধরণের খেয়াল পয়দা করে কিংবা জেনে-বুঝে এই খেয়ালকে স্থিতিশীল রাখে বা জৈবিক চাহিদার বশবর্তী হয়ে এমন কোনও কাজ করে বসে যা শরীয়তবিরুদ্ধ, তবেই কেবল গোনাহ হবে। যেমন জৈবিক চাহিদার কল্পনা মনে আসায় নাজায়েয জায়গায় নজর দিল– এমতাবস্থায় গোনাহগার হবে। সকল বাতেনী রোগ ও কু-রিপুর ব্যাপারটি এমনই।

হিংসার বশবর্তী হয়ে আমল করা গোনাহ

যেমন ধরুন, হিংসা। আপনার মনে কারো বিরুদ্ধে হিংসা এল। তার সম্পর্কে কোন ভাল খবর আসায় অন্তরে এই খেয়াল পয়দা হোল যে, এ এত উন্নতি করছে কেন? তার টাকা-পয়সা এত বাড়ছে কেন? বিত্ত-বৈভবে প্রবৃদ্ধি আসছে কেন? কেন তার এত নামযশ? মানুষেরা তাকে এত সমীহইবা করে কেন? ইত্যাদি। স্রেফ অন্তরে এই খেয়াল পয়দা হওয়া গোনাহ নয়। কেননা এই খেয়াল বা কল্পনা অনিচ্ছাকৃত মনে এসে পড়ে। গোনাহ ঠিক তখনই হবে যখন এই খেয়ালের বশবর্তী হয়ে আপনি ঐ লোকের সাথে কোন দুষ্কর্ম করে বসবেন। উদাহরণ স্বরূপ : আপনার মনে এই খেয়াল পয়দা হোল, অমুক লোক আমার চেয়ে অনেক উন্নতি লাভ করছে– ব্যাপারটি পীড়াদায়ক। এক্ষণে আপনি ভাবলেন যে, এমন কাজ করব যে তার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। যেমন: তার কুৎসা গাইব। মানুষের সম্মুখে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করব, তার গীবত করব। এইসব কাজ করার দ্বারা হিংসার গোনাহ হবে। স্রেফ অন্তরে খেয়াল উদ্রেকের দ্বারা গোনাহ হবে না।

হিংসার দুটি চিকিৎসা

অবশ্য 'হিংসা' সম্পর্কে ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, যে লোকের অন্তরে অপরের ব্যাপারে অকল্যাণের খেয়াল চাপবে তাকে তৎক্ষণাৎই দুটি কাজ করতে হবে। নতুবা হিংসার ফলশ্রুতিতে গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথমত: মনে মনে ভাববে, এই খেয়ালটি খুবই খারাপ। আল্লাহর কাছে

দোয়াচ্ছলে বলবে, আয় আল্লাহ! আমার অন্তর থেকে এই খেয়ালটি দূর করে দিন। দ্বিতীয়ত: যার ব্যাপারে মনে এই কু-খেয়াল চেপেছে তার কল্যাণের জন্য দু'আ করবে। উদাহরণস্বরূপ : আপনার অন্তরে এ ব্যাপারে দুঃখ হচ্ছে যে, অমুক লোক আমার চেয়ে উন্নতি লাভ করছে কেন? তার জন্য এই দু'আ করবেন- আয় আল্লাহ! তাকে আরো উন্নতি দান করুন। দেখবেন এমনটি করলে আপনার মনের উত্তাপ-চাপ ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে। মনের প্রতি এই ওষুধ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য তার চিকিৎসা। যদি কারো বিত্ত-বৈভবের দরুণ মনে হিংসা আসে তখন তার উদ্দেশ্যে এই দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! তার সহায়-সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিন। যদি কারো পদ-মর্যাদা সম্পর্কে মনে হিংসা আসে তাহলে এই দু'আ করবেন- হে আল্লাহ! তার পদমর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিন। উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। সুতরাং যে কারণে হিংসার উদ্রেক হবে সেটিই বর্ধনের দু'আ করবেন। কাজেই হিংসা এলে এ দুটি কাজ করবেন, নয়ত হিংসা কোন না কোন সময় মানুষকে ধ্বংস করে দেবেই।

মোটকথা, যত মন্দ চরিত্র আছে, সবগুলোর মূলনীতি হযরত থানভী (রহ.)-এর এ বাণীতে রয়েছে যে, "স্রেফ প্রকৃতিগত চাহিদার ওপর কোনও ধরপাকড় নেই। বরং চাহিদামাফিক আমল (বাস্তবায়ন)-এর দরুণ ধরপাকড় হবে। আর তাও তখন, যখন ইচ্ছাকৃতভাবে চাহিদা পূরণ করবে।"

প্রকৃতিগত অনীহায় পরাভূত হয়ে মুখ থেকে বেরোনো বাক্যসমূহ

নিম্নে হযরত মাওলানা থানভী (রহ.) একটি পরিত্রাণধর্মী কথা বলেছেন, যদি (طبعی ناگواری) প্রকৃতিগত অনীহায় পরাভূত হয়ে কোনও অসৌজন্যমূলক কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, পরে এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। অর্থাৎ, যদি রাগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায় এবং কোন আল্লাহওয়ালার সংসর্গের কারণে এবং তার ঘষা-মাজার পরিণতিতে প্রকৃতিতে এ ধরনের ধীর-স্থিরতা/স্বাভাবিকতা পয়দা হতে থাকে এবং সেই সাথে রাগও সংবরণ হতে থাকে কিন্তু এরপরও অনেক সময় রাগ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। যেমন: কোন কাজে অসন্তুষ্টি পয়দা হোল এবং রাগ চরম আকার ধারণ করার দরুণ মুখ থেকে অসৌজন্যমূলক কথা বের হল। এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর দ্বারা এরূপ মনে করবে না যে, ইহা অসম্ভব ও অসংশোধনযোগ্য কাজ। এমনটি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে ওজর পেশ করবে কিন্তু একথা ভাববে না যে, আমার এই রাগ সংশোধনযোগ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে সংশোধনের চিন্তা করতে থাকবে।

জনৈক সাহাবীকে রাগ না করার নসীহত

হাদীস শরীফে এসেছে, জনৈক সাহাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সংক্ষিপ্ত কিছু নসীহত করুন। একেতো নসীহতের কথা বললেন, তা আবার সংক্ষিপ্তও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে খারাপ কিছু মনে করলেন না যে, নসীহতের কথা বলে আবার এর পেছনে শর্ত জুড়ে দেয়া কেন! তিনি অসন্তোষও প্রকাশ করলেন না, বরং তিনি এই সাহাবীর আরয পুরা করলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল কেউ সংক্ষিপ্ত নসীহত কামনা করলে তাকে সংক্ষেপেই নসীহত করতে হবে। কেননা তার হাতে সময় কমও থাকতে পারে। তারও আশা, সামান্য সময়ে কিছু দ্বীন শেখা। সুতরাং তার চাহিদা ঐভাবেই পূরণ করতে হবে যেভাবে সে কামনা করেছে। আর দ্বীনী আলোচনা সংক্ষিপ্তই হওয়া কাম্য। আর তা হতেও পারে। মোটকথা, ঐ সাহাবীর আর্জি মোতাবেক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

لَا تَغْضَبْ

'রাগ করো না।'

এর দ্বারা বুঝা গেল, রাগ এমন একটি বিষয় যার গুরুত্ব তাঁর কাছে এত বেশি যে, সংক্ষিপ্ত নসীহতের সর্বশীর্ষে রেখেছেন একে।

শুরু থেকেই একেবারে রাগ পরিহার কর

আমাদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর তরীকায় রাগ ঐ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাকে সর্বাগ্রে চিকিৎসা করা হত। যখন কোন লোক কোন শায়খের কাছে ইসলাহের উদ্দেশে যায় তখন শুরুতেই তাকে বলা হয়, রাগ করবে না। এমনকি যেখানে রাগ প্রকাশ বৈধ সেখানেও না। আর যেখানে বৈধ নয় সেখানে তো প্রশ্নই আসে না। যেখানে রাগ করার অধিকার আছে ওখানেও রাগ করো না। এতে তোমার প্রকৃতি (طبیعت) স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

তবে এতদসত্ত্বেও যদি কখনও অনিচ্ছাকৃত মুখ থেকে কারো বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক কথা বের হয়ে পড়ে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। ওজর পেশ করবে। বলবে, ভাই! আমার মুখ থেকে এই কথা বেরিয়ে গেছে। বড্ড ভুল করে ফেলেছি। মাফ করে দাও। এমনটা করলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের জন্য রাস্তা খুলে যাবে।

ক্ষমা চাইতে শরম করতে নেই

ক্ষমা চাওয়ার মাঝে কোন লজ্জা-অনুতাপ নেই। কিছু লোক মনে করে, 'জীবন যায় যাক, নাক কাটা না যায়। মাথা যেন কোথাও নীচু না হয়'। এই চিন্তা-কল্পনা খুবই বেমানান। কেননা এটি অহংকারের উপর নির্বহ। অতএব যখন এমন পরিস্থিতি আসবে ক্ষমা চেয়ে নেবে। ক্ষমা চাইলে কী হয়। দুনিয়ায় ক্ষমা চাইলে আখেরাতে পার পেয়ে যাবে। খোদা না করুন, এখানে মাফ করিয়ে নিতে না পারলে মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাকে, তোমাকে ও সকলকে এ কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তিরাশিতম মজলিস

আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত ও তার উপকরণসমূহ

আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও তার উপকরণসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

মহব্বতের উপকরণ (اسباب) ইচ্ছাধীন ব্যাপার

'আল্লাহ তাআলার মহব্বত' ও 'আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক' সম্পর্কিত হযরত থানভী (রহ.)-এর কিছু বাণী এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'খোদাপ্রেম যদিও ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় কিন্তু এর উপায়-উপকরণসমূহ অবলম্বন করা বান্দার ইচ্ছাধীন। তা হচ্ছে এই–
>
> ১. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির। ২. আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহ এবং এর বিপরীতে নিজের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে ভাবা। ৩. কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক রাখা। ৪. ইবাদতে নিরবচ্ছিন্নতা। ৫. আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করা।
>
> এই তাদবীরে কোনও ভুল নেই। কেবলমাত্র একটি জ্ঞানগত ভুলের সম্ভাবনা আছে, যা সতর্ককরণযোগ্য। তা হচ্ছে এই, মনে মনে এই মহব্বতের একটি পর্যায় ঠিক করে তার অপেক্ষা করা ভুল। বরং এক্ষেত্রে এ সমস্ত তাদবীর নিয়মিত পালন করার পর মহব্বতের যেই পর্যায় লাভ হয় তাই এ স্তরে কাম্য। পরে উহার উন্নতি হোক বা এক অবস্থায় থাক– তাতে

সূচিপত্র

কিছু আসে যায় না তবে এটি আরো বদ্ধমূল হয় এরজন্য চিন্তা করতে হবে। মহব্বতের রঙ-ঢংয়ে পার্থক্য হয়েই থাকে।

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৯)

সামান্য এ বাণীতে অনেক বড় বড় বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন দ্বীন অর্জনের সঠিক প্রচেষ্টার মূল। এই যে, আপনারা শোনেন হযরত আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে কেরামের খেদমতে লোকজন জমায়েত হত এবং ওখানে মুজাহাদা ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করত, এ সবের উদ্দেশ্য এই যে, 'তাআল্লুক মাআল্লাহ' বা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া এবং এই সম্পর্ক নিবিড় ও সুদৃঢ় হওয়া। সুতরাং যখন এই বিষয়টি অর্জিত হবে তখন পুরো দ্বীনই হাসিল হয়ে যাবে। কেননা মহব্বত এমনই একটি বিষয় যা কঠিন থেকে কঠিনতর বিষয়কে সহজ করে দেয়।

মহব্বত কঠিন কাজকে সহজ করে দেয়

যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, দ্বীনের প্রতি আমল করা খুবই কঠিন কাজ। এত নামায পড়ো, এত রোযা রাখো, এই পরিমাণ যাকাত আদায় করো ও হজ্জ করো। এর চেয়ে বড় মুশকিল হলো, অমুক গোনাহ থেকে বাঁচো, চোখের হেফাযত কর, কানের হেফাযত করো। সবকিছু থেকে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য মুশকিলই বলা চলে। কিন্তু যে দিন আল্লাহর সাথে মহব্বত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন হবে সেদিন থেকে এসব কাজ সহজ হয়ে যাবে।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

ع - از محبت تلخہا شیریں شود

অর্থাৎ 'মহব্বত পয়দা হলে তখন তিক্ত বস্তু মিষ্ট লাগে।'

সন্তানের প্রতি মায়ের মমতার ফল

একজন মাকে দেখুন, শীত মৌসুম। প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ। বাচ্চা রাতের বেলা বিছানায় প্রস্রাব-পায়খানা করে দেয়। এখন প্রচণ্ড শীতে বিছানা থেকে ওঠা এবং বিছানাপত্র ধোয়া ও কাপড় পরিষ্কার করা কত কঠিন কিন্তু যেহেতু বাচ্চার প্রতি মায়ের মমতা রয়েছে এজন্য সানন্দে তিনি সহজেই এ কাজ করে ফেলেন। যদি এই মাকে কেউ বলে, এই বাচ্চা তোমাকে রাতে কষ্ট দিয়েছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়

তোমাকে বিছানা ছাড়তে বাধ্য করেছে, কাপড় পাল্টিয়ে ছেড়েছে– বাচ্চাটি মরে গেলেই ভাল হত। মা এই প্রস্তাবককে দুশমন ভাববে। বলবে, আমি এ ধরণের হাজারো কষ্ট করার পক্ষপাতি কিন্তু কোন অবস্থায় কলজের এই টুকরার বিরহ সহ্য করতে পারব না। যেহেতু সন্তানের প্রতি মায়ের মহব্বত আছে এজন্য সমস্ত কষ্ট তার জন্য সহজসাধ্য হয়ে গেছে।

বেতনের মহব্বতের পরিণতি

এক লোক রমযানের রাতে ইবাদত করে, সেহ্রীর জন্য জাগে, সাত সকালে উঠে অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, জনাকীর্ণ যাত্রীদের মাঝে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে দরজায় ঝুলে থাকে। অফিসে পৌঁছে টানা আট ঘণ্টা ডিউটি করে। সন্ধ্যায় ক্লান্তিতে নেতিয়ে বাসায় আসে। এমন অজানা আরো কত কষ্ট করে। কিন্তু এসব কষ্ট মুখ বুঁজে এজন্য সহ্য করে যে, বেতনের সাথে তার একটা মহব্বত হয়ে গেছে যা মাসের শেষে প্রাপ্য। যদি কেউ তাকে বলে যে, রমযান মাসে তোমাকে বড় কষ্ট করতে হয়, সাত-সকালে বাদুড়ঝোলা হয়ে অফিসে পা রাখতে হয়, টানা ৮ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করতে হয়। এর চেয়ে বলো, চাকুরীটা ছুটানোর ব্যবস্থা করি। লোকটা এই প্রস্তাবককে দুশমন ভাববে। কেমন এই প্রস্তাব? আমার জীবন নির্বাহের সুন্দর চাকুরিটা সে ছুটানোর পরামর্শ দিচ্ছে। যেহেতু বেতনের প্রতি তার মমতা আছে। এজন্য সাত-সকালে ওঠা, বাদুড়ঝোলা হয়ে বাসে চাপা, টানা ৮ ঘণ্টা ডিউটি সবই তার কাছে প্রিয় লাগে। একেই মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

از محبت تلخہا شیریں شود

'মহব্বত তিক্ত জিনিসকে মিষ্ট করে দেয়।'

মুর্শিদ রাস্তা দেখাবেন

এভাবে দ্বীনের যত কাজ কঠিন মনে হয় তা সহজ বানানোর পদ্ধতি এই যে, আল্লাহ তাআলার মহব্বত অন্তরে পয়দা করতে হবে। সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেলে এর ফলশ্রুতিতে সকল কাজ সহজ হয়ে পড়বে। এ কথাই কোন কবির চরণে ফুটে উঠেছে এভাবে–

ضمارہ قلندر سزا وار بمن نمائی

دراز و دور دیدم راہ و رسم و پارسائی

সূচিপত্র

অর্থাৎ, মুরিদ তার শায়খকে বলছিল, আমাকে মহব্বতের রাস্তা দেখিয়ে দিন। কেননা সৎ ও পরিচ্ছন্ন রাস্তা আমার কাছে দীর্ঘ মনে হচ্ছে যে, নামায পড়, তাহাজ্জুদ পড়, ইশরাক পড়, চাশতের নামায পড়, যিকির করো, দৃষ্টিশক্তি অবনত কর, যবান হেফাযত কর, কান হেফাযত কর, প্রতিটি জিনিস থেকে বাঁচো। এগুলো আমার জন্য খুবই মুশকিল। আমাকে মহব্বতের রাস্তা দেখিয়ে দিন।

এই কবিতার সঠিক মর্ম

কিছু লোকে এই কবিতার ভুল মর্ম বের করেছে। অপব্যাখ্যা দিয়েছে। তা এই যে, কবির ভাষ্য হচ্ছে, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি যা যাহেরী আমাল এগুলো বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন। এগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে আমাকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বাতলে দিন। যেমন নাকি অধুনা জাহেল পীরেরা বাতলে থাকে। যদ্দারা আমি সহজে সুলভে জান্নাতে পৌঁছতে পারি। ওই জাহেলরা কবিতার এই অপব্যাখ্যা করেছে। অথচ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। বরং এই কবিতার সঠিক মর্ম হচ্ছে, 'পরিচ্ছন্নতার' পদ্ধতি আমার কাছে দীর্ঘ মনে হচ্ছে। এর জন্য আমাকে এমন আধ্যাত্ম্য পথ বাতলে দিন যা আমার জন্য সহজসাধ্য হবে। যদিও আমাকে এই একই পথে চলতে হবে। নামায-রোযা পালন করতে হবে। হজ্জ-যাকাত আদায় করতে হবে। আমাকে এমন এক পথের সন্ধান দিন যাতে এগুলো আদায় করা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরই নাম 'তরিকুল কলন্দর' বা 'আধ্যাত্ম্য পদ্ধতি'। হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি ওয়াজের শিরোনাম হচ্ছে, 'তরিকুল কলন্দর'। সেই ওয়াজ এই কবিতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা। বড় অদ্ভুৎ ও বিরল সেই ওয়াজ। সকলের ঐ ওয়াজটি পড়া উচিত।

'তরিকুল কলন্দর' আল্লাহর মহব্বত পয়দা করে

'তরিকুল কলন্দর' হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসা সৃষ্টি করা। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। যেদিন আল্লাহর মহব্বত অন্তরে পয়দা হয়েছে এবং সেটি বদ্ধমূল হয়েছে এরপরে আর ঐ রাস্তা দুর্গম দূরপাল্লার থাকেনি। বরং ঐ রাস্তা হয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও স্বস্তিময়। মনে করুন, এক লোক সফরকে খুব ভয় পায়। তার দ্বারা সাধারণত: সফর হয় না। কেউ যদি তাকে বলে, আমার সাথে লাহোর চলো। লাহোরে তোমার বন্ধু-বান্ধব আছে। সে বলবে, এ আমার সাধ্যাতীত। আমি যাব না। তার জন্য লাহোর যাওয়া মুশকিলই বটে।

লাহোরের সফর সহজ হয়ে গেল

এক্ষণে ঐ লোককে লাহোর নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি এই যে, লাহোরে তার কোন মহব্বতের বস্তু পয়দা করতে হবে। তার সফর সে অবস্থায় সহজ হয়ে

যাবে। উদাহরণস্বরূপ তাকে বলা যেতে পারে, তুমি লাহোর গেলে এই পরিমাণ বেতন পাবে। তোমাকে এই এই সুবিধা দেয়া হবে। এরপর তাকে লাহোর যাওয়ার প্রস্তাব দিলে দেখবেন, যে লোক ইতোপূর্বে বলেছিল, আমার জন্য সফর করা মুশকিল, রেলে কী করে ভ্রমণ করব, কীভাবে টানা ২৪ ঘণ্টা রেলে থাকব– সামান্য টোপ দেওয়ায় সেই লোভে তার সফরের ভীতি শেষ। লোভ মনের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার। এজন্য তার সফর সহজ হয়ে গেছে। ঐ লোকই এক্ষণে বলবে, আমাকে ১০ বার লাহোর সফর করাও। আমি সফর করার জন্য প্রস্তুত। কেননা এক্ষণে তার মহব্বত পয়দা হয়ে গেছে।

সমস্ত খেলাই মহব্বতের

মোটকথা, সবকিছুর মূলে মহব্বতই। যদি অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হয়ে যায় এবং তা বদ্ধমূল হয় তাহলে রাস্তা যত দূরপাল্লার ও বন্ধুর হোক না কেন সহজ হয়ে যায়। চোখের পলকে তা অতিক্রান্ত হওয়া যায়। এ পথে আর কাঠিন্য ও উদ্বিগ্নতা থাকে না। সুতরাং এই আপত্তি আর থাকবে না যে, বুযুর্গদের কাছে কিইবা এমন প্রাপ্তি রয়েছে? তাদের কাছে শিক্ষণীয় এমন কিছু আছে কি, যা অন্যের কাছে নেই? ধর্মীয় শাস্ত্রে ধর্মের কথা মওজুদ। এইসব বুযুর্গদের কাছে এমন কোন তন্ত্র-মন্ত্র নেই, যা তোমাকে আমলের রাস্তায় উঠিয়ে দেবে। বুযুর্গদের কাছে গিয়ে কী পাওয়া যাবে?

আল্লাহওয়ালাদের কাছে আল্লাহর মহব্বত পাওয়া যায়

সত্যি বলতে কী আল্লাহওয়ালাদের কাছে যাওয়ার দ্বারা অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হয়। পয়দা হয় আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক। যা সফলতার চাবিকাঠি। এ দুটি জিনিস হাসিল হলে সবকিছুই হাসিল হবে। যারা বুযুর্গ ও মাশায়েখদের কাছে যান তারা এ দুটি জিনিসের জন্যই যান। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) প্রায়শই এই কবিতা আবৃত্তি করতেন–

زہد زاہد را و دیں دیندار را – اک ذرہ دردِ دل عطار را

কবিতাটি শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর। কবিতার মর্ম এই যে, আপনি যাহেদকে যুহদ দিতে থাকুন এবং দ্বীনদারদের দ্বীন দিতে থাকুন। আত্তারকে স্রেফ হৃদয়ের ব্যথার এক ক্ষুদ্রাংশ দিন। এক্ষণে দুটি কথার মধ্যে বাহ্যত: স্ববিরোধিতা দেখা যায়। কেননা একদিকে এই বলা হচ্ছে যে, আমার না দ্বীন দরকার আছে,

না যুহদ দরকার আছে। অপর দিকে বলছেন, আমাকে হৃদয়ের ব্যথার সামান্য অংশ দিন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি উভয় ব্যাপারটির বিরোধ প্রকাশ করছেন না। বরং তিনি এই বলতে চাচ্ছেন যে, মানুষেরা ভিন্ন পথে দ্বীনের দিকে ছুটছে। আমার তো ওই জিনিস দরকার যে, উহা হাসিল হবার পর যুহুদ এবং দ্বীনদারী ইত্যাদি সবকিছু এমনিতেই তার অনুসরণ করবে। সেই জিনিসটি হচ্ছে, 'হৃদয় ব্যথা' বা 'দরদে দিল'। যে দিন এটি মিলে যাবে সে দিন এই যুহুদ ও দ্বীনদারী তার পেছনে এমনিতেই চলে আসবে। সুতরাং সকল মুজাহাদা ও সাধনার মূখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার 'মহব্বত' অর্জন এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ। মাশায়েখের সংসর্গ এবং শিক্ষা-দীক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্যও কেবল এই দু' জিনিসই।

থানাভনের তিন কুতুব

থানাভনে এক সময়ে একই সাথে তিন বুযুর্গ বসবাস করতেন। যাঁদেরকে 'আকতাবে ছালাছাহ' বা 'কুতুবত্রয়' বলা হয়। এঁদের প্রথমজন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)। দ্বিতীয়জন হযরত শায়খ মুহাম্মদ থানভী (রহ.)। তৃতীয়জন হযরত শায়েখ যামেন শহীদ (রহ.)। এঁরা তিনজনই সমকালীন 'কুতুব' ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের বিস্ময়কর কামালিয়াত দান করেছিলেন। খানকায় তাঁদের কামরার শ্রেণী বিন্যাস এভাবে ছিল যে, প্রথমে হযরত যামেন শহীদ (রহ.)-এর কামরা ছিল। এর পরেরটি হযরত হাজী ছাহেব (রহ.)-এর। সবশেষে হযরত শায়খ মুহাম্মদ থানভী (রহ.)-এরটি। শায়খ থানভী (রহ.) একজন আলেমের পাশাপাশি মোকাম্মাল সুফীও ছিলেন।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর বিতর্কের পরিকল্পনা

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ থানভী (রহ.) ফিকহী বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখলেন। ঐ সময়টায় হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) সবেমাত্র দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর ইলম তাজা ছিল। শায়খ মুহাম্মদ থানভী (রহ.)-এর লিখিত পুস্তিকা পাঠ করে তাঁর সাথে কিছু মতানৈক্য দেখা দিল যে, এর কিছু মাসয়ালা সহীহ নয়। তালিবুল ইলম যখন সবেমাত্র দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করে তখন সে মনে করে 'আমার মত আছে ক'জনা বিদ্যা-বুদ্ধিতে!' মনে করে গোটা দুনিয়ার ইলম তার আয়ত্বে, অপর দিকে জগতের সবাই জাহেল। সুতরাং তাঁর দেমাগে এমন একটি খেয়াল চাপল। তিনি ভাবলেন, লেখকের সাথে তিনি বিতর্ক-বাহাসে নামবেন। লোকদের জিজ্ঞাসা

করলেন, এই মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ থানভী কোথায় থাকেন? লোকেরা বলল, থানাভনে থাকেন। তিনি থানাভনে গেলেন এবং তালাশ করতে করতে অবশেষে খানকা শরীফে উপনীত হলেন।

তর্ক-বাহাস ভুলে গেলেন : লেগে গেলেন অন্য কাজে

খানকায় প্রবেশ করে হযরত হাজী ছাহেব (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি গাঙ্গুহী (রহ.)কে চিনতেন। গাঙ্গুহী (রহ.) তাঁর সাথে ইতোপূর্বে দেখা-সাক্ষাৎ করেছিলেন। গাঙ্গুহী (রহ.)কে দেখে তাই তিনি কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? হযরত গাঙ্গুহী বললেন, শায়খ মুহাম্মদ থানভী (রহ.) বড্ড একখানা কিতাব প্রণয়ন করেছেন! এ নিয়ে বাহাস করতে যাচ্ছি তাঁর সাথে। হযরত হাজী ছাহেব তাঁকে পাশে বসালেন। বললেন, তাওবা, তাওবা! বলো কী! এমনটি করতে যেও না। তিনি বুযুর্গ লোক। বিশাল ব্যক্তিত্ব। তুমি একজন তালিবুল ইলম হয়ে তাঁর সাথে তর্কে নামবে? বড্ড বেয়াদবি হবে। পরে হযরত হাজী ছাহেব এমন কাজে তাকে মশগুল করলেন যে, বাহাসের কথা তিনি ভুলেই গেলেন। তিনি হাজী ছাহেব (রহ.)-এর সোহবতে থেকে বায়আত হলেন এবং যিকির-আযকার ও তালীমে মশগুল হয়ে গেলেন।

যা কিছু দেওয়ার দিয়ে দিলেন

থানাভন এসেছিলেন বাহাস করে সন্ধ্যায়, কিংবা পরদিন ফিরে আসবেন। এজন্য কেবল পরনের কাপড়টি ছাড়া আর কিছু আনেননি। কিন্তু হাজী ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত হয়ে ঐভাবেই থেকে গেলেন। ৪০ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন। পরনের কাপড়টি ধুয়ে পুনরায় পরতেন। এভাবে ৪০ দিন কেটে যায়। ৪০ দিন পর হযরত হাজী ছাহেব (রহ.) বলেন– "মিয়াঁ রশিদ আহমাদ! তোমাকে যা কিছু দেওয়ার দিয়ে ফেলেছি। এক্ষণে আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার কাজ করো। বিশেষ কোন হালত সৃষ্টি হলে কাউকে কিছু না বলে আমার বরাবরে লিখো।"

আল্লাহর মহব্বত দিলেন

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, যখন হযরত হাজী ছাহেব (রহ.) বললেন, "মিয়াঁ রশিদ আহমাদ! তোমাকে যা কিছু দেওয়ার দিয়ে ফেলেছি" তখন আমার বুঝে আসেনি যে, বড় মিয়াঁ আমাকে কী দিলেন? ১২ বছর পরে বুঝে এসেছে কী দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন আল্লাহর মহব্বত। দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক

দৃঢ়করণের তাওয়াজ্জুহ। দিয়েছিলেন এমন অমূল্য দুটি বস্তু যা সকল কল্যাণ ও সংশোধনের চাবিকাঠি।

আউলিয়া কেরামের সোহবতের মূল্য

বিখ্যাত এই কাব্যচরণ–

یک زمانہ صحبت باولیاء - بہتر است از صد سالہ طاعت بے ریا

অর্থাৎ, আউলিয়া কেরামের সাথে ক্ষণিকের সংসর্গ শতবর্ষ রিয়ামুক্ত ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। 'রিয়ামুক্ত'-এর শর্ত জুড়ে দেওয়া আছে। অর্থাৎ, ইবাদতও হবে এবং তা রিয়ামুক্তও হবে। এর চেয়ে উত্তম এই সোহবত। কেউ কেউ এই কবিতার প্রতি আপত্তি তোলেন যে, এখানে অতিরঞ্জন হয়েছে। কেননা যে ইবাদত নিষ্ঠার সাথে করা হয়, তাও দু'-দশ বছর নয় শতবর্ষ পর্যন্ত, তার চেয়ে ক্ষণিকের সংসর্গ উত্তম হয় কী করে?

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেন, এতে অতিরঞ্জনের কিছু নেই। বরং কবি যদি 'এক লাখ বছর' বলতেন অর্থাৎ, এক মুহূর্তের সংসর্গ এক লাখ বছর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত অপেক্ষা উত্তম, তথাপিও অতিরঞ্জন হত না। এজন্য যে, যদি কোন লোক ১ লাখ বছর ভুল পদ্ধতিতে ইবাদত করে যদিও তা নিষ্ঠাপূর্ণ (এর কোন মূল্য নেই)। কেননা ইবাদতে কেবল ইখলাস হলেই চলবে না, পদ্ধতিটিও সঠিক হতে হবে। সুতরাং যদি পদ্ধতিটি সহীহ না হয় তাহলে লাখ বছরের ইবাদতও অর্থহীন। সে কিছুই অর্জন করতে পারবে না এই ইবাদত দ্বারা।

সোহবত দ্বারা মহব্বত; মহব্বত দ্বারা নূর

সুতরাং আউলিয়া কেরামের সোহবত দ্বারা যা অর্জিত হয় তা একে তো ইবাদত এবং ইবাদতের সঠিক পদ্ধতির প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয়ত: আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সুদৃঢ়করণ। কেননা কেউ যদি শত বছর মহব্বতহীন ইবাদত করে তো একদিকে যেমন তার এই ইবাদতে কোনও নূর থাকবে না অপর দিকে তেমন এই ইবাদত সহজও হবে না। সোহবতের পরবর্তী ইবাদতে যেভাবে নূর পয়দা হবে তেমনি ইবাদতটি সহজও হয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ করতে হবে। যদি কেউ এ পথে চলতে চায়, তাহলে তাকে প্রথম উদ্দেশ্য (تعلق مع الله) আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ করতে হবে।

সূচিপত্র

মহব্বতের উপকরণ ইচ্ছাধীন

এক্ষণে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, অন্তরে মহব্বত কী করে পয়দা করা যাবে? কেননা মহব্বত জিনিসটি মানুষের ইচ্ছাধীন নয় বরং ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত। এই প্রশ্নের জবাব হযরত থানভী (রহ.) তাঁর বাণীতে বিবৃত করছেন এভাবে—

"খোদার প্রতি মহব্বত যদিও ইচ্ছাধীন নয় তথাপিও এর উপকরণসমূহ ইচ্ছাধীন। আর তা এই যে–

১. বেশি বেশি যিকির।

২. আল্লাহ পাকের দানসমূহ ও আমাদের আচরণ মূল্যায়ন।

৩. আহলুল্লাহদের কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

৪. আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে ও আনুগত্যে লেগে থাকা।

৫. আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করা। এই তদবীরে কোনও ভুল নেই...।"

এই উপকরণসমূহের পয়লা উপকরণ 'বেশি বেশি আল্লাহর যিকির'। যদি কেউ অধিকহারে আল্লাহর যিকির করে তাহলে এমনিতেই এর পরিণতিতে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হতে থাকবে। এটি পয়লা উপকরণ। আমাদের আজকের সবক এটিই। আসুন, এখন থেকেই আমল শুরু করে দিই। সময়ও ফুরিয়ে এসেছে। হায়াত থাকলে পরবর্তীতে অবশিষ্ট উপকরণসমূহ ইনশাআল্লাহ পেশ করবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

চুরাশিতম মজলিস

অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা মহব্বত পয়দা করার মাধ্যম

অধিক হারে আল্লাহর যিকির করা মহব্বত পয়দা করার মাধ্যম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

ভূমিকা

এর আগে আপনাদেরকে হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি বাণী শুনিয়েছিলাম। এর ব্যাখ্যাও শুরু করেছিলাম। ঐ বাণীতে হযরত যা বলতে চেয়েছেন তার পুরোটাই জুড়ে ছিল তাসাওউফের মর্ম ও মূখ্য উদ্দেশ্য।

তাসাওউফ ও শরীয়ত কী পৃথক বস্তু

আজকাল মানুষেরা মনে করে তাসাওউফ একটি পৃথক বস্তু আর শরীয়তও একটি পৃথক বস্তু। অর্থগত দৃষ্টিকোণে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্যাপারটি ভিন্ন নয়। অর্থগত দৃষ্টিতে পার্থক্য আছে– একথা সত্য। কেননা, 'তাসাওউফ'-এর বিধি-বিধান ভিন্ন আর 'শরীয়তের' বিধি-বিধানও ভিন্ন। কিন্তু এ দু'টি একটি অপরটির জন্য পরিপূরক। শরীয়ত তরীকত ছাড়া অর্থহীন ও নিষ্প্রাণ আর তরীকত শরীয়ত ছাড়া পথভ্রষ্টতা। কেননা কেউ যদি শুধু 'তাসাওউফ' এবং 'তরীকত' নিয়ে বসে যায় এবং শরীয়তের বিধি-বিধান এড়িয়ে চলে তাহলে সেটি নিছক বে-দ্বীনী ও গোমরাহী মাত্র। পক্ষান্তরে কেউ যদি শরীয়তের বিধি- বিধানের ওপর আমল করে কিন্তু তরীকতের বিধানসমূহকে অবজ্ঞা করে এবং এর প্রতি আদৌ গুরুত্বারোপ না করে তাহলে এই শরীয়তও নিষ্প্রাণ ও অর্থহীন হয়ে যায়।

একটি অপরটির জন্য জরুরী

উদাহরণ স্বরূপ: এক লোক নামায-রোযা আদায় করে যা শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত কিন্তু সেই নামায, রোযায় ইখলাস নেই— এই নামায-রোযা নিষ্প্রাণ।

সুতরাং শরীয়ত ও তরীকত একটি অপরটির জন্য জরুরী। অতএব দুটিকে একসাথে একসময়েই অর্জন করতে হবে। তরীকত শরীয়তের বিধি-বিধানে শক্তি পয়দা করে।

এক একটি আমলের সংশোধন মুশকিল

যদি শরীয়তের সকল আহকামের এক-একটির মশক করা হয় এবং এক একটির ভেতরে ইখলাস পয়দা করার চেষ্টা করা হয়, যেমন: প্রথমে নামায ঠিক করার মশক করা হল। এরপর রোযার মশক শুরু হল। এরপর যাকাতের, এরপর হজ্জের, পরে চোখ হেফাযতের, এরপরে কান হেফাযতের মশক; এভাবে এক-একটির পৃথকাকারে মশক শুরু হলে জীবন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মশকের তালিকা শেষ হবে না। সুতরাং এমন একটি বিষয় হাসিল করা জরুরী যদ্দ্বারা সকল জিনিস অর্জন করা সহজ হয়ে যায়। সেই জিনিসের নাম 'আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ'।

বুদ্ধিমতি বাঁদির কাহিনী

হযরত থানভী (রহ.) এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। জনৈক বাদশাহ একবার দরবারে আসীন ছিলেন। আচমকা তার বাদশাহমূলক আবেগ-উত্তেজনা চরমে ওঠল। দরবারীদের উদ্দেশে তিনি বলে উঠলেন, এ সময় দরবারের যা কিছু তোমাদের নজরে ভেসে ওঠছে সোনা, রূপা, হীরা, জহরত ও ফানুস ইত্যাদি আমি ঘোষণা করছি যে, এর যার ওপর যেই হাত রাখবে সবই তার হয়ে যাবে। ঘোষণা হতেই পুরো দরবারে হৈ চৈ পড়ে যায়। কেউ স্বর্ণের দিকে দৌড়ে গেল, কেউ রূপার দিকে, কেউ হীরার দিকে, কেউ জহরতের দিকে, কেউ ঝাড়-বাতি ইত্যাদির দিকে। জনৈকা বাঁদি বাদশাহর কাছটিতে দাঁড়ানো ছিল। সকলে যখন মালামাল সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল সে সময় সে একটা হাত বাদশাহর মাথার ওপর রাখল। বাঁদি ভাবল, ওরা সবাই বেকুফ। ওরা সোনা-রূপার দিকে দৌড়াচ্ছে আর আমি শেকড়ে হাত রেখেছি। আমি যেখানে হাত রেখেছি সেটা পেয়ে গেলে সোনা, রূপা, হীরা-জহরতসহ সব নেয়ামতই পেয়ে যাবো। বাদশাহ বাঁদিকে বললেন, সকলে সোনা-রূপা সংগ্রহে দৌড়াল কিন্তু তোমাকে ব্যতিক্রম দেখছি যে? বাঁদি বলল, আপনি ঘোষণা করেছেন, যে লোক যার ওপর হাত রাখবে তা তার হয়ে যাবে। সুতরাং আমি আপনার ওপর হাত রেখেছি। এক্ষণে আপনি আমার হয়ে গেছেন। রাজত্ব আপনার হাতে। মাল-দৌলত সবই আপনার। ইজ্জত-সম্মানের মালিক আপনি কাজেই এগুলোর সবটুকুতেই আমার আজ থেকে অধিকার।

আল্লাহর মহব্বতের পর সব সহজ হয়ে যায়

হযরত সুফিয়ায়ে কেরামও এই কাজ করে থাকেন যে, তাঁরা বাদশাহর মাথায় হাত রেখে থাকেন। তা এই যে, তাঁরা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর মহব্বত অন্তরে ঠাঁই দেন। আপনারা এটি করতে পারলে দেখবেন সবকিছু পেয়ে গেছেন। কেননা, আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তামাম ইবাদতের বুনিয়াদ। এজন্য হযরত ইরশাদ করেন– এটি হাসিল করার চেষ্টা কর। এটি দেখতে যদিও ইচ্ছাধীন নয় তথাপিও উপকরণ পয়দা করা ইচ্ছাধীন। উপকরণ পয়দা করতে পারলে দেখবে ইনশাআল্লাহ মহব্বত পয়দা হয়ে গেছে। মহব্বত পয়দা করার অনেক উপকরণ হযরত থানভী (রহ.) তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন। এর প্রত্যেকটি নিয়ে অল্প-বিস্তর আলোচনা করবো।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মহব্বত ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার দৌলত অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন! এই উপকরণগুলো সব একসাথে একই সময়ে অর্জন করা জরুরী। সবগুলো এক সময় অর্জন করতে পারলে ইনশাআল্লাহ 'মহব্বত' আমাদের প্রকৃতি হয়ে দাঁড়াবে। এটি অর্জন করতে পারলে সবকিছু অর্জন করা সহজ হয়ে যাবে।

অধিক যিকিরের হুকুম

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও আল্লাহর মহব্বত অন্তরে পয়দা করার প্রথম উপকরণ হচ্ছে অধিক হারে যিকির করা। যত যিকির করা যাবে ততই মহব্বতে প্রবৃদ্ধি হবে। এ কথাই কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ، وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার যিকির করো এবং তার তাসবীহ বয়ান করো।" (সূরা আহযাব : ৪১-৪২)

যিকির দ্বারা আল্লাহর উপকারিতা কী?

আল্লাহ তাআলার এই বাণী যে, 'তোমরা অধিকহারে আমার যিকির করো'– এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এতে কি তাঁর মজা লাগে? কোনও উপকারে আসে? যে ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে এবং সে একথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাক মুখাপেক্ষী নন। গোটা সৃষ্টিজীব সারা জীবন যদি শুধু আল্লাহর যিকিরও করে, অন্য কোন কিছু নাও করে, শুধু সিজদাবনত থাকে তথাপিও তাঁর বড়ত্ব ও বিশালতায় বিন্দুমাত্র প্রবৃদ্ধি হবে না। যদি গোটা মাখলুক আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে এবং আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন থাকে, এমনকি

নাউযুবিল্লাহ মহান আল্লাহ তাআলার শানে গোস্তাখী করে, তথাপিও তাঁর বড়ত্ব ও বিশালতায় সামান্য হেরফের হবে না।

یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزاں: لاالہ الا اللہ

অর্থাৎ, যে অবস্থায়ই দাঁড়াক না কেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর কালিমা স্ব-স্থানে স্থির। ঐ সত্তা মুখাপেক্ষীহীন।

কর্ডোভার জামে মসজিদ

কর্ডোভার জামে মসজিদ দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এক সময় এ মসজিদ সিজদাকারীদের ললাট ছোঁয়ায় আবাদ ছিল। এই মসজিদ, মসজিদে নব্বী নতুনভাবে সম্প্রসারিত হবার পূর্বে ছাদযুক্ত সর্ববৃহৎ মসজিদ ছিলো। এই মসজিদে শুধু এক রাতের বাতি জ্বালানোর জন্য হাজারো লিটার তেল ব্যয় হত। গোটা স্পেনের লোক এসে এখানে নামায আদায় করত। সিজদা করত। জ্ঞান-চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল এটি। আল্লামা কুরতুবীসহ বড় বড় উলামায়ে কেরাম এখানে দরস দিতেন। হাজার বছর ধরে এটি সিজদাকারীদের দ্বারা আবাদ ছিল।

বর্তমানে এ মসজিদের অবস্থা

আজ গিয়ে দেখুন! এই মসজিদটি গির্জায় পরিণত হয়েছে। এখান থেকে সংগীতের সুর মুর্চ্ছনা ভেসে আসে। ছোট্ট একটু জায়গা মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। ওখানে গিয়ে তারা মসজিদ যিয়ারত করে। ওখানে নামায পড়ার অনুমতি নেই। ওখানে যখন আমি গিয়েছিলাম আমার সাথে জনৈক সফরসঙ্গী ছিল। তার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম, কপালে যা আছে এখানে নামায পড়বই। আমার সফরসঙ্গী আযান দিলেন। সময়টা আসরের। আমরা জামাতের সাথে আসরের নামায আদায় করলাম। মসজিদে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়লাম তখন এক ভাবের সৃষ্টি হল। আমি বললাম, এক সময় হাজার হাজার মানুষ সিজদাবনত থাকত এবং 'সুবহানাহা রাব্বিয়াল আলা' এর আওয়াজ গুঞ্জরিত হত এবং এর মীনার থেকে আযানের সুর ওঠত। এর প্রতিটি কোণ ইলমের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল। অথচ আজ কী অবস্থা। আজ আযান দিলাম, ভয় বিহ্বল অবস্থায়। পাছে কেউ দেখে ফেলে কি-না এ আশঙ্কায়। নামায পড়লাম লুকোচুরি করে। কিন্তু ঐ সত্ত্বা তখনও মহান ছিলেন, এখনও মহান আছেন।

یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزاں: لا الہ الا اللہ

তার নিকটে না কোন বসন্ত আছে, না আছে কোন হেমন্ত। যখন লাখো ইনসান সিজদা করছিল তখন তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছিলেন এবং 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' ছিলেন। আর আজ যখন আযানের আওয়াজ শুনে একটি কদমও বাড়ানোর মত কেউ নেই এখনও তিনি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' আছেন।

যিকির দ্বারা উপকার সে তো আমাদেরই

সুতরাং যখন ঐ সত্তার যিকিরকারীর যিকিরের দ্বারা, ইবাদতকারীর ইবাদত দ্বারা, তাসবীহকারীর তাসবীহ দ্বারা, তাঁর মর্যাদায়, তাঁর বড়ত্বে, তাঁর মহত্বে ও একত্বে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি হয় না, তখন তিনি কেন বলছেন যে, আমাকে অধিকহারে স্মরণ কর, আমার যিকির কর? সকাল-সন্ধ্যা আমার পবিত্রতা বয়ান কর। সত্যি বলতে কী বান্দার উপকারের জন্য তিনি এই হুকুম দিচ্ছেন যে, আমাকে অধিক হারে স্মরণ কর। এজন্য যে, বান্দা যখন অধিকহারে আমাকে স্মরণ করবে এবং আমি তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকব তখন আমার সাথে তার মহব্বত পয়দা হবে। সম্পর্ক দৃঢ় হবে। সম্পর্ক যখন দৃঢ় হবে, তখন সে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। তাঁকে খারাপ কাজ থেকে, জুলুম থেকে ও অধিকার হরণ থেকে বাঁচাবে। জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে। এজন্য হুকুম দেয়া হচ্ছে, অধিকহারে যিকির কর।

অধিকহারে যিকির-এর একটি পদ্ধতি

এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, অধিকহারে যিকির-এর কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে? এর একটি পদ্ধতি এই যে, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকির করতে থাক। অন্যান্য কাজ পরিহার কর। 'আল্লাহ আল্লাহ' কর, 'সুবহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' তাসবীহ পড়। 'আলহামদু লিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ' পড়। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়। প্রাচীন কালে বুযুর্গদের কাছে গেলে তারা এ ধরনের বড় বড় যিকির দিতেন। বলতেন, সকল কাজের ধান্ধা ছাড়। ব্যাস কেবল এই কাজ কর। এর ফলে ঐ যুগে সে আল্লাহওয়ালাদের কাজ এমন হত এ যুগে আমরা তা শুনে হতবাক হয়ে যাই।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ঘটনা

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একবার কোন এক রাস্তা অতিক্রম করছিলেন। জনৈকা বৃদ্ধা তাঁকে দেখে বললেন, ইনি সেই লোক, যিনি ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করে থাকেন। অথচ ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করা তাঁর দৈনন্দিন আমলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ছিল না অভ্যাসও। বরং রাতে উঠে তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। কিন্তু বুড়ির এই কথা শুনে তাঁর আত্মসম্ভ্রম জেগে ওঠল যে, এক বুড়ি আমার সম্পর্কে এত সুধারণা পোষণ করছে যে, আমি সারা রাত জেগে ইবাদত করি! ব্যাস, আমি আজ সারা রাত জেগেই ইবাদত করব। ঐ দিন থেকেই তিনি আমৃত্যু ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায পড়ে গেছেন। এই হচ্ছে اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا 'বেশি বেশি আল্লাহর যিকির কর'–এর মর্ম।

দৈনিক সোয়া লাখ 'ইসমে যাত'

যারা নিজ ইসলাহের জন্য মাশায়েখের কাছে যান, মাশায়েখরা তাদেরকে 'ইসমে যাত' (الله শব্দ-এর যিকির) দৈনিক সোয়া লাখ বার পড়তে হবে। ঐ যুগে এটি সাধারণ আমল ছিল।

جس کو ہو جان و دل عزیز

اسکی گلی میں جائے کیوں

"যার জীবন ও মন হয় প্রিয়; সে এই গলিতে যাবে কেন? এ গলিতে যখন যাবে তখন সে মেহনত করবে।"

মাদরাসার মুহতামিমের দায়িত্ব

আমি আমার সম্মানিত পিতা মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) থেকে শুনেছি, দারুল উলূম দেওবন্দের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ছিলেন হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান (রহ.)। বড় সুশৃঙ্খলধর্মী বুযুর্গ ছিলেন। ওই যুগে দারুল উলূম এর ব্যবস্থাপনা খুব সহজ ছিল না। পিতাজী (রহ.) বলেন, মুহতামিম ছাহেব এমন ছিলেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে অসাধারণ শৃঙ্খলা দান করে ছিলেন। তিনি সর্বদা সুশৃঙ্খল অবস্থায় থাকতেন। আপনারা জানেন, যে কোন মাদরাসার অধ্যক্ষ হওয়া বড় খারাপ জিনিস। اهتمام শব্দটি هم শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ চিন্তা। এজন্য মুহতামিম ছাহেবকে সর্বদা চিন্তা ও শঙ্কার মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। সর্বদা দরোজায়

কেউ না কেউ আসতেই থাকে। ঘণ্টা বাজতেই থাকে। টেলিফোনের টুং টাং আওয়াজ হতেই থাকে। নামায শেষ করে ঘর পর্যন্ত পৌঁছা রীতিমত মুশকিল হয়। কেউ না কেউ কোন না কোন অভিযোগ-অনুযোগ ঠুকবেই। এজন্য এ দায়িত্ব বেশ মুশকিলই বটে।

দেওবন্দের মুহতামিম ছাহেবের যিকরুল্লাহর পরিমাণ

এই মুহতামিমের দায়িত্ব এমনই একটি বিষয় যে, এর সাথে দুটি বিষয় খুব সহজে পেরে ওঠা যায় না। প্রথমত: লেখালেখি, দ্বিতীয়ত: যিকরুল্লাহ। মাওলানা হাবীবুর রহমান (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন, কিন্তু তার প্রাত্যহিক কাজ এই ছিল যে, সোয়া লাখ বার 'ইসমে যাত'-এর যিকির করতেন। কোনদিনও তাঁর এই আমল ছুটত না। এই পথ অবলম্বন করলে একটু মেহনত করতেই হবে। সুতরাং যিকরুল্লাহর আমল করলে অন্তরে মহব্বত পয়দা হবে।

আল্লাহর রহমত দুর্বলের প্রতিও হয়

আল্লাহর রহমত যেভাবে শক্তিধরের প্রতি হয়, দুঃসাহসীর প্রতি হয়, সেভাবে দুর্বল ও স্বল্প সাহসীর প্রতিও হয়। যদি আমাদেরকেও মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেবধর্মী অযীফা বাতলে দেয়া হয় তাহলে আমাদেরকে খুঁজেই পাওয়া যেতো না। এজন্য প্রতি যুগেই 'মুজাদ্দিদ' প্রেরণ করা হয়। তিনি দ্বীনের মাঝে সংস্কার করেন এবং মৃতপ্রায় সুন্নাহকে জিন্দা করেন। তিনি জনগণের জন্য তাদের মেজায, চরিত্র এবং তাদের অভিরুচি ও যোগ্যতামাফিক কর্মসূচি তৈরি করেন।

দুর্বলদের মত আমলযোগ্য কাজ কর

আমাদের মুরুব্বী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)কে আল্লাহ পাক মুজাদ্দিদ করে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যদি প্রাচীন কালের বুযুর্গদের মুজাহাদা ও যিকির-আযকারের কথা বলতেন তাহলে সকল লোক তাঁর দরবার থেকে পলায়ন করত। কেউ তাঁর পথে আসত না। এজন্য তিনি বলতেন, তোমরা দুর্বল। এজন্য দুর্বলের আমলটি কর।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর বায়আত হওয়ার ঘটনা

আমার পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) সর্বপ্রথম শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর হাতে বায়আত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরে তিনি চিন্তা করলেন, এখন কার হাতে বায়আত হব? হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর হাতে বায়আত হওয়ার চিন্তা করছিলেন। কিন্তু ওখানকার কড়া নিয়ম-কানুন ও মুজাহাদার কারণে সাহস পাচ্ছিলেন না– যে কী করবেন? আমাদের দাদা হযরত মাওলানা

ইয়াসীন ছাহেব (রহ.) হযরত থানভী (রহ.)-এর সতীর্থ ছিলেন। দাদাজান আব্বাজানকে থানাভনে নিয়ে গেলেন। ওখানে গিয়ে আব্বাজানকে বললেন, তুমি থানভী (রহ.)-এর হাতে বায়আত হও। আব্বাজান বলেন, আমি হযরত থানভী (রহ.)-এর সমীপে আরয করলাম, হযরত! তবিয়তে বায়আত হওয়ার চাহিদা বেশ, পাশাপাশি ইসলাহ-এর ফিকিরও আছে, কিন্তু বায়আত হতে এজন্য ভয় করছি যে, আমার হিম্মত খুবই কম। আমার দ্বারা কিছুই হবে না। আমার দ্বারা খুব একটা যিকিরও হবে না। ইবাদতের তেমন একটা আশাও করা যায় না। মুজাহাদা-রিয়াযত আমার দ্বারা হবে না। এজন্য ভয় করছি বায়আত হলে আমার দ্বারা যখন কোন কাজই হবে না, তখন বায়আত হয়ে লাভ কী?

এই দ্বীন সকলের তরে

দ্বিতীয়ত: আমার ব্যস্ততা অনেক। পঠন-পাঠনের ব্যস্ততা। (ঐ যুগে আব্বাজান ১৮টি ক্লাস নিতেন) সামান্য ফতোয়ার কাজও করে থাকি। হযরত থানভী (রহ.) আব্বাজানের কথা শুনে বললেন, আরে ভাই! কিসের চিন্তায় পড়েছ তুমি? দ্বীন কি কেবল শক্তিধরদের জন্য? দুর্বলদের জন্য নয়? এই যে তুমি বলছ, আমি বহু কর্মে লিপ্ত– তাহলে দ্বীন কী কেবল অবসর লোকদের জন্য? কর্মব্যস্ত লোকদের জন্য নয়? (আব্বাজান বলেন, থানভী (রহ.)-এর দুটি কথায় আমার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।) আমি তোমাকে এমন তরীকা বলে দেব যাতে না তোমার অধিক মেহনত করতে হবে, না অধিক সময় ব্যয় করতে হবে। তবে আমি তোমাকে একটি কথা বলছি! গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। গোনাহের হাত থেকে বাঁচার জন্য শক্তি ব্যয় করতে হবে না। দরকার শুধু ইচ্ছাশক্তি খরচের– দৈহিক শক্তির নয়। গোনাহ করার জন্য দৈহিক শক্তির দরকার হয়– গোনাহ থেকে বাঁচতে সময়েরও দরকার হয় না। বরং গোনাহে লিপ্ত হতে সময় দরকার হয়। দ্বিতীয়ত: অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা অনর্থক কাজে সময় অপচয় হয়, শক্তিও খরচ হয়। সময় পেলে কিছু আমল নির্ধারণ করে নেবে।

যাকের কে? যিকির-এর ব্যাপক অর্থ

দেখুন, প্রাচীন কালের সুফিয়ায়ে কেরাম বলতেন, সোয়া লাখ বার ইসমে যাত-এর যিকির করো। আর হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যদি সময় পাও কিছু আমল নির্ধারণ করে নাও। কিন্তু এই পার্থক্য কেন? সত্যি বলতে কী, তিনি যা বলেছেন তা 'কলন্দরী তরীকা'। আর তা হল, মুখে যিকির হোক বা না হোক আল্লাহর সাথে সর্বদা তোমার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে হবে– যা সবকিছুর মূল। কেননা যিকির শুধু মুখে 'আলহামদু লিল্লাহ' আর 'সুবহানাল্লাহ' বলার নাম নয়।

সূচিপত্র

প্রকৃত যিকির বলা হয় আল্লাহকে কোন না কোনভাবে স্মরণে রাখা। যেমন: আপনি যদি শোকর করেন তাহলে সেটি এক ধরনের যিকির। যদি সবর করেন এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন তো এটিও এক ধরণের যিকির। আল্লাহ্ তাআলার কাছে পানাহ্ চাওয়াও এক ধরণের যিকির। এমনকি বুযুর্গরা বলেন, كُلُّ مُطِيْعٍ لِلّٰهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ আল্লাহর আনুগত্যমূলক যে কোন কর্মকাণ্ডই যিকির এবং আল্লাহর আনুগত্যকারী সকল মানুষই যিকিরকারী। যদি নিয়ত সহীহ্ করে নেন, ইখলাস পয়দা করেন, যদি স্বীয় কেবলাহ্ দুরস্ত করে নেন, তাহলে সবক পড়ানোও যিকির। যা কিছু অধ্যয়ন করেন তাও যিকির। যদি কোন ডাক্তার মাখলূকের খেদমতের উদ্দেশে ডাক্তারী করে সেটিও যিকির। যদি ব্যবসা করে, যদি শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে মানুষের অধিকার পূর্ণ করার জন্য দোকানে বসে ইখলাসের সাথে হালাল ব্যবসা করে তাহলে সেটিও যিকির। কেননা এটা كُلُّ مُطِيْعٍ فَهُوَ ذَاكِرٌ -এর মধ্যে শামিল।

বিগত দিনের জন্য ইস্তিগফার কর

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, তোমাদেরকে চারটি আমল বলছি, (প্রকৃত পক্ষে এর চেয়ে উত্তম, এর চেয়ে সহজ এবং এর চেয়ে উপকারী আমল আর কী হতে পারে) আর তাহলো, যখন বিগত দিনের কথা মনে আসবে, গোনাহের কথা স্মরণে আসবে যে, অমুক সময় আমি এই গোনাহ করেছিলাম, এই ভুল করেছিলাম। সুতরাং বিগত দিনের ভুলের জন্য ইস্তিগফার কর। বল–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

কেননা সত্যিই যদি কোন গোনাহ্ করে থাকে আর এক্ষণে স্মরণে আসতে থাকে এবং এর জন্য তাওবা করতেই হয়। কিংবা কোন কাজ যদিও গোনাহ্ ছিল কিন্তু তোমার জানা ছিল না যে, এটি গোনাহ; এজন্য তুমি ইস্তিগফারও করোনি। সুতরাং এগুলোর পক্ষ থেকে ইস্তিগফার করে নাও। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিগফারের মধ্যে এই দু'আ করতেন–

وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، فَاِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! আমাদের এই গোনাহগুলো ক্ষমা করুন, যেগুলো আপনার জানা আছে। কেননা অনেক গোনাহ আছে যা আপনি জানেন আমরা জানি না। কাজেই অতীতের কল্পনা মনে আসলে ইস্তিগফার কর।

বর্তমানের উপর শোকর বা সবর করো

বর্তমানে যে সময় আমরা অতিক্রম করছি। এ সময়টি দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। এ সময়টিতে হয় আপনার খুশী-আহলাদ থাকবে কিংবা এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হবেন, যা তবিয়তের জন্য অসহনীয় অপসন্দনীয়— এজন্য আপনার কষ্টও হচ্ছে। যদি খুশি-আনন্দের ঘটনার সম্মুখীন হন তাহলে আল্লাহর শোকর আদায় করুন এবং বলুন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

হে আল্লাহ! আপনার হামদ ও আপনার শোকর। যেমন: এই সময় আমরা মসজিদে আরামে বসে আছি। পাখা চলছে। গরমে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। দ্বীনের তলবে আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসেছি। এজন্য মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করুন। বলুন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, পাখা বন্ধ হয়ে যায়, গরমে কষ্ট হতে থাকে তো এর জন্য সবর করুন। বলুন–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

কিছু লোক মনে করে কেবল মানুষ মারা গেলেই এই দু'আ পড়তে হয়। এটি ভুল, বরং প্রতিটি কষ্টদায়ক বস্তুর ক্ষেত্রে, অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে এই দু'আ পড়া যাবে। বলতে হবে, হে আল্লাহ! এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে দূর কর, এই গরমকে শীতল কর।

অন্তরে অন্তরে শোকর

মোটকথা, বর্তমান কালে কোন মনোপুত পরিস্থিতির উদ্রেক হোক বা অবাঞ্ছিত কোন ঘটনার; যদি মনোপুত পরিস্থিতি হয় তাহলে মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় কর। তবে এই শোকর যদি মুখে আদায় করা যায় তাহলে আরো ভাল। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আমাদের শায়খ আরেফ বিল্লাহ হযরত ডা. আবদুল হাই রহ. বলতেন, তোমরা মনে মনে শোকর আদায় করার দ্বারা কী বিরাট কাজ করলে জানো! কেননা, ভেতরে ভেতরে তোমরা বিশাল এক ইবাদত আঞ্জাম দিয়ে ফেলেছো। অযু করে দু' রাকাত নামায আদায় করলে হাজারো মানুষে দেখত। তাতে রিয়ার (লৌকিকতা) সম্ভাবনা ছিল, ছিল আত্মপ্রসিদ্ধির ব্যাপারটিও, কিন্তু এখানে যখন তুমি মনে মনে

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

বলছো তখন অনেক অনেক উঁচু কাজ করে ফেলেছো।

میان عاشق و معشوق رمزیست

کراما کاتبین راہم خبر نیست

প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মনের সম্পর্কটুকু দু' কাঁধের কেরামান কাতিবীনও জানেন না।

শোকর এক বিশাল ইবাদত

এই শোকর কি কোন সাধারণ ইবাদত? এত বড় ইবাদত, যার উল্লেখ করতে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন–

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

অর্থাৎ, যে লোক খানা খেয়ে শোকর আদায় করে সে ধৈর্যশীল রোযাদারের সওয়াব পাবে। এই শোকর এমনই একটি ইবাদত, যা মানুষকে শয়তানের হামলা থেকে হেফাযত করে। সুতরাং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নেয়ামত যার দিকে বান্দার কল্পনাও যায় না এর দিকে কল্পনা নিয়ে যাও এরপর শোকর আদায় কর।

না-শোকরীর শব্দ মুখ থেকে বের করো না

আল্লাহ হেফাযত করুন (আমীন), কিছু লোকের অভ্যাস এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সর্বদা কু-কাজের প্রতি ধ্যান-খেয়াল রাখে। যেমন, কোন ঘটনার দুটি দিক আছে তন্মধ্যে একটি অন্ধকার, ধ্যান-খেয়াল সাধারণত: এ দিকেই যায়; ভালটির দিকে যেতে চায় না। অনেক লোক এমনো আছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেমন আছেন? তারা এর জবাবে কিছু না কিছু উল্টা সিধা বলবেই। অথচ পূর্বেকার মুসলমানদের কুশল জানতে চাইলে তারা প্রত্যুত্তরে বলতেন, 'আল্লাহর শোকর, আলহামদু লিল্লাহ'। কিন্তু আজকাল ভাল-তাগড়া মানুষের কাছে কুশল জানতে চাইলে তারা জবাবে বলেন– কী বলব ভাই, কী এমন ভাল থাকব, দিনকাল যা পড়ছে না। কেউ কেউ তো এমনও বলেন যে, এই কোনক্রমে সময় কাটছে আর কী। অর্থাৎ, নানা মুসিবতের মধ্যে দিয়ে দিনক্ষণ অতিক্রম করছি। সুতরাং কোনক্রমে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছি। এই জবাবের সার-নির্যাস হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি কষ্ট দিতে কোন কসুর করছেন না, নাউযুবিল্লাহ। এ

সূচিপত্র

ধরনের অকৃতজ্ঞতামূলক কথা যবান থেকে বের না করা চাই। খোদার দিকে চেয়ে এই ধরণের কথা থেকে বাঁচুন। আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণে রাখুন।

শোকরের অভ্যাস কর নেয়ামতের ধ্যান কর

প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর নেয়ামতের যে বারিবর্ষণ হচ্ছে, যে অসংখ্য অগণিত নেয়ামত প্রতি মুহূর্তে হাসিল হচ্ছে– এর সম্মুখে সামান্য এই কষ্ট-মুসিবতের কোন বাস্তবতা নেই। আজ আমরা এই নেয়ামতগুলো দেখছি না এবং সামান্য কষ্টেই হৈ চৈ শুরু করে দিচ্ছি। সুতরাং এই নেয়ামতের শোকর আদায় করা শুরু করে দাও। একে অভ্যাসে পরিণত কর। এটি অভ্যাসে পরিণত হলে নেয়ামতের প্রতি নজর পড়বে। সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কোন কোন নেয়ামতের মোকাবেলায় শোকর আদায় করতে হবে। যখন চিন্তা-ফিকিরের অভ্যাস হয়ে যাবে এবং নেয়ামতের প্রতি নজর পড়বে তখন এই বাস্তবতা সামনে এসে যাবে।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের গণনা করলে, গুণে শেষ করতে পারবে না। সুতরাং নেয়ামতের কল্পনা কর এবং সেগুলো সামনে রেখে শোকর আদায় কর। মোটকথা, বর্তমান সময়কে নিয়েই শোকর আদায় কর কিংবা সবর কর।

কষ্ট কমই আসে

সর্বদা এই চেষ্টাই করবে যেন সবরের চেয়ে শোকর বেশি করা হয়। কেননা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত কষ্টদায়ক জিনিসের চেয়ে বেশি থাকে। কষ্টদায়ক জিনিস তো কম ও বিরল হয়ে থাকে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

অত্র আয়াতে وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَوْفِ বলা হয়নি বরং بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ বলা হয়েছে। এখানে 'তানবীন' 'ক্ষুদ্র' অর্থে ব্যবহৃত, যার অর্থ আমি তোমাদেরকে সামান্য ভীতি দ্বারা পরীক্ষা করব। সামান্য ভুখা রাখব, তোমাদের জান-মাল ও ফসলাদি কম করে পরীক্ষা নেব এবং এই পরীক্ষার উপর ধৈর্যশীলদের এত বিশাল পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন।

সবরের ওপর শোকর প্রবল থাকা চাই

সুতরাং কষ্টদায়ক জিনিস কম– নেয়ামতধর্মী জিনিস বেশি। নেয়ামত সব সময়ই অধিক থাকে। অতএব শোকর সবরের ওপর প্রবল থাকতে হবে। এভাবে

তোমার যবান সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকিরে আদ্র থাকা চাই। আল্লাহর শোকর তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হোক। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে শোকর জারী থাক। যেমন: কোথাও যেতে চাচ্ছ, আরামদায়ক বাহন পেলে, তাহলে বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

গাড়ীতে বসার জায়গা পেয়েছো, বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

সুন্দর সবুজ-শ্যামল দৃশ্য সামনে এসেছে, বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

বাতাসের ঝাপটা এসেছে, বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

ঘরে প্রবেশ করে বাচ্চাদের খেলতে দেখে মনটা ভাল লাগছে, বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

খাবার সামনে এসেছে, বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

ক্ষুধা মিটছে, বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

খাবার মজাদার হয়েছে, বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

সর্বদা যবানে শোকরধর্মী এ বাক্য জারী রাখুন। এবার বলুন এ বাক্যটুকু বলতে কী খুব ক্লান্তি আসছে? কষ্ট অনুভূত হচ্ছে? খুব একটা সময় ব্যয় হচ্ছে? সব ঠিকঠাক আছে অথচ যবানে যথারীতি খোদার যিকির জারী থাকছে। কারো খবরই নেই যে, বান্দা আল্লাহর যিকির করছে। কিন্তু যে সত্তার খবর থাকার দরকার তিনি জানছেন– আমার বান্দা আমার শোকর আদায় করে চলছে। যখন সে আল্লাহর যিকির করছে প্রতিটি যিকিরে আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক নিবিড় হচ্ছে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিবিড় হচ্ছে

বান্দা যখন প্রতিটি নেয়ামতের বদৌলতে আল্লাহর শোকর করছে এবং মুসীবতের বদলে সবর করছে কিংবা আল্লাহ তাআলার সমীপে দু'আ করছে, তো এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক নিবিড় হচ্ছে। এর নামই 'তাআল্লুক মাআল্লাহ'।

মনের মধ্যেই তাঁকে পেয়েছি

হযরত মাজযূব ছাহেব (রহ.) একটি কবিতায় বলেন–

وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے

میں جا رہا تھا دور کا ساماں کئے ہوئے

অর্থাৎ, আমি তো কখনো এদিকে পলায়ন করছিলাম কখনও ওদিকে। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিওয়ালা যখন আমাকে পথ দেখালেন এবং বললেন যে, এতদূর যাওয়ার দরকার নেই। তখন তাঁকে আমার অন্তরেই পেয়ে গেছি। যখন তুমি সর্বদা শোকর করবে এবং দু'আ করতে থাকবে এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে যেতে থাকবে, তখন দেখবে তিনি অন্তরেই আছেন। এগুলো সব বর্তমান কালের কাজ।

ভবিষ্যতের ব্যাপারে পানাহ চাও

এক্ষণে রয়ে গেল ভবিষ্যতের ব্যাপারটি। ভবিষ্যত নিয়ে মানুষের মনে শঙ্কা পয়দা হয়– কি থেকে কি হয়ে যায়। ব্যবসায় ক্ষতি না হয়ে যায়। আমার পরীক্ষা নিকটবর্তী, পরীক্ষায় ফেল করে না বসি। আমি পড়াশুনা সমাপণ করতে যাচ্ছি, জানিনা চাকুরী পাব কি-না? কোনও উদ্বিগ্নতা না জানি আমাকে পেয়ে বসে। কারো থেকে কোন ঋণ নিতে না হয়। এ ধরণের হাজারো শঙ্কা দিল-মনে উঁকি দেয়। এর চিকিৎসা হচ্ছে, মনে যখন কোন শঙ্কার সৃষ্টি হয় তখন বলবে–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ

হে আল্লাহ! আমার মনে এই শঙ্কা পয়দা হচ্ছে। এই শঙ্কা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। নিজকে আপনার সমীপে সোপর্দ করছি। এ ধরনের সকল শঙ্কা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

এই বান্দা যিকিরকারীদের মধ্যে গণ্য

এক্ষণে যে বান্দা অতীতের প্রতি মুহূর্তে ইস্তিগফার করে আসছে, বর্তমানে শোকর আদায় করছে, কিংবা ধৈর্য ধারণ করছে এবং ভবিষ্যতের শঙ্কা থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছে সে বান্দার কোন একটি মুহূর্তও আল্লাহর যিকির থেকে মুক্ত নয়। সে প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর যিকিরে রত আছে। এরই নাম 'যিকিরে ক্বালবী' বা 'আত্মার যিকির'। এর দ্বারা ঐ 'তাআল্লুক মাআল্লাহ'– যা বড় বড় মুজাহাদা ও সাধনা দ্বারা অর্জন করা যায়– অর্জিত হয়ে যায়। ব্যাস এটি অবলম্বন করতে দেরি কেন। মোটকথা, 'অধিক যিকরুল্লাহ' একটি সহজ, উপকারী ও অশেষ প্রতিক্রিয়াধর্মী তরিকা, যা হযরত থানভী (রহ.) এই বাণীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

নেয়ামতসমূহ নিয়ে ভাবুন

কিন্তু কোন কাজ শুধু বলার দ্বারা হয় না। বরং ঐ কাজের মশক করতে হয়। এটি অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। সুতরাং সবার আগে আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যেমন: আমরা এখন বসে আছি। এক্ষণে আল্লাহ তাআলার কোন কোন নেয়ামত আমরা লাভ করেছি? আমাদের মন এ দিকে যায় না। কিন্তু ভেবে ভেবে স্মরণ করুন। আপাদমস্তকে আমাদেরকে কী কী নেয়ামত দিয়েছেন। কী সহজে-সুলভে তা অর্জন করার তাওফীক দিয়েছেন। এটি অধিক পরিমাণ আল্লাহ তাআলার যিকিরের পয়লা কদম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অধিকহারে যিকির করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পঁচাশিতম মজলিস

দু'আয়ে মাছূরা

(কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ)

অধিক যিকিরের উত্তম পন্থা

দোয়ায়ে মাছুরা
(কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ)
অধিক যিকিরের উত্তম পন্থা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

ভূমিকা

গত দু'দিন ধরে একথা চলছিল যে, গোটা তরীকত, তাসাওউফ এবং সুলুকের খোলাসা এই যে, আল্লাহ তাআলার মহব্বত অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। তাঁর সাথে সম্পর্কটি এমন মজবুত করতে হবে, যেন সর্বদা তাঁর ধ্যান-খেয়াল অন্তরে জাগরূক থাকে। যদি এই জিনিসটি হাসিল হয় তাহলে দ্বীনের সকল আহকাম পালন সহজ হয়ে যাবে।

পরিভাষার চিন্তা ছাড়ুন

আমাদের শায়খ আরেফ বিল্লাহ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, পরিভাষার চিন্তা মাথা থেকে মুছে ফেল। তাসাওউফে বহু পরিভাষা আছে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে এ পর্যায়ের সম্পর্ক কায়েম হয়ে গেলে এই নাম আর এর চেয়ে অধিক হলে এই নাম। সবচেয়ে বেশি ও চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে 'ইয়াদ দাশ্‌ত'। যার মর্ম হচ্ছে, সর্বদা আল্লাহ তাআলার ধ্যান-খেয়াল থাকবে। কিন্তু হযরত ডা. ছাহেব বলতেন, পরিভাষাসমূহের ধ্যান-খেয়ালে পড়ে থেকো না। অনেকে এই ফিকিরে লিপ্ত থাকে যে, এখন যে ফিকিরে লিপ্ত আছি তা কোন

প্রকারের। কীইবা এর নাম? হযরত বলতেন, তোমাদের আম খাওয়ার ফিকির হওয়া চাই। থোকা বা কাঁদি গণনার দরকার কী? ওই জিনিস যদি তোমাদের হাসিল হতে থাকে তাহলে সেটি আল্লাহর নেয়ামত মনে করে তার শোকর আদায় কর। যেমন, কেউ রেলগাড়িতে চড়ে লাহোর যাচ্ছে। এক্ষণে সফরের একটি তরীকা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি স্টেশনের নাম স্মরণ করতে থাকবে। বলবে, অমুক অমুক স্টেশন পথিমধ্যে পড়বে। অমুক অমুক স্টেশনে গাড়ী থামবে। আরেকটি তরীকা এই যে, ঘুমিয়ে থাকবে। সকালে জাগলে ইনশাআল্লাহ লাহোর পৌঁছে যাবে। যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, পথিমধ্যে কোন কোন স্টেশন পড়েছিল– তাহলে সে স্টেশনের নাম বলতে পারবে না। কিন্তু লাহোর পৌঁছে যাবে।

প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহর স্মরণ হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়া

তাসাওউফের পরিভাষাসমূহ অন্তরে ঠাঁই দেওয়ার জরুরত নেই। তবে তাসাওউফের মূখ্য উদ্দেশ্য, হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ বদ্ধমূল করা। আল্লাহর মহব্বত অন্তরে ঠাঁই দেওয়া ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। হযরত থানভী (রহ.) তাঁর বাণীতে আল্লাহ তাআলার মহব্বত হাসিল করার উপকরণ বয়ান করেছেন। প্রথম উপকরণ: অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা। অর্থাৎ, মহান আল্লাহর যিকির অধিকহারে করা– গতকাল এর বয়ান শুরু করেছিলাম।

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আর গুরুত্ব দিন

অধিকহারে যিকিরের উদ্দেশ্য যে তরীকা দ্বারা হাসিল হয় তন্মধ্যে একটি তরীকা হচ্ছে, দু'আয়ে মাছুরা বা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অদ্ভুৎ তরীকা বাতলিয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য তিনি একটি হলেও দু'আ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন, সকালে ঘুম থেকে জেগে এই দু'আ পড়। গোসলখানায় প্রবেশ করতে গিয়ে এই দু'আ পড়। বাইরে বেরুলে এই দু'আ পড়। অযু করলে এই দু'আ পড়। অযু শেষ করলে এই দু'আ পড়। মসজিদে ঢুকতে গেলে এই দু'আ পড়। মসজিদ থেকে বেরুতে এই দু'আ পড়। খানা সামনে এলে এই দু'আ পড়। খানা শেষ হলে এই দু'আ পড়। দস্তরখান বিছালে এই দু'আ পড় ইত্যাদি। এভাবে তিনি নানা প্রকারের দু'আ পড়া শিখিয়েছেন।

এই দু'আগুলোকে মামুলি মনে করো না

মানুষ এ দু'আগুলোকে মামুলি মনে করে। মনে করে কোথাও এগুলো না পড়লে এমন কীইবা এসে যায়। খাস করে মৌলভী সাহেবান মনে করেন,

দু'আগুলো তো মুস্তাহাব। আর মুস্তাহাবের সংজ্ঞা হলো, পড়লে সওয়াব আছে, না পড়লে গোনাহ নেই। সুতরাং দু'আ পড়ার জরুরত কী? সুতরাং তারা দু'আর প্রতি গুরুত্ব দেন না। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি দু'আ যথাস্থানে পড়ার উপকারিতা বিরল, বিস্ময়কর ও অশেষ।

এ সমস্ত দুআ আল্লাহ প্রদত্ত

প্রথমত: এক একটি দু'আ এমন যে, এর একটি দু'আও যদি আল্লাহর দরবারে মঞ্জুরির মর্যাদা পেয়ে যায় তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ অতিক্রান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তাছাড়া দু'আর শব্দগুলোর মাঝে নূর আছে। অর্থের মাঝে নূর আছে। এর উপকারিতায় নূর আছে। মোটকথা, দু'আর ভেতরে-বাইরে কেবল নূর আর নূর। আমি মনে করি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দু'আসমূহ তাঁর 'নবুওয়াতি সত্ত্বার' অত্যুজ্জ্বল দলীলও বটে। কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ঐভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ কামনা করা যেভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তিনি যে যে শব্দে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন তা আমাদের কল্পনায়ও আসতে পারে না। দুনিয়া-আখেরাতের হাজতকে সামনে রেখে তিনি যে উত্তমভাবে দু'আ করেছেন সেভাবে আর কারো পক্ষে দু'আ করা সম্ভব নয়। এজন্য আমি বলি, দু'আগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতি সত্ত্বার প্রকৃষ্ট দলীল। কেননা এ দু'আগুলো ওহীর আদেশ ছাড়া কোনও মানুষের পক্ষে বিবৃত করা সম্ভব নয়। এমন এমন সমন্বিত বাক্য, ছন্দবদ্ধ বাক্য, হতবাক করা গাঁথুনি ও ঐশী ছোঁয়া অসম্ভব। আমার মন চায় এ সমস্ত দু'আর ব্যাখ্যা করতে। সুতরাং বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদে (পাকিস্তান) আমি এর ব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। (আলহামদু লিল্লাহ আমার সে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। লেখা আকারে তা ছেপেও এসেছে। ইসলাহী খুতুবাত ১৩ নং খণ্ড ঐসব দু'আরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ।)

প্রতি কাজের শুরুতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক

দু'আসমূহের নেপথ্যে অর্থের পৃথিবী বিরাজমান। সুতরাং দু'আসমূহ একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়াধর্মী, অপরদিকে তেমন জীবনের বাঁকে বাঁকে নানা স্থানে বিভিন্ন দু'আ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আপনি যদি কোন এক স্থানে বসে দু'আ করতে চান তাহলে কত দু'আ করবেন বলুন? হাজার বার, পাঁচ হাজার বার, কিংবা এর চেয়ে বেশি। কত বেশি দশ হাজার করবেন? কিন্তু এর থেকে

ফারেগ হয়ে অন্য কাজে লিপ্ত হলে গাফেল হয়ে যাবেন। তাই আপনাকে যিকিরের এমন তরীকা বাতলে দিচ্ছি যে, আপনি যে কাজ করবেন, সে কাজের মধ্যেও যিকিরের উদ্দেশ্য নিহিত পাবেন। এমনকি আপনি যদি (বায়তুল খালায়) বাথরুমে যান ওখানেও যিকির এর উদ্দেশ্য লাভ হবে। যদি ওখান থেকে বেরোন যিকির কার্যকরী তখনও। মোটকথা, সকল কাজে আল্লাহর যিকিরের আপনাকে ফযীলত দান করছেন এবং সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ হচ্ছে।

খোদায়ী পাওয়ার হাউজের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যাবে

আমাদের শায়খ ডা. আবদুল হাই ছাহেব আরেফী (রহ.) বলতেন, তোমাদের ঘরে বিদ্যুৎ আছে। যখন তুমি সুইচ টিপবে তখন পাওয়ার হাউজের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবে। পাওয়ার হাউজ থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ আসার জন্য অসংখ্য তার আছে। অগণিত খামবা আছে। অসংখ্য ট্রান্সফরমার আছে। এগুলোর মাধ্যমে হাজারো মাইল দূর থেকে বিদ্যুৎ তোমার ঘরে আসছে। যখনই তুমি সুইচবোর্ডে হাত রাখছ তখনই হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলছ। পাওয়ার হাউজের সাথে কানেকশান দিয়ে ফেলছ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আসমূহ শিখিয়ে প্রকারান্তরে এই বলতে চাচ্ছেন যে, বার বার তোমার সুইচ অন করতে থাক, যখন যখনই তুমি তোমার দু'আর সুইচ অন করবে তোমার সম্পর্কের তারে খোদায়ী পাওয়ার হাউজের জোড়া লেগে যাবে।

আল্লাহর দরোজায় বার বার করাঘাত করো

পার্থিব অন্যান্য সম্পর্কের অবস্থা এই যে, যদি কারো সাথে আপনার একবার সম্পর্ক হয়েই যায় তাহলে আপনি তাকে বার বার ডাকতে থাকবেন, তার দরোজায় করাঘাত করবেন। একবার এমনটি করলে তিনি সহ্য করবেন। দ্বিতীয়বার সহ্য করবেন। তৃতীয়বার সহ্য করবেন। চতুর্থবার দিলে পিটুনি দিবে। যেমন আপনি কাউকে একবার টেলিফোন করলেন। দ্বিতীয়বার আবারো টেলিফোন করলেন। এতে তিনি উষ্মা প্রকাশ করবেন। বলবেন, আপনি বার বার আমাকে ফোনে জ্বালাতন করছেন কেন? কিন্তু আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা যত পার আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। যখন চাও, যে মুহূর্তে চাও, যে কাজের জন্য চাও– সম্পর্ক স্থাপন কর। আমার কাছে এসো। আমার দরোজা খটখটাও। আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সুইচ অন করতে থাক। এই দু'আয়ে মাছুরাগুলো মূলত আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সুইচ অন

করার শামিল। যতবার দু'আ করবেন ততবার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। সেই সাথে আল্লাহর সাথে মহব্বতও বাড়বে। সুতরাং দু'আয়ে মাছুরা কোন সামান্য বিষয় নয়। এগুলো ভাল করে মুখস্থ করুন এবং প্রতি মুহূর্তে দু'আ পড়ার অভ্যাস বানিয়ে নিন।

দু'আ : জীবনের বাঁকে বাঁকে

মাসনুন দু'আর হাজারো কিতাব ছাপানো হয়েছে। মুনাজাতে মকবুল, হিসনে হাসীন। আমিও "পূর নূর দু'আয়েঁ" নামে একটি পুস্তিকা সংকলন করেছি। এতে সকল প্রকার দু'আ সন্নিবেশিত আছে। কিতাবগুলো পড়ুন। দেখুন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি দু'আ করেছেন। কেউ যদি এসব দু'আর পাবন্দী করে তাহলে দেখবে জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে দু'আ নেই। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের এক সহজলভ্য পন্থা আমাদের বাতলে দেন সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যবান যাকের, সম্পর্ক সুদৃঢ়

অভিজ্ঞতা বলছে, যে ব্যক্তি ঐসব দু'আসমূহ পড়ার অভ্যাস বানাবে তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় হবে। অবশ্য পরবর্তীতে এমন মনে হয় যে, দু'আর শব্দসমূহ যেহেতু মুখস্থ আছে সেহেতু পড়ার সময় অর্থ ও মর্মের দিকে খেয়াল যায় না। এজন্য কোন কোন লোক মনে করে, এভাবে দু'আ করার ফায়দা কী? অটোমেটিক মেশিন চলছে, যবান স্বয়ংক্রিয়ভাবে বলে চলেছে; অথচ মন কোথায়, দেমাগ কোথায়, এজন্য এমন দু'আ অনর্থক। এই চিন্তাধারাটি ভুল। কেননা এ ধরণের দু'আর মধ্যেও উপকারিতা নিহিত। কমপক্ষে আপনার জিহ্বা ক্ষণিকের জন্য আল্লাহর যিকিরে মশগুল হলো তো। আপনার একটি অঙ্গ আল্লাহর স্মরণে ব্রতী হলো তো। এটি কম কিসে। তবে এই দু'আসমূহ যদি ধ্যান-খেয়ালের সাথে পড়া হয়– এর ফলে যে ফায়দা হবে এবং যে সম্পর্ক কায়েম হবে– তা আজিমুশ্বান, তা সুবিশাল। মোটকথা, দু'আয়ে মাছুরা পড়া অধিকহারে যিকির করার দ্বিতীয় উপকরণ।

সর্বদা চাইতে থাকো

অধিকহারে যিকির করার তৃতীয় তরীকা হচ্ছে, 'অধিক দু'আ'। অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে চাওয়ার আধিক্য। অধিক দু'আর এত মশক করতে হবে যে, প্রতি মুহূর্তে আপনার অন্তর আল্লাহর কাছে কিছু না কিছু চাইতেই থাকবে। চাই সেটি

যবানে উঠুক বা না উঠুক। মনে মনে হলেও আল্লাহর কাছে কিছু না কিছু চাইবেন। যেমন চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে ও কাজে নামতে গিয়ে। এক্ষণে প্রশ্ন হল, সর্বদা আল্লাহর কাছে কী চাইব?

মানুষ মুখাপেক্ষীতার কেন্দ্র

গভীর নজরে পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন, মানুষ প্রয়োজন-মুখাপেক্ষীতার কেন্দ্র। প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন প্রয়োজন ও জরুরত তার আছেই। একটি মুহূর্তও সে প্রয়োজনমুক্ত নয়। যেমন এক্ষণে আমরা মসজিদে বসে আছি। বাহ্যত: এখন আমাদের কোন হাজত (প্রয়োজন) নেই, কিন্তু অগণিত প্রয়োজন আমাদেরকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রয়েছে। যেমন: যদি গরম লাগে তাহলে বাতাস ও পাখার দরকার বাড়বে। তাপ লাগলে ছায়ার প্রয়োজন পড়বে। শীত বেশি পড়লে উষ্ণতার দরকার পড়বে। কেননা মানুষ সর্বদা এক অবস্থায় থাকে না। সামান্য ঠাণ্ডা পড়তেই উদ্বিগ্ন হয়ে যায়। গরম পড়লে উতাল হয়ে যায়। সুতরাং সময় তার কোন না কোন প্রয়োজন আছেই। সুতরাং প্রতিটি মুহূর্তেই আপনি প্রয়োজনের সম্মুখীন হতে চলেছেন। কাজেই এর জন্য আল্লাহর স্মরণাপন্ন হোন।

এভাবে চান

যেমন: যদি গরম লাগে তাহলে আল্লাহর কাছে এভাবে বলুন : গরম দূর করে দিন! যদি শীত পড়ে তাহলে এভাবে বলুন : আল্লাহ! শীত দূর করে দিন। কাউকে খুঁজে ফিরছেন। দু'আচ্ছলে বলুন : হে আল্লাহ! অমুকের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন। কোথাও যাচ্ছেন, বাসের অপেক্ষায় স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছেন– বলুন, হে আল্লাহ! সহজে বাস পাইয়ে দিন। বাসে বসে গেলে বলুন : হে আল্লাহ! যেন গ্রীন সিগনাল পেয়ে যাই। হে আল্লাহ! যেন ট্রাফিক জ্যাম না হয়। সুতরাং যে প্রয়োজন যে সময় সম্মুখীন হয় সেই সময়ই সেই প্রয়োজন দূর করতেই আল্লাহর দ্বারস্থ হোন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পর্যন্ত বলেছেন, যদি তোমার জুতোর ফিতে পর্যন্ত ছিঁড়ে যায় তাও আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও।

নিশ্চিত বিষয়েও আল্লাহর আশ্রয়কামী হও

একটি আরো সূক্ষ্ম কথা হযরত থানভী (রহ.) এই বলেছেন যে, যে জিনিস চোখে দেখা যাচ্ছে এবং নিশ্চিত হাসিল হতে যাচ্ছে তাও আল্লাহর কাছে চান। যেমন আপনি রোযা শেষে ইফতার করতে বসেছেন, সামনে ইফতারীর খানা

মওজুদ। এক্ষণে হাত বাড়ালেই তা পেতে যাচ্ছেন। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেন– এ সময়ও আল্লাহ তাআলার কাছে চান। বলুন, হে আল্লাহ! এই খাদ্য আমার নসীবে করুন। এর স্বাদ-আস্বাদনের তাওফীক দিন। এর দ্বারা আমাকে শক্তি ও সুস্থতা দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমার যেন বদহজমি না হয়। পেট খারাপ না হয়। বরং সুস্থতা ও প্রশান্তির জন্য আমাকে খাইয়ে দিন।

উঁচু স্তরের তাওয়াক্কুল

আল্লাহ তাআলা হযরত থানভী (রহ.)কে এক অদ্ভুৎ জ্ঞান দান করেছিলেন। যা জানলে মানুষ হতবাক হতে বাধ্য। তিনি বলেন, যেখানে মানুষের সামনে উপকরণ মওজুদ নেই– এখানে তাওয়াক্কুল কোন বড় বিষয় নয়। কেননা এখানে উপকরণই নেই কাজেই তাওয়াক্কুল ছাড়া কোন গতি নেই। তাওয়াক্কুলের মজা কেবল সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে শতভাগ উপকরণ মওজুদ। যেমন, একটু আগে উপমা টেনেছি যে, খানা সামনে হাজির। খাবার গ্রহণ করার জন্য কেবল হাতটা বাড়াতেই যা দেরী। এই সময়ও নজর উপকরণের প্রতি থাকবে না। বরং এ সময় নজর থাকবে উপকরণদাতার প্রতি। এ সময় বলতে হবে– আয় আল্লাহ! এইখানা সামনে তো মওজুদ কিন্তু তোমার তাওফীক ছাড়া আমি না খেতে পারি, না এর দ্বারা আমার কোন উপকার হতে পারে। এটি তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর। কেননা শতভাগ উপকরণ মওজুদ থাকা সত্ত্বেও নজর এর প্রতি নেই। এই ধরণের তাওয়াক্কুলের মশক আমাদের করতে হবে।

উপকরণ বর্তমান থাকতে তাওয়াক্কুলের জরুরত কেন

তামাম উপকরণ মওজুদ থাকতে তাওয়াক্কুলের জরুরত এজন্য যে, বেশুমার ঘটনা এমনও হয় যে, শতভাগ উপকরণ মওজুদ হওয়া সত্ত্বেও খাবার মুখ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। যেমন : খাবার মুহূর্তে কোন রোগ আক্রমণ করল। প্যারালাইস হলো, মৃত্যু হয়ে গেল, বেহুশী এসে গেল। ওইখানা সামনেই আছে কিন্তু খাবার তাওফীক নেই।

খাদ্য পৃথক নেয়ামত, খাওয়ানো পৃথক নেয়ামত

খাবারের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তার এক রেওয়ায়েতে এই শব্দ রয়েছে যে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَزَقَنَا وَاَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আমার আব্বাজান (রহ.) বলতেন, এতে তিনি দুটি শব্দ বর্ণনা করেছেন– প্রথমত: رَزَقَنَا দ্বিতীয়ত: وَأَطْعَمَنَا অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের শোকর যিনি আমাদেরকে রুজি দিয়েছেন এবং আমাদের খাইয়েছেন। কেননা এও তো হতে পারে যে, নেয়ামত মওজুদ আছে কিন্তু পাকস্থলী খারাপ, বদহজম হতে পারে– এই অবস্থায় رَزَقَنَا হয় কিন্তু أَطْعَمَنَا হয় না। কেননা খাওয়ানোর নেয়ামত হাসিল হয়নি। এ ধরণের ঘটনা জীবনে বহু হয় যে, পণ্যদ্রব্য মওজুদ কিন্তু তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। এ সময়টি আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তাওয়াক্কুলের সময়। বলতে হবে, হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছার ওপর আমাদের ফায়দা লাভ করা নির্ভরশীল। আপনার ইচ্ছা থাকলে ফায়দা লাভ করতে পারব। যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে ফায়দা লাভ করতে পারব না। কাজেই আমি আপনার কাছে দু'আ করি যে, আপনি আমাকে এই জিনিস খাইয়ে দিন এবং এর দ্বারা উপকৃতও করুন।

চাইলে প্রিয় হবে

মোটকথা, মানুষ মুখাপেক্ষীতার কেন্দ্র। যে প্রয়োজনেরই সম্মুখীন হবে আল্লাহর কাছে চাইবে। আর দু'আ কবুল হওয়ার যে সময়গুলো এসেছে, বিশেষ করে নামাযের পরে ও অন্যান্য সময়ে গুরুত্বের সাথে হাত উঠিয়ে দু'আ করবে। দুনিয়াতে একজন মানুষ যতই দাতা হোক না কেন যদি আপনি একবার তার কাছে চান– দিয়ে দিবে। দ্বিতীয়বার চাইলেও দিবে। বড়জোর তৃতীয়বার দিতে পারে। এরপর চতুর্থবার চাইলে দাতা আপনার প্রতি বিরক্ত হবে। বলবে, আবারও আপনি এসেছেন জ্বালাতন করতে? কিন্তু আল্লাহ তাআলার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। তিনি বরং না চাইলেই রাগ হন। ইরশাদ হচ্ছে,

مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

'যে লোক আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হন।' আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার কাছে যখন পার চাও। যত মন চায় চাও। যতবার মন চায় ততবার চাও। তুমি যত চাইবে আমার কাছে তত প্রিয় হবে। অতএব সর্বদা আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন। এ এমন এক দরবার যেখান থেকে ফায়দা লাভ করুন, চান ও দু'আ করুন। এ দু'আর একটা ফায়দা এই যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হবে এবং অধিক যিকিরের উপকার পাওয়া যাবে!

সূচিপত্র

অদ্ভুৎ ও বিরল দু'আ

মোটকথা, 'অধিক যিকির' এর তিনটি পদ্ধতি হল। প্রথমত: ঐ চার আমলের গুরুত্বারোপ করা। (যার বর্ণনা গত মজলিসে বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে।) দ্বিতীয়ত: কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আর প্রতি গুরুত্বারোপ করা। তৃতীয়ত: বেশি বেশি দু'আ করা। এ পর্যন্ত যা বর্ণনা করা হলো তাতে দেখা গেল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া-আখেরাতের কোনও প্রয়োজনই চাইতে বাদ রাখেননি। সবশেষে তিনি এক বিরল ও অদ্ভুৎ দু'আ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে–

أَيُّمَا عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلْتَ دَعْوَتَهُمْ وَاسْتَجَبْتَ دُعَائَهُمْ، فَإِنَّا نَسْئَلُكَ أَنْ تُشْرِكَنَا فِيْ صَالِحِ مَا يَدْعُوْنَكَ فِيْهِ، وَأَنْ تُشْرِكَهُمْ فِيْ صَالِحِ مَا نَدْعُوْكَ فِيْهِ، وَأَنْ تُعَافِيَنَا وَإِيَّاهُمْ وَأَنْ تَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْهُمْ

এটি এমন এক অদ্ভুৎ দু'আ, যার কল্পনাও মানুষের মনে আসতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে– "আয় আল্লাহ! জল-স্থলে আপনার কোন বান্দা-বান্দী সারা জীবনে যে দু'আ চেয়েছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সেই দু'আয় শামিল করুন এবং আমাদের দু'আয়ও তাদের শামিল করুন এবং তাদের মাগফেরাত করুন এবং আমাদেরকেও মাগফেরাত (ক্ষমা) করুন।"

মনে মনে চাও

শুধুমাত্র মুখে নয়, বরং মনে মনে যিকির করতে থাকো। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আলহামদু লিল্লাহ! কখনোই এর বিপরীত হয় না। একবার এক লোক এসে বললো, হযরত! একটি মাসআলা জানার আছে। ঐ সময় দ্রুতই আল্লাহ তাআলার কাছে এই দু'আ করে নিই, 'হে আল্লাহ! জানা নেই এই লোক কী প্রশ্ন করবে। এর সহীহ জবাব আমার অন্তরে ঢেলে দিও।' মনে মনে আল্লাহর সাথে আমি সম্পর্ক স্থাপন করে নিই। অতএব যে লোক অতীতের ওপর ইস্তিগফার করে, বর্তমানে সবর করে কিংবা শোকর আর ভবিষ্যতের জন্য করতে থাকে ইস্তিগফার এবং জীবনের পরতে পরতে কুরআন-হাদীস বর্ণিত দু'আর পাবন্দী করে; তার দিল-মন প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর কাছে কোন না কিছু চেয়ে থাকেই। আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ই। সুতরাং অধিকহারে যিকিরের দ্বারা আল্লাহর মহব্বত ও সম্পর্ক স্থাপন যে, হয়ই– তা বলাই বাহুল্য।

ঐ তাসবীহগুলোকে আমলে পরিণত কর

আমাদের বুযুর্গগণ একথাও বলেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিছু সময় এমন নির্ধারণ করে নাও, যাতে কেবল যিকিরই থাকবে। উত্তম সময় হল ফজরের আগে কিংবা ফজরের পরে। কিন্তু এ সময় যদি সঙ্গত কোন ওজর থাকে তাহলে অন্য সময় নির্ধারণ করে নাও। নির্ধারিত সময়টিতে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ পাকের যিকির কর, তেলাওয়াত কর, তাসবীহ পড়। যেমন: 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।' অপর একটি তাসবীহ "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।' ইস্তিগফারও এক ধরনের তাসবীহ। দরূদ শরীফও এক ধরনের তাসবীহ।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর"ও একটি তাসবীহ। এসব যিকির আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ কর। এসব তাসবীহ পাঠকে আমলী রূপ দাও। বেশি সময় দিতে না পারলে এক তৃতীয়াংশ তাসবীহ পাঠের আমল কর। ৩৩-৩৩ বার করে সমগ্র যিকির পড়ে নাও। তবে যিকিরের জন্য যে সময়টা নির্ধারণ করে নিয়েছো সে সময়টিতে কেবল নির্ধাতির আমলটিই কর। এর আগে দেখো, আমি অমুক আমলের জন্য ২৪ ঘণ্টায় কতটা সময় দিতে পারব। সেই হিসাবে আমল নির্ধারণ কর। আধা ঘণ্টা হোক, পনের মিনিট হোক কিংবা ১০ মিনিট হোক। যাইহোক সময় হিসেবে আমলটি কার্যকর কর। সময় বুঝে হিসাব কষে আমলে কাটছাট কর। ঐ সময়ে যদি আমল শতভাগ পুরা করতে না পার তাহলে কমপক্ষে ৬৬ ভাগ কর। ৬৬ সংখ্যা না পারলে ৩৩ সংখ্যা নির্ধারণ কর। ৩৩ না পারলে ১১ সংখ্যা নির্ধারণ কর।

ধারাবাহিক আমল পসন্দনীয়

যা নির্ধারণ করবে তা পুরা করবে। এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ

অর্থাৎ, 'সামান্য আমল যা তোমরা ধারাবাহিকভাবে কর এতে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিদান, সওয়াব ও গ্রহণযোগ্যতার অধিক আশা রাখা যায় ঐ অধিক আমলের চেয়ে যা আজ করলে তো কাল ছেড়ে দিলে।'

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

সূচিপত্র

خَيْرُ الْعَمَلِ مَادِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ

অর্থাৎ, উত্তম আমল হচ্ছে যা সর্বদা জারী থাকে। যদিও তা সংখ্যায় কম।

ধারাবাহিকতার মধ্যে কল্যাণ নিহিত। এজন্য যিকিরের সময় নির্ধারণ কর এবং স্থানও নির্ধারণ কর। নির্ধারণ কর সংখ্যাও। কেননা একস্থানে বসে মানুষ যখন যিকির করে তখন এর ফায়দাও অধিক হয়। এটি ঐ তুলনায় উত্তম, যে ব্যক্তি চলতে, ফিরতে যিকির করে। সময় ও স্থান নির্ধারণে যিকির করার ফায়দা এই যে, এই যিকিরের পরিণতিতে আল্লাহ পাক যবান ও মাকান নূরে নূরান্বিত করে দেবেন।

জগতের সব বস্তুর যিকির করা

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (ص ١٨)

অর্থাৎ, যখন হযরত দাউদ (আ.) যিকির করতেন, তখন তাঁর সাথে পাহাড় ও পাখিগুলোও যিকির করত এবং আল্লাহ তাআলা নেয়ামত স্বরূপ একথাও বলেছেন যে, যখন দাউদ (আ.) যিকির করতেন, তখন তাঁর সাথে পাহাড়ও তাসবীহ পড়ত।

যিকিরে একাগ্রতা সৃষ্টি কর

এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর পাহাড়ের যিকির ও তাসবীহ কী করে পুরস্কার হোল? যদি ওগুলো যিকির করে করুক না– এর সাথে দাউদ (আ.)-এর সম্পর্ক কী? হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) উত্তরে বলেন, পাহাড়সমূহের যিকির করা হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য এভাবে পুরস্কার হোল যে, যখন যাকের যিকির করে এবং তার সাথে অন্যান্য মাখলূকও সঙ্গ দেয়– তখন ঐ যিকিরে একাগ্রতা ও অতিরিক্ত তৃপ্তি পয়দা হয়।

যিকিরের সময় এই কল্পনা করো

এজন্য সুফিয়ায়ে কেরাম যিকির এর এমন একটি তরীকা বাতলিয়েছেন যে, যাতে যাকের যিকিরের সময় এই কল্পনা করবে যে, আমার সাথে গোটা পৃথিবী যিকির করছে। এই চাঁদ যিকির করছে, এই সূর্য যিকির করছে, এই আকাশ যিকির করছে, যিকির করছে এই পাহাড়গুলোও। সবই আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছে।

সূচিপত্র

এই কল্পনার সবচেয়ে বড় ফায়েদা যাকের নিজেই উপলব্ধি করবেন। এজন্য যাকের যিকির করার জন্য যখন কোন সময় বা স্থান নির্ধারণ করে নেয়, তখন আল্লাহ্ পাক ঐ সময় ও স্থানকে তাঁর কুদরতি নূরে নূরান্বিত করে দেন। এ সময় ঐ সময়টিও তার সাথে যিকিরে লিপ্ত হয়। এর দ্বারা একের যিকিরের বরকত অপরের যিকিরের উপর প্রতিবিম্বিত হয়। কাজেই সময় ও স্থান নির্ধারণে ফায়দা অধিক। যদিও সামান্য সময়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে যিকির করা হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

মোটকথা, অধিক যিকিরের চতুর্থ পদ্ধতি এই যে, সামান্য সময় নির্ধারণ করে আল্লাহ তাআলার যিকির কর। এমনটি করতে পারলে ইনশাআল্লাহ অধিক যিকিরের উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত হাসিল করা যাবে। তাঁর সাথে সম্পর্কের সেতুবন্ধন কায়েম হবে। আল্লাহ পাক আপনাকে, আমাকে ও সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ছিয়াশিতম মজলিস

আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের মুরাকাবা কর

আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের মুরাকাবা কর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

ভূমিকা

গত কয়েক দিন ধরে হযরত থানভী (রহ.)-এর মালফূযাত কেন্দ্রিক বয়ান চলছিল। যার বিষয়বস্তু ছিল, দ্বীনের উপর চলার জন্য কোন লোক যখন সংকল্প করে তখন এজন্য তার যে পরিশ্রম করতে হয় সুফিয়ায়ে কেরাম এই 'শ্রম'কে 'মুজাহাদা' ও 'রিয়াযত' নামে আখ্যা দেন। কিন্তু এসব মুজাহাদা ও রিয়াযতের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তা এই যে, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং তাঁর মহব্বত হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। এই সম্পর্ক যখন কায়েম ও মজবুত হয়ে যায় তখন দ্বীনের সকল বিধি-বিধান পালন সহজতর হয়। কেননা মহব্বতের দ্বারা কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ সহজতর হয়ে যায়। কাজেই আসল জিনিস হচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আল্লাহ তাআলার মহব্বত লাভ হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার সাথে এই কাঙ্ক্ষিত (مطلوب) স্তরের সম্পর্ক কায়েম করা। এই বিষয়টি অর্জন করতে পারলেই অবশিষ্ট কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হতে থাকে।

স্ত্রীদের মাঝে সমতা

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, মহব্বত ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। কারো সাথে মহব্বত আছে, কারো সাথে নেই। কারো সাথে মহব্বত বেশি, কারো সাথে মহব্বত কম। সুতরাং হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রা স্ত্রীগণের মাঝে সর্ব ধরনের আদর্শ সাম্য কায়েম করতেন। সকলের সাথে সমান অধিকার বজায় রাখতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি এই দু'আ করতেন—

اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا أَمْلِكُ، وَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا لَا أَمْلِكُ

"আয় আল্লাহ! আমি যে বণ্টন করেছি তা আমার ক্ষমতাধীন বিষয়ে করেছি যে, যতটুকু পয়সা এক বিবিকে দিয়েছি, অতটুকু পয়সা অন্য বিবিদেরও দিয়েছি। যেমন খানা এক স্ত্রীকে দিয়েছি, ওই পরিমাণ খানা দিয়েছি অন্য বিবিকেও। যে কাপড় একজনকে দিয়েছি ওই ধরনের কাপড় দিয়েছি অন্যকেও। সুতরাং ইচ্ছাধীন ব্যাপারে আমি ইনসাফ ও সমতা বিধানের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু কিছু বিষয় এমনও আছে যেগুলো আমার ইচ্ছাধীন নয়। হে আল্লাহ! ইচ্ছাধীন নয় এমন বিষয়ে আপনি আমাকে ধর-পাকড় করবেন না।

মহব্বত ইচ্ছাধীন নয়

এক্ষণে প্রশ্ন হয়, কোন জিনিস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমতাধীনে ছিল না? হযরত উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেটি মহব্বত। এটি ইচ্ছাধীন নয়। সকল স্ত্রীকে মহব্বতের বেলায় সমতা বিধান সম্ভব নয়। এটি মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষ কোথায় পাবে ওই মানদণ্ড যার দ্বারা সে মাপবে যে, এক স্ত্রীকে যতটা মহব্বত করবে অপর স্ত্রীকেও ঠিক ততটা মহব্বত করবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো মহব্বত একটি সাধ্যের বাইরের তথা ক্ষমতা ও ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয়। আর মহব্বত যখন ইচ্ছাধীন বিষয় নয় তখন বান্দা আল্লাহর সাথে কীভাবে মহব্বত পয়দা করবে? এর জবাবে হযরত বলেন, যদিও মহব্বত ইচ্ছাধীন বিষয় নয় তথাপিও এর উপকরণ ক্ষমতা ও ইচ্ছাধীন বিষয়। যদি মানুষ এই উপকরণসমূহ অবলম্বন করত তাহলে মহব্বত পয়দা হয়ে যেত। এই বাণীতে হযরত মহব্বতের উপকরণসমূহ বর্ণনা করছেন। তন্মধ্যকার পয়লা উপকরণটির বর্ণনা ইতোমধ্যে করা হয়েছে। তা ছিল অধিক হারে যিকির করা। যত বেশি যিকির করা যাবে তত বেশি মহব্বত পয়দা হবে। অধিক যিকিরের কিছু তরীকা আমি বর্ণনা করেছিলাম। বলেছিলাম, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআর গুরুত্ব দিতে। বলেছিলাম তা অধিক হারে করতে। বলেছিলাম, সব কিছুই আল্লাহর কাছে চাইতে। বলেছিলাম, সামান্য সময় বের করে তাতে আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব দিতে। বিস্তারিত বর্ণনা ইতোপূর্বে করেছি।

আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ এবং নিজের আচরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

হযরত থানভী (রহ.) এবার 'মহব্বত' পয়দা হওয়ার দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহসমূহ ও নিজের

আচরণ তথা কার্যকলাপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা।' এই বক্তব্যে তিনি দুটি জিনিসের অবতারণা করেছেন। প্রথমত: আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহসমূহকে ভাবা। দ্বিতীয়ত: নিজের কার্যাবলীকেও চিন্তায় আনা। এ দুটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও তাঁর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা যে নেয়ামতসমূহ বর্ষণ করে চলেছেন– এর ধ্যান কর, ভাবো ও মুরাকাবা করো। মুরাকাবা ও ধ্যান করার দ্বারা বুঝে আসবে। এছাড়া উহা বুঝে আসার কোন পন্থা নেই।

অনুগ্রহসমূহের মুরাকাবা ও ধ্যান করো

মানুষ সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর নেয়ামতে লালিত হচ্ছে। প্রতিটি মানুষের ওপর প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলার নেয়ামতবারি বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এসবের দিকে আদৌ খেয়াল যাচ্ছে না যে, এগুলো সত্যিই কোনও নেয়ামত কি-না? যা আমরা অর্জন করে চলেছি। এর দরুণ মানুষ উদাসীন হচ্ছে। কিন্তু মানুষ সত্যিই যদি গুরুত্ব ও ধ্যানের সাথে ঐসব নেয়ামতের প্রতি মনোনিবেশ করত ও ওগুলো তার সামনে হাজির হত এবং সে এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করত তাহলে তার অনুভূতি জাগত যে, এগুলোও আল্লাহর নেয়ামত যা প্রতি মুহূর্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার প্রতি বর্ষিত হয়ে চলেছে।

আল্লাহওয়ালাদের সংসর্গ দ্বারা ধ্যান ও নিয়ামতের মূল্যায়ন অর্জিত হয়

এই ধ্যান, অনুভূতি ও নিয়ামতের মূল্যায়ন ঠিক তখনই হাসিল হবে, যখন মানুষ কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতে বসবে। যখন আল্লাহওয়ালার সোহবত অর্জিত হয়নি তখনকার সময়টি ঔদাসীন্যে কেটেছে। ঐ সময় খেয়াল ছিল না যে, কী কী নেয়ামত তিনি বর্ষণ করছেন? বরং কোন না কোন মুসীবত নিয়ে কেঁদে-কেটেই চলা হয়েছে। সামান্য কষ্ট এসেছে, সামান্য উদ্বিগ্নতা এসেছে– ব্যাস এই নিয়ে মুখগোমরা। অজস্র কান্নাকাটি। কিন্তু যখনই আল্লাহ পাক কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন, মানুষ যখন কোন আল্লাহওয়ালার আঁচল ধরেছে তখন এই উপলব্ধি ও বুঝ এসেছে যে, আরে তুমি সামান্য কোন মুসীবত নিয়ে মুখ গোমরা করে বসেছিলে– তোমার প্রতি তো সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছিল।

চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার আহ্বান : কুরআনের ভাষায়

কুরআনও আপনাকে এ আহ্বান রাখছে যে, সামান্য চিন্তা কর, সামান্য ভাবনা কর। বিভিন্ন স্থানে কুরআন গভীর অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তার হুকুম জারী করেছে। মানুষেরা এই অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তার মর্ম নিয়ে ভ্রান্তির বেড়াজালে বন্দী হচ্ছে। আজকাল তাই মানুষকে বলতে শোনা যাচ্ছে, কুরআনুল কারীম বার বার অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তা-গবেষণার ডাক দিচ্ছে। এর মর্ম হলো, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধন কর– মর্মটি ঠিক নয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধন নিন্দনীয় কোন বিষয় নয় বরং একটি জায়েয ও মুস্তাহাবের পর্যায়ে। ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব বলা চলে। কিন্তু কুরআনুল কারীম যে অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তার আহ্বান রাখছে এর মতলব এটি নয় বরং কুরআনে আহ্বান করা অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তার মর্ম হলো, আল্লাহর নেয়ামতসমূহের, তাঁর সৃষ্টি কৌশলের, তাঁর পূর্ণ কুদরতের সর্বোপরি তাঁর অবারিত নিয়ামতের চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন দূর আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

"এই আসমানসমূহের সৃষ্টির মাঝে, যমিনসমূহের সৃষ্টির মাঝে এবং রাত-দিনের আবর্তনে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কারা? এর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক সামনে ইরশাদ করছেন, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন তারা, যারা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায়। ঐসব লোকেরা বলে, প্রভু পরওয়ারদেগার! আপনি এই আকাশ, যমিন, তারকারাজি এবং এ বিশ্ব খামোখা পয়দা করোনি। বরং আমাদের উপকারের জন্য, আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে পয়দা করেছেন। এর মধ্যকার প্রতিটি বস্তুই এক একটি নিয়ামত। হে আল্লাহ! এই দুনিয়াতে যখন আপনি আমাদেরকে এই নিয়ামতসমূহ দান করেছেন তখন পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে আপনার রহমতের বদৌলতে জাহান্নামের আযাব থেকে নাজাত দান করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সময় এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

এই আকাশ আমার জন্য, এই যমিন আমার জন্য

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) একটি কবিতায় বলেন–

یہ زمیں میرے لئے، یہ آسماں میرے لئے

چل رہا ہے دیر سے یہ کارواں میرے لئے

"এইসব কার্যক্রম আল্লাহ পাক আমার জন্য পয়দা করেছেন। অর্থাৎ, আমার উপকারের জন্য, ফায়দার জন্য। আপনি যদি একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এই সূর্য আপনার খেদমত করছে, এই তারকারাজি আপনার সেবা করছে, এই বাতাস আপনার খেদমত করছে। এই সমুদ্র, দরিয়া, পাহাড়, বন-বনানী মোটকথা সবকিছুই আপনার জন্য আল্লাহ পাক পয়দা করেছেন। এজন্য তিনি ইরশাদ করছেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

'যা কিছু তিনি যমিনে পয়দা করেছেন তা তোমাদের জন্যই পয়দা করেছেন।'

এ সূর্য আমার জন্য

দৈনিক সকালে সূর্য উদিত হয়। কিরণ ছড়ায়। আলো-উত্তাপ দেয়। সন্ধ্যায় অস্ত যায়। এসব কেন? আল্লাহ ইরশাদ করেন, মানুষ হে! এই সূর্য এক বিশাল সৃষ্টি। একে আমি তোমার জন্যই পয়দা করেছি যেন তুমি আলো পাও। উষ্ণ হও, এর আলোকে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন হয়। একে এত দূরে রেখেছি যাতে তোমার ফায়দা অর্জিত হয়ে যায় এবং তুমি এর ক্ষতি থেকে বাঁচতে পার। এই সূর্যের কিরণের মাঝে উপকারী-অপকারী দুটি বিপরীতমুখী অংশ আছে। অপকারী অংশ থেকে মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ পাক পুরো দুনিয়ার আশেপাশে 'চালনি' 'স্তর' সেট করে দিয়েছেন, যাকে আজকাল (বিজ্ঞানের পরিভাষায়) ওজন OZONE বলে। এই ওজনস্তর খুবই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এই 'চালনি' সৌর কিরণকে ছেঁকে কেবল এর উপকারী অংশটুকু মানবজাতিকে পৌঁছিয়ে থাকে এবং অপকারী অংশটুকু প্রতিহত করে রাখে। সুদীর্ঘকাল পরে এই ওজনস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। নয়ত মানুষ এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যেত। কিন্তু আসমান-যমিন সৃষ্টির উষালগ্নেই আল্লাহ পাক এই ওজনস্তর সেট করে রেখেছেন। জানি না আরো অজানা কত বস্তু ও পদার্থ তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। একটি বস্তুর প্রকৃতি ও স্বরূপের সন্ধান নেওয়ায় আল্লাহ পাকের লাখো নেয়ামত আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

আপনার শরীরটি নিয়ে ভাবুন

এগুলো সবই দিক-দিগন্তের কথা। আপনি আপনার শরীরটি নিয়ে একটু ভাবুন তো। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করুন। চুল থেকে নখ পর্যন্ত। প্রতিটি অঙ্গেই কুদরতের পূর্ণতা, অপরূপ সৃষ্টিশৈলী। তাঁর অবারিত রহমতের ছোঁয়া। আপনার জানা নেই এই দেহটার ভেতর কী হচ্ছে এবং কী হয়ে চলেছে! এখনও পর্যন্ত আপনি আপনার দেহের কাছে জেনে দেখেছেন কী? জানতে চেয়েছেন এর কোন অঙ্গ কী আমল করছে? যেদিন থেকে মানুষ চিন্তা করা শুরু করেছে সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত তার অস্তিত্বের আবিষ্কারে মত্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞান এই বিষয়ে গবেষণায় মত্ত যে, এই ছয় ফুট আয়তনে আল্লাহ তাআলা কী অদ্ভুৎ কারখানা সেট করেছেন, কিন্তু আজো পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে এর রহস্যের তলায় কেউ যেতে পারেনি। যতটুকু যা আবিষ্কার করা গেছে তদ্দ্বারা জানা গেছে, কুদরতের এক অদ্ভুৎ কারখানা। দুনিয়ার কোন কারখানা, কোন ফ্যাক্টরী, কোন মিল এমন অদ্ভুৎ নয় যেমনটি মানবদেহ-ফ্যাক্টরী যা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এই চলমান ফ্যাক্টরীকে নিয়ে এদিক সেদিক চলাফেরা করছে, একে ব্যবহার করছে, এক একটি অঙ্গ থেকে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু খোদ নিজেই জানে না, এর ভেতরে কী হচ্ছে।

ক্ষুধা কখন লাগে

মানুষ মনে করে আমার ক্ষুধা লেগেছে। ক্ষুধা দূর করতে সে খাদ্য গ্রহণ করছে। যদিও মজা নেয়ার জন্য খাবার চিবাচ্ছে কিন্তু বেকুফ এই মানুষের খবরও নেই যে, এখন সরকারী মেশিনের তেলের দরকার। ইন্ধনের দরকার। এই তেল যখন ফুরাচ্ছে এবং কতটুকু বাকী আছে? এটি জানার জন্য তো মিটার লাগানো নেই। গাড়ীর মধ্যে আপনি মিটার বসিয়েছেন যদ্দ্বারা আপনি জেনে যাচ্ছেন যে, গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে আসছে এজন্য এতে তেল ঢালো। এই দেহের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মিটার সেট করে দিয়েছেন। যখনই ইন্ধনের দরকার হচ্ছে ক্ষুধা লেগে যাচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেহ খাবারের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। বেকুফ ভাবছে, ভুখ মেটানোর জন্য খাবার গ্রহণ করছি। স্বাদ ও তৃপ্তির জন্য মুখে গ্রাস তুলছি।

স্বাদ এক বিশাল নিয়ামত

আল্লাহ পাক মুখের মধ্যে এক স্বাদ-মিটার কায়েম করে রেখেছেন। স্বাদ গ্রহণের জন্য মানুষ খাবারের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। মানুষ মনে করে, স্বাদ গ্রহণের জন্যই আমরা খাবার গ্রহণ করছি। প্রকৃতপক্ষে দেহের পুষ্টির জন্য

খাবারের দরকার হয়। এই স্বাদ-ইন্দ্রিয় ছোট্ট জিহ্বাটির মাঝে সেট করা। তোমার এই মজাদার খাবার নাকে রাখো তো দেখি কিংবা দেহের অন্য যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রেখে দেখ- মজা লাগে কি-না? তিতা না মিঠা? ওই অঙ্গ বলতে পারে কি-না? কিছুই বলতে পারবে না। কিন্তু ছোট্ট এই জিহ্বাটিতে আল্লাহ পাক এমন লালা দিয়েছেন যদ্দ্বারা স্বাদ অনুভূত হচ্ছে এবং খাদ্যে মজা আসছে। যদি এই ইন্দ্রিয়টি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মজাদার বস্তুও তিতা মনে হয়।

যদি এই স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়

আমার স্মরণ আছে, একবার জন্ডিস হয়েছিল। যদ্দরুণ স্বাদ-মজা সব হারিয়ে বসেছিলাম। একস্থানে দাওয়াতে গিয়েছিলাম। প্রথমে ঝাল কিমা দিয়েছিল। দিয়েছিল এরপর মিঠাই ক্ষীর। আপনাদেরকে সত্য করে বলছি, মিষ্টি আর ঝালের মাঝে তারতম্য করতে পারিনি। না মরিচের ঝাল অনুভব করেছি, আর না মিষ্টির মিষ্টতা। ব্যাস, এমনিতেই কেবল গিলেছি। সাধারণ অবস্থায় আল্লাহ পাক জিহ্বায় এমন স্বাদ গ্রহণের শক্তি দান করেছেন যাতে খাবারে মজা আসে। এই স্বাদ আস্বাদনের জন্যই ভোজনরসিকেরা খাদ্যের ইয়াবড় স্তুপ করে। আপনাকে স্বাদে স্বাদে তৃপ্ত করার জন্য খোদার বিশাল একদল মাখলুক দিন-রাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে চলেছে। এক্ষণে মানুষ মনে করছে আমি রসনা তৃপ্তি ও ঝাল-মরিচের স্বাদ নিচ্ছি। অথচ এর দ্বারা তার শরীরে পুষ্টি লাভ হচ্ছে। শরীরের ফুয়েল মিলছে।

পাকস্থলীতে স্বয়ংক্রিয় মেশিন সেট করা

স্বাদ গ্রহণ করে প্রতিটি খাবারকে আপনি মুখে ঢেলে কণ্ঠনালী দিয়ে ভেতরে চালান করে দিচ্ছেন। ইফতারের সময়টায় দেখুন! আপনি করছেন কী! এইমাত্র মিষ্টি দ্রব্য খেলেন, টক-ঝাল খেলেন, পিঁয়াজু, আলুচপ, বেগুনি খেলেন, পরে খেলেন খেজুর, অসতর্কতা হেতু অনেক খাবারই এ সময় ভেতরে চালান দেয়া হল। এর কোন চিন্তাও করা হল না যে, ভেতরে কী দিচ্ছি? কিন্তু আল্লাহ পাক আপনার ভেতরে একটি কারখানা স্থাপন করে দিয়েছেন, যা প্রতিটি বস্তুকে পৃথক করছে এবং ছাঁকছে। মানুষ স্বাদ গ্রহণের জন্য অখাদ্য-কুখাদ্য বহুত কিছু গিলছে এজন্যে ভেতরে একটি অটোমেটিক মেশিন বসিয়ে দিয়েছেন যা প্রতি খাদ্যদ্রব্যকেই পৃথক করছে। যে খাদ্য দ্বারা রক্ত তৈরি করার তা রক্ত তৈরি করছে। যে খাদ্য দ্বারা শক্তি অর্জন করা দরকার তদ্দ্বারা শক্তি মিলছে। যা অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছিত তা বের হয়ে যাচ্ছে। একদিকে খাদ্য ঢুকছে অপর দিক থেকে খালাস হচ্ছে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা। যা আল্লাহ পাকের সৃষ্ট।

বিনা দরখাস্তে এসব প্রাপ্তি

এই কুদরতি ব্যবস্থাপনার কোনটিই যদি ঢিল হয়ে যায় তাহলে মানুষ উদ্বিগ্ন ও হয়রান হয়ে যায়। তার অবস্থার অবনতি হয়। এবার ডাক্তারের পেছনে দৌড়ানোর পালা। আপনি কী আল্লাহ তাআলার কাছে বলেছিলেন যে, আমি খানা খাব আর আপনি খাবার (হজমের) ব্যবস্থাপনাগুলো ঠিক করে দেবেন। আমাদের দেহের মধ্যে এমন কলিজা বানিয়ে দেবেন, গুর্দা বানিয়ে দেবেন, এমন পাকস্থলি বসিয়ে দেবেন! এমন দরখাস্ত কি আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে করেছিলেন? না, বরং তিনি নিছক তার রহমত ও কৃপার বদৌলতে এই গোটা কারখানা বানিয়ে দিয়েছেন। দার্শনিক রূমীর ভাষায়–

ما نبودیم وتقاضہ ما نبود

لطف او نا گفتۂ ما می شنود

“আমরা অনস্তিত্বে ছিলাম। আমাদের কোন দাবি ও চাহিদা ছিল না। নিছক তাঁর দয়া আমাদের বিষয়টি ভেবেছে যা আমরা বলিনি। আমাদের না বলা কথা শুনে এই কারখানা পয়দা করে দিয়েছেন।

চোখ : বিশাল এক নিয়ামত

এ এক বিস্ময়কর কারখানা। পার্থিব কোনও কারখানার সাথে এর তুলনা চলে না। তুল্য হতে পারে না। কোন মানুষ যদি এই কারখানা বানাতেও চায় কোটি কোটি মানুষ মিলেও পারবে না। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্র এসব নিয়ামত দেখে থাকে। এগুলো নিয়ে ভাবে, গবেষণা করে। বলে, ‘হে আল্লাহ! আপনি জন্মগ্রহণের পূর্বেই আমাকে এই চক্ষু দান করেছেন। সেদিন থেকে আজো অবধি আমি নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী তদ্দ্বারা দেখে চলেছি। এই চোখ দ্বারা উপকৃত হয়ে চলেছি। আপনার বিবেকে-ধ্যানে কখনও এ দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে কী? কখনও এই অনুদানের শোকর আদায় করেছেন কী? বলেছেন কী, হে আল্লাহ! আপনি এই চক্ষু দিয়েছেন। এতে দৃষ্টিশক্তি ও আলো দান করেছেন। আমি এর শোকর আদায় করিনি। বরং উদাসীনতার বেজাড়ালে বন্দী হয়ে বিশাল এই নিয়ামতকে এস্তেমাল করে চলেছি। বেপরোয়াভাবে একে ব্যবহার করেছি। খোদা না করুন এই দৃষ্টিশক্তি কখনো চলে গেলে কিংবা কমে এলে খবর হবে, কেমন ছিল এই নিয়ামত, কত বড় ছিল, যা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। এটি ব্যবহারে হারাম-হালালের বাছ-বিচার করিনি। সুতরাং মাঝে মধ্যে একটু ভাবুন! কত বড় এই নিয়ামত। আমাদের সাধ্য কী ছিল এমন বিশাল নিয়ামত অর্জনের। একবার এই নিয়ামত চলে গেলে লাখো-কোটি টাকা খরচ করলেও ফিরে আসবে কী? শুধু

কী তাই। আল্লাহ পাক এই চক্ষু হেফাযত কল্পে দু' পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছেন। এই দুটি পলক সেই পাহারাদার। কোন অবাঞ্ছিত কিছু এই চোখের দিকে ধেয়ে এলে প্রহরী দু'জনা তার পথ আগলে দাঁড়ায়। চোখ হেফাযত রাখতেই তাদের এই আগলে দাঁড়ানো। চোখ এমনই এক স্পর্শকাতর অঙ্গ আলতো আঘাতে তা খারাপ হতে বাধ্য। এই ধরণের সুবিশাল নিয়ামত নিয়ে ভাবুন! এর জন্য শোকরের যবান দরাজ করুন!

কান ও জিহ্বা : বিস্ময়কর দু'টি নিয়ামত

এই যে কান আল্লাহ পাকের কত বড় নিয়ামত। ঐ লোকদের কাছে এর মূল্যায়ন জানুন, যারা শ্রবণশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই যে জিহ্বা ও বাকশক্তি দান করেছেন। অন্তরের ভাব প্রকাশের মাধ্যম করেছেন। নতুবা আপনার অন্তরে আবেগের পাহাড় জমত– জিহ্বা কিছুই বলতে পারত না। এর মূল্যায়ন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, যাদের জিহ্বা শল্য হয়ে গেছে। ওরা কোন কথা বলতে চায়, আবেগ প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার বহি:প্রকাশ ঘটে না। এই নিয়ামত আপনি ফ্রি পেয়েছেন। মোটকথা, আপাদমস্তকের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে ভাবুন, আল্লাহ পাক আপনাকে কী কী নিয়ামতে ধন্য করেছেন।

রাতে শোয়ার পূর্বে এই আমল করুন

ঐসব নিয়ামতের মুরাকাবা করুন। মুরাকাবার ফল এই দাঁড়াবে যে, যে সত্ত্বা নিয়ামত দান করেছেন তাঁর সাথে মহব্বত পয়দা হবে। এই মুরাকাবার উত্তম তরীকা যা হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, রাতে শোয়ার পূর্বে ৫–১০ মিনিট মুরাকাবার জন্য নির্ধারণ করুন। ওই মুরকাবায় সেই সব জিনিসের ধ্যান-খেয়াল করুন যেগুলো আল্লাহ পাক আপনাকে দান করেছেন। এক একটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করুন। বলুন– হে আল্লাহ! আপনি আপনার দয়া ও কৃপা দ্বারা আমাকে চক্ষু দান করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমার চোখকে সুস্থ ও দৃষ্টিসম্পন্ন করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কান দান করেছেন এবং একে আপনি শ্রবণশক্তিসম্পন্নও করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জিহ্বা দান করে একে বাকশক্তিসম্পন্ন করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই দন্তরাজি দান করে একে সবল-মজবুত করেছেন এবং খাদ্য গ্রহণের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পা দান করেছেন এবং এর দ্বারা চলাফেরা করার শক্তি দিয়েছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হাত দিয়েছেন এবং আমি আমার সকল কাজই এই হাত দ্বারা সম্পন্ন করছি, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ এইভাবে এক একটি অঙ্গের কল্পনা করে এর ভেতরে যে সকল নিয়ামত আল্লাহ্ পাক দান করেছেন সেগুলোর কথা স্মরণ করুন, পরে এগুলোর জন্য শোকর আদায় করুন।

পারিপার্শ্বিক নিয়ামতের শোকর

এরপর আপনার পারিপার্শ্বিক নিয়ামতসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। বলুন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বাসস্থান দান করেছেন। যা শান্তির নীড়। না জানি কত লোক বাস্তুহারা হয়ে দিনাতিপাত করছে, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ হে আল্লাহ! আপনি আরামদায়ক বিছানা দান করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিবি-বাচ্চা দান করেছেন যারা আমাকে ভালবাসে। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ এক একটি বস্তুর প্রতি ধ্যানের চাকা ঘোরান এবং দৃষ্টিবদ্ধ নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করতে থাকুন।

উদ্বিগ্নকালে নিয়ামতসমূহের কথা চিন্তা করা

মানবজাতির প্রতি কোন না কোন সময় কষ্ট ও উদ্বিগ্নতা আসেই। কিন্তু মানুষের কাজ এই নয় যে, উদ্বিগ্নতা নিয়ে সে গোমরামুখে বসে থাকবে এবং এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহকে ভুলে বসবে। বরং উদ্বিগ্ন-মুহূর্তে এবং কষ্টকালেও যদি চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ তাআলার অসংখ্য-অগণিত নিয়ামতের মোকাবেলায় এই উদ্বিগ্নতা ও কষ্ট সামান্যই। তারপরও যেহেতু মানবজাতি ধৈর্যহীন, যখনই কোন মুসীবত তার আসে তখন সে ওগুলো নিয়েই স্তব্ধ হয়ে যায় এবং নিয়ামতসমূহ ভুলে যায়।

মিয়া সাহেব জন্মগত ওলী ছিলেন

আমার আব্বাজানের একজন উস্তাদ ছিলেন, তাঁর নাম মিয়া আসগার হুসাইন (রহ.)। তিনি 'মিয়া সাহেব' নামেই খ্যাত। বিস্ময়কর বুযুর্গ। জন্মগত ওলী। আমার দাদা হযরত মাওলানা ইয়াসীন সাহেব (রহ.)-এর শাগরিদ

ছিলেন। আমার দাদাজান বলতেন, ও জন্মগত ওলী। এজন্য শৈশবকালেই আমার কাছে পড়তে আসত। সেই থেকে আজো অবধি সে একটা মিথ্যা কথা বলেনি। বাচ্চাদেরকে যখন পড়াতাম, কোন বাচ্চা দুষ্টুমি করলে আমি রেগে কড়া ভাষায় জিজ্ঞাসা করতাম– কে করেছে এই কাজ? সকল বাচ্চাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকত, কিন্তু মিয়া আসগার দাঁড়িয়ে বলত, ওস্তাদজি! আমার থেকে এই ভুলটি হয়ে গেছে। এ সময়ও তার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথাটি বের হয়নি।

অসুস্থতায় শোকরের ধরন

আমার আব্বা শোনাতেন, একবার আমি খবর পেলাম, তিনি অসুস্থ। আমি তাঁর সেবায় গিয়ে দেখলাম, জ্বরের প্রকোপে তিনি কাঁপছেন। চরম অস্থির তিনি। বললাম, হযরত এখন কেমন লাগছে? বললেন, আল্লাহর শোকর! আমার চোখ দুটি ঠিকমত কাজ করছে। আল্লাহর শোকর আমার কানও ঠিকমত কাজ করছে। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আলহামদু লিল্লাহ! বাকশক্তিও আমার বহাল আছে। আলহামদু লিল্লাহ! কলিজা, হার্ট ও পাকস্থলী স্বাভাবিক, সামান্য একটু জ্বর হয়েছে এই যা। দু'আ করুন! আল্লাহ পাক তা দূর করে দিন। দেখুন, যে কষ্টগুলো ছিল না সেগুলোর শোকর আগেভাগে আদায় করে নিলেন। অবশেষে বললেন, জ্বরের কথা। তাঁরা এমন লোক ছিলেন যাঁরা কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণে রাখতেন এবং এর শোকর আদায় করতেন। এরপরও কষ্টকে 'সামান্য' বললেন। তাও আল্লাহর দরবারে পেশ করলেন। এ এক কৃতজ্ঞ বান্দার কর্মপদ্ধতি। বাচনভঙ্গী।

নিয়ামতসমূহের ওপর শোকর আদায় কর

আমাদের অবস্থা এই যে, সামান্য অসুখে পড়তেই সমস্ত নিয়ামতকে আমরা ভুলে যাই। অসুখ নিয়ে মোটামুটি হতাশ হই। এর প্রতি অভিযোগ অনুযোগ করি। এজন্যই বুঝি আল্লাহ পাক বলেন–

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ

'আমার বান্দাদের খুব অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।'

যে সব নিয়ামতে আমি তাকে ডুবিয়ে রেখেছি– এর উপলব্ধিটুকু নেই তার। ওইসব নিয়ামতের ধ্যান নেই তার। এজন্য বলেন, নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর। এরপর শোকর আদায় কর। যে সব কষ্ট-ক্লেশ তোমার প্রতি আছে আল্লাহ

তাআলার কাছে তা পেশ কর। বলো, হে আল্লাহ! আমি কমজোর। এই তাকলীফ আমার সহ্য হচ্ছে না। তোমার ফজল ও করম দ্বারা আমার এই কষ্ট দূর করে দাও। যেখানে আপনি এই অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দান করেছেন সেখানে আপনি তাকলীফ দূর করার নিয়ামতটুকু অধমকে দান করুন। এরপরও খোদা তাআলার বর্তমান নিয়ামতের না-শোকরীকরো না।

দাঁত এক বিশাল নিয়ামত

আমাদের এক বোনের বয়স খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দাঁত পড়া শুরু হয়েছিল। একবার তিনি দাঁত ফেলে আব্বা হযরতের কাছে বলতে লাগলেন– আব্বাজান! দাঁত এ এক অদ্ভুৎ বস্তু। উঠার সময়েও কষ্ট দেয় আবার পড়ার সময়ও। কথার মর্ম হলো, শৈশবে যখন বাচ্চার দাঁত উঠে তখন দাস্ত আসে, কখনওবা আসে জ্বর। এদিকে শেষ বয়সে যখন পড়তে শুরু করে তখনও বড্ড তাকলীফ হয়। আব্বা হযরত তাঁর কথা শুনে বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, খোদার বাঁদি! এই দাঁতের কেবল দুটি দিকই তোমার স্মরণে আসল যে, উঠার ও পড়ার সময় তোমায় কষ্ট দিল। কিন্তু এর মাঝের সুদীর্ঘ ৫০–৬০ বছর এর দ্বারা যে মজা লুটেছো, যে শান্তি উপভোগ করেছ এবং যে স্বাদ আস্বাদন করেছ কখনও সে দিকগুলো খেয়াল করেছ কী?

বুঝলাম, ওঠতে ও পড়তে কষ্ট হয় কিন্তু বছরের পর বছর ধরে তাঁর প্রদত্ত এই দন্তমালা দ্বারা মণকে মণ টনকে টন খোরাক পেষণ করেছ, একে তোমার শরীরের অঙ্গ বানিয়েছ– এর প্রতি সামান্য খেয়াল যায় না? সামান্য কষ্ট আমাদেরকে সেই সোনালী দিনগুলোর কথা ভুলিয়ে দিল? কী মানুষ আমরা, একটুতেই আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে ভুলে যাই!

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের ফায়দা

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত দ্বারা এই ফায়দা হয় যে, তারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে দেন। এ যাবত দৃষ্টি কেবল তাকলীফ, মুসীবত ও উদ্বিগ্নতার দিকে গিয়েছে। আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে তা নিয়ামতের উপরে পড়তে থাকবে। যে তাকলীফই আসুক না কেন তাও আল্লাহর সমীপে পেশ করতে হবে। বলতে হবে, হে আল্লাহ! আমি এক দুর্বল বান্দা। আমি এই তাকলীফ সহ্য করতে পারছি না। আয় আল্লাহ! তোমার রহমতে একে দূর করে দাও। কমপক্ষে যতটুকু নিয়ামতে তোমাকে ধন্য করেছেন ততটুকুকে ভুলো না।

উপকারীর সঙ্গে কী মহব্বত হবে না?

সুতরাং রাতে শোয়ার পূর্বে খানিকক্ষণ বসে নিয়ামতের জরিপ করুন। আপনার দেহের উপর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের, আপনার পারিপার্শ্বিক নিয়ামতসমূহের বরং আপনার পরিবারের উপর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের জরিপ করুন। এর এক একটির জন্য শোকর আদায় করুন। এরই নাম 'মুরাকাবা'। এই 'মুরাকাবা' একটি অনন্য মাধ্যম। দৈনিক করে দেখুন, এমনটি করলে দেখবেন এর ফলশ্রুতিতে এমনিতেই আল্লাহ তাআলার মহব্বত অন্তরে পয়দা হয়ে যাচ্ছে। ধরুন, দৈনিক কেউ আপনার দরোজায় পয়সা রেখে চলে যায়। আপনি তুলে নিয়ে প্রয়োজন সারছেন। এর দ্বারা উপকৃত হয়ে চলেছেন। এক্ষণে আপনার মন থেকে তাকে দেখার শখ পয়দা হবে যে, যে লোক আমার দরোজায় পয়সা রেখে যাচ্ছে, যদ্ধারা আমি আমার প্রয়োজন পুরা করছি। একে একটু দেখে নেয়া দরকার। দেখা হলে তো ভাল। পরে তাকে দেখার সুযোগ আসুক কিংবা নাইবা আসুক তার মহব্বত অন্তরে অতি অবশ্যই পয়দা হবে। একজন মানুষ দিনে একবার মাত্র আপনার দরোজায় পয়সা ফেলছে এবং যদ্দারা আপনি আপনার প্রয়োজন মেটাচ্ছেন, তার কল্পনায় যদি আপনার মনে এই পরিমাণ মহব্বত পয়দা হতে পারে; তাহলে যে মহান সত্ত্বা প্রতি মুহূর্তে আপনার প্রতি নিয়ামত-বারিবর্ষণ করে চলেছেন, সেই সত্ত্বাকে যদিও দৃষ্টিশক্তি বেষ্টন করতে অপারগ তথাপিও আপনি কী তাকে মহব্বত করবেন না? ঐ সব নিয়ামতের বদৌলতে আপনি তাঁর সাথে কী মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন ও তা নিবিড় করবেন না? এজন্য প্রতি রাতে ১০ মিনিটের জন্য হলেও তাঁর সকল নিয়ামতের মূল্যায়ন করে মুরাকাবা করুন এবং প্রত্যেক নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করুন।

শোকর আদায় করার বিস্ময়কর ঘটনা

আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, আমি এই বিষয়টি আমার এক প্রিয়জনের থেকে শিখেছি। তিনি দৈনিক শোয়ার পূর্বে বিছানায় বসে নিম্নোক্ত শব্দগুলো জপতেন। বার বার বলতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, দৈনিকই রাতে শোয়ার পূর্বে আপনি এ কি করেন? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ ভাই! সারা দিন তো নিয়ামতের শোকর

আদায় করার সময় পাই না। এজন্য রাতে শোয়ার পূর্বে আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করি। এক একটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করি। হযরত ডাক্তার সাহেব বলেন, তিনি শোকর আদায় করার বিস্ময়কর এক পদ্ধতি বাতলে দিলেন। মোটকথা, রাতে শোয়ার পূর্বে দশ মিনিট এ কাজের জন্য বের করুন। এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ামতের কথাও স্মরণে আনুন এবং এর প্রতি আল্লাহর শোকর আদায় করুন। এ আমল আপনাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা করে দিবে। আল্লাহ পাকের মহব্বত অন্তরে পয়দা হলে সকল কাজই আসান হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সকলকে এইসব কথার প্রতি আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সাতাশিতম মজলিস

আল্লাহর মহব্বত পয়দা করার উপকরণ ও পদ্ধতি

আল্লাহর মহব্বত পয়দা করার উপকরণ ও পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

দ্বিতীয় পদ্ধতি : আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কথা চিন্তা করা

গত ক'দিন ধরে এ বিষয়ের আলোচনা চলছে। বিষয়বস্তু ছিল "আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব এবং তা পয়দা করার পদ্ধতি"। আল্লাহ তাআলার মহব্বত পুরো দ্বীনের বুনিয়াদ। হযরত থানভী (রহ.) আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দা করার পয়লা তরীকা সম্পর্কে বলেছেন, 'অধিক হারে আল্লাহর যিকির করা'। এর সামান্য বর্ণনা পূর্বে আরজ করেছি। দ্বিতীয় তরীকার বর্ণনা গতকালও সামান্য বলেছি। আর তা ছিল, 'আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহ এবং আমাদের আচরণ সম্পর্কে চিন্তা করা'। আল্লাহ পাক যেসব নিয়ামত প্রতি মুহূর্তে বান্দাকে দিচ্ছেন এর কল্পনা ও ধ্যান করার ফলশ্রুতিতে, আপনার প্রকৃত উপকারীর মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। একথা স্বত:সিদ্ধ যে, যে লোক সর্বদা অন্যের অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য এবং অন্য লোক তার প্রতি বিনা চাওয়ায়ই অনুগ্রহ করে, ওই লোকের সাথে মহব্বত পয়দা হওয়া সহজাত দাবী।

তাঁর নিয়ামত সকলের জন্য উন্মুক্ত

আল্লাহ পাকের নিয়ামতের পরম্পরা অশেষ, অপার। এইসব নিয়ামত যখন বারবার স্মরণ করা হবে তখন তার মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। প্রয়োজন শুধু ধ্যানের। তাঁর নিয়ামত তো লাগাতার জারী আছেই। আপনি শোকর আদায়

করুন আর নাইবা করুন তাঁর নিয়ামতে কখনও ঘাটতি হবে না। শেখ সাদী (রহ.) বলেন–

ادیم زمین سفرہ عام اوست
بری خوان نعمت چہ دشمن چہ دوست

অর্থাৎ, সুবিশাল পৃথিবীতে আল্লাহ পাক এক সার্বজনীন দস্তরখান বিছিয়ে রেখেছেন যে, সকল মাখলূক এর থেকে উপকৃত হয়ে চলেছে। এই দস্তরখানের ওপর দোস্ত-দুশমনের ভেদাভেদ নেই। দুশমনকেও তিনি ঐভাবে অকৃপণ হস্তে দান করেন যেভাবে করেন দোস্তকে। এই দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার নিয়ামত মুসলমান ও কাফের সকলের তরে সমান। বরং ক্ষেত্র বিশেষে কাফেরদের প্রতি বেশিই। ওরা মুসলমানদের তুলনায় স্বচ্ছল। অধিক উন্নত। ওদের কাছে কাড়ি কাড়ি টাকা, বিত্ত-বৈভব। আল্লাহ তাআলা দেখছেন, অমুক আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, আমাকে করছে অপদস্ত, আমার সঙ্গে গোস্তাখি করছে, অস্বীকার করছে আমার অস্তিত্বকে; এরপরও আল্লাহ পাক তাকে নিয়ামত দিয়ে চলেছেন– এটি আল্লাহ তাআলার নিয়ম।

দোস্তদের অভাব-অনটন এবং দুশমনদের স্বচ্ছলতা

বরং কোন কোন সময় আল্লাহ ইচ্ছা করে পেয়ারা বান্দাদের এই দুনিয়ায় অভাব-অনটনে ফেলেন এবং শত্রুদের ধন-সম্পদে পূর্ণ করেন। সুতরাং মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

ما پروریم دشمن ما می کشیم دوست
کس را چرا و چوں نہ رسد در قضاء ما

অর্থাৎ, কখনও আমি শত্রুকে লালন করি এবং দোস্তকে হত্যা করি। যেভাবে সামেরী যাদুকরকে জিবরাঈল (আ.)-এর দ্বারা পালন করা হয়েছে। অপর দিকে ইলিয়াস (আ.)কে করাত দ্বারা দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছে। সুতরাং জগৎ-সংসারে আল্লাহ পাকের নিয়ামত দোস্ত-দুশমন ও মুসলিম-কাফের সকলের তরে সমান। আল্লাহ পাকের নিয়ামতে কোন হেরফের হয় না।

ঐসব নেয়ামতের প্রতি কোন ধ্যান নেই

کوئی جو نا شناس ادا ہو تو کیا علاج
ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

'কেউ যদি অকৃতজ্ঞ হয় তাহলে তার চিকিৎসা কী? তাঁর দান-অনুদানে তো কোন কমতি নেই।'

তার অনুগ্রহ সর্বদা অব্যাহত। প্রয়োজন শুধু চিন্তা করার যে, আমরা তার নিয়ামতের প্রতি গাফেল— চিন্তা করি না। করি না মূল্যায়ন– এজন্য নিয়ামতের খেয়াল নেই। আল্লাহ পাক যদি তাঁর ধ্যান করার তাওফীক এনায়েত করেন তাহলে এটি আদৌ সম্ভব নয় যে, ঐসব নিয়ামত মূল্যায়ন করার পরও অন্তরে তার মহব্বত পয়দা হবে না। এজন্য গতকাল আমি আরজ করেছিলাম, রাতে শোয়ার পূর্বে নেয়ামতসমূহের কথা চিন্তা করুন এবং এর শোকর আদায় করুন। মোটকথা, মহব্বত পয়দা করার দ্বিতীয় তরীকা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কথা চিন্তা করা।

তৃতীয় তরীকা : নিজের আচরণ ও কর্মকাণ্ড নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

এরপর হযরত বলেন, 'এর পাশাপাশি নিজের আচরণ ও কর্ম নিয়ে ভাবুন। অর্থাৎ, ভাবুন, একদিকে আল্লাহ পাকের নিয়ামতের অবস্থা এই যে, বৃষ্টির মত অবিরাম ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। অপর দিকে আমার কর্ম এই যে, আল্লাহ পাক সামান্য যে ইবাদতের হুকুম দিয়েছেন– তাতে অলসতা করছি। যে গোনাহ্ থেকে তিনি বিরত থাকার আদেশ করেছেন– আলসেমি করছি তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রেও।

মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন–

کارساز ما بساز کار ما - فکر ما در کار ما آزار ما

অর্থাৎ, আমাদের কর্মের নিয়ন্তা দিন-রাত আমাদের কাজে লেগে রয়েছেন। আমাদের চাহিদাগুলো পূরণ করে চলেছেন। আমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত বর্ষণ করছেন। কিন্তু যে কাজ তিনি আমাদের ওপর সোপর্দ করেছেন সে কাজকে

আমরা বিপদ মনে করছি। আমরা নামায পড়াকে মুসীবত মনে করছি, রোযা রাখাকে মুসীবত মনে করছি, গোনাহ্ থেকে বাঁচাকে মুসীবত মনে করছি। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের জবাবে বান্দার কর্মকাণ্ড কতইনা অকৃতজ্ঞতাধর্মী। যদি মানুষ এই ভাবে যে, আমার এই শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের পরও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার ওপর নিয়ামতের বারিবর্ষণ হচ্ছে– এর দ্বারা আল্লাহর মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহ এবং পরে তোমার আচরণ/কর্মকাণ্ড নিয়ে ভাবো।'

নিজের অবস্থান নিয়ে চিন্তা কর

হযরত থানভী (রহ.)-এর উপরোক্ত কথার আরেকটি মর্ম হতে পারে, যা তিনি অন্যত্র বর্ণনা করেছেন। যেমন, আমাদের ভাই কালিম সাহেব বলেছেন, তিনি হযরতের কোন এক ওয়াজে এই ব্যাখ্যা পাঠ করেছেন যে, যেভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে এবং আপনার কর্ম নিয়ে ভাবলে আল্লাহ তাআলার মহব্বত পয়দা হয় একইভাবে আল্লাহ পাকের নিয়ামত এবং নিজ অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা করার দ্বারাও অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়। নিজ অবস্থান নিয়ে চিন্তা করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, মহত্ব, প্রতিপত্তি, তাঁর রহমত, পূর্ণ শক্তি ও মহা কৌশলের কথা চিন্তা করা। অপর দিকে নিজের অবস্থানগত দৈন্যতা কল্পনা করে ভাববে, আমার কোন পদমর্যাদা নেই, আমি তো কোনও কাজের যোগ্য নই, আমার কাছে যা আছে সবই তো তাঁর দান। নতুবা আমার কাছে তো কিছুই ছিল না। আমি নিজকে এমনিতেও তো অস্তিত্বে আনয়ন করতে পারতাম না। আমি নিজেকে জীবিতও রাখতে পারতাম না। চেহারা, অবয়ব, সুস্থতা ও জ্ঞান কোনটিই আমি অর্জন করতে পারতাম না। এর কিছুই আমার কাছে ছিল না। এসব কিছুই তাঁর দান। যখন চাইবেন ছিনিয়ে নিতে পারেন। ফিরিয়ে নিতে পারেন।

এতে আল্লাহর শোকর ও মহব্বত বাড়ে

সবকিছুই যখন তাঁর অবদান তখন কী নিয়ে গৌরব করব, কীসের ওপর গৌরব করব, কেন আত্মতৃপ্তি আর আত্মগৌরবে ব্রতী হবো। কেননা আমার থেকে আমার অস্তিত্বের মাঝে কিছু দেওয়া হয়নি। এই হচ্ছে, নিজের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করা। এতে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হয়। যতটা নিজের দৈন্যদশা মূল্যায়ন করা হবে ততটা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের বড়ত্ব অনুভূত হবে। মানুষ যদি নিজেকে এসব নেয়ামতের যোগ্য মনে করে তাহলে সে ভাববে, আমার সাথে আল্লাহর এমনটিই করা দরকার ছিল। এই নিয়ামত আমাকে দেওয়ারই ছিল। এ ধরনের

সূচিপত্র

মানুষ আল্লাহ পাকের কী শোকর আদায় করবে? তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার জন্য কোত্থেকে মহব্বত আসবে? পক্ষান্তরে মানুষ যদি এই ভাবে যে, আমি এক পদমর্যাদাহীন, নিঃস্ব এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক আমাকে এই নিয়ামত দান করেছেন তবেই কেবল সে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবে এবং দিলে তাঁর মহব্বত পয়দা হবে।

জনৈক বুযুর্গ ও অহংকারীর ঘটনা

মনে যদি এই খেয়াল পয়দা হয় যে, আমি বড়, আমার যথেষ্ট যশ:খ্যাতি আছে, অন্তরে অহমিকাবোধ জাগ্রত হচ্ছে– এ সময় মানুষ অপরকে বলে, জানো না আমি কে? এক লোককে জনৈক বুযুর্গ ইসলাহের কথা বললে সে কথা কেটে বলল, জানেন না আমি কে? অর্থাৎ, আমি এক বিশাল ব্যক্তি। আপনি আমার ইসলাহ করবেন? জবাবে ঐ বুযুর্গ বললেন, হ্যাঁ! আমি জানি তুমি কে, তোমার প্রকৃতি এই যে–

মানুষের বাস্তব অবস্থা ও প্রকৃতি

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ وَآخِرُكَ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ، وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

“তোমার শুরুটা পুতিগন্ধময় নাপাক বীর্যের একে ফোঁটা, এইতো তোমার পরিচয়। শেষ পরিচয় তুমি এক দুর্গন্ধময় লাশ। তোমার পরিবার তোমাকে ২৪ ঘণ্টাও ঘরে রাখবে না। তোমার মরণে তারা কাঁদবে ঠিকই কিন্তু ঘরে রাখতে রাজী হবে না। তারা বলবে, লাশের দুর্গন্ধ সহ্য করার শক্তি আমাদের নেই। সুতরাং দ্রুত তাঁকে কবরস্থানে নিয়ে যাও। মাটির তলে শুইয়ে দাও। এদিকে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তুমি নাপাক বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছ। এ কোন অতিরঞ্জিত কথা নয়– এক অপ্রিয় সত্য কথা। বাস্তবিক পক্ষেই চিন্তা করলে দেখা যাবে, মানুষের আপাদমস্তকে নাপাকের স্তুপ। আল্লাহ পাক চামড়া দ্বারা এগুলো চোখের আড়াল করেছেন। দোষ-ত্রুটি লুপ্ত আছে। দুর্গন্ধ গুপ্ত আছে। নয়ত এই সুন্দর চেহারায় সামান্য চিড় ধরলে দেখবেন নাপাক বেরিয়ে আসছে। কোথাও রক্ত, কোথাও পুঁজ, কোথাও পেশাব, কোথাও পায়খানা ভরপুর। এগুলো কারো থেকে বেরিয়ে এলে কেউ ধারে কাছেও বসতে চাইবে না। বরং ঘৃণা করবে। এমনকি কেউ ওদিকে তাকাতেও চাইবে না। সুন্দর এই দেহখানি তখন ভয়াবহ রূপ নেবে। দেখে সকলে ভয়ে শিউরে ওঠবে। সুতরাং আপনার শুরুটা দুর্গন্ধময় বীর্যের,

সমাপ্তিটা পঁচা লাশের, মাঝে ক'দিন (পেটস্থ) মলমূত্র বহনের। এই যার বাস্তবতা, এই যার প্রকৃতি সে কি এরপরেও বলতে পারে, জানো আমি কে?

আত্মবিনাশ কাম্য

যতক্ষণ মানুষের নিজস্ব এই বাস্তবতার অনুভূতি-উপলব্ধি না হবে ততক্ষণ তার আল্লাহ পাকের নিয়ামতের উপলব্ধি হতে পারে না। হতে পারে না যথাযোগ্য মর্যাদায় আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দাও। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেন, 'নিজের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় লাভ কর' এবং এই রাস্তায় পয়লা সবক এই যে, "আপনার প্রকৃতি জানা, নিজে নিজেকে মিটানো, নিজকে লয় করা" যার মধ্যে দাবী থাকবে, উচ্চাভিলাস থাকবে, শান-শওকত করবে এবং অহংকার সৃষ্টি করবে– সে এ পথের কিছুই লাভ করতে পারেনি। এখানে ভগ্নতা, বিধ্বস্ততা ও আত্মবিনাশ মূখ্য, আপনার অবস্থান-অনুভূতি বিচার্য ও আল্লাহ পাকের সামনে নীত হওয়া সবিশেষ কাম্য।

নিজের নজরে ছোট অন্যের নজরে বড়

এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَفِىْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

'হে আল্লাহ! আপনি আমার দৃষ্টিতে আমাকে ছোট বানিয়ে দিন অর্থাৎ, যখন আমি আমাকে দেখব নিজেকে ছোট ভাবব, যাতে আমার ভেতরে শিষ্টাচার পয়দা হয়, বিনয় আসে। অবশ্য লোকদের দৃষ্টিতে আমাকে বড় করে দিন। কেননা লোকেরা যদি আমাকে ছোট জ্ঞান করে তাহলে আমার প্রতি তারা জুলুম ও বাড়াবাড়ি করবে। কবি কত সুন্দর বলেছেন–

سگ باش، وبرادر خورد مباش

"কুকুর হও কিন্তু ছোট ভাই হয়ো না।"

মর্ম হচ্ছে, সকল মুসীবত ছোট ভাইয়ের ওপর নাযিল হয়। এজন্য যদি অন্যে মনে করে যে, এ লোক ছোট তাহলে এর প্রতি জুলুম করবে, একে ভূনা করে খাবে। এ যখন ছোট, তখন যা খুশি তাই কর। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য, আপনাকে বাঁচানোর জন্য লোকদের দৃষ্টিতে হে আল্লাহ! আমাকে বড় করে দিন যদিও আমি নিজকে ছোটই মনে করি।

শুরু ও শেষ ধ্বংস ও বিলোপ

হযরত হাকীমুল উম্মত (কুঃ সিঃ) বলেন, আমাদের শায়খ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর প্রথম ও সর্বশেষ সবক ছিল 'বিনাশ ও বিলোপ'। অর্থাৎ, নিজেকে মিটিয়ে দাও। বলেন, যিনি হামবড়া ভাব রাখেন, পীরগিরি ও শান-শওকতের রাহা এখতিয়ার করেন– আমাদের তরীকার বাতাস তার গায়ে লাগেনি। এজন্য সাধারণ মানুষের মত থাকো। কোন শান-শওকত বানানোর জরুরত নেই। বিলাস-ব্যসন পরিহার কর। নিজের বাস্তবতা সামনে রেখো। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের উপলব্ধি আসবে, শোকরের তাওফীক হবে এবং আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দা হবে।

চতুর্থ পদ্ধতি : আল্লাহওয়ালাদের সোহবত

এরপর হযরত থানভী (রহ.) মহব্বত সৃষ্টিকারী চতুর্থ উপকরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'কোন আহলুল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা'। এটিও মহব্বত পয়দা করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। খুব সম্ভব সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য আল্লাহওয়ালাদের সাথে যতটা মহব্বত হবে, যতটা সম্পর্ক কায়েম হবে, যতটা এঁদের সাথে ওঠ-বস করা হবে, খেদমতে পড়ে থাকা হবে; ততটা আল্লাহর মহব্বত অন্তরে দাগ কাটবে। আমাদের হযরত একটি কবিতা পড়তেন–

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ - ملنے والوں سے راہ پیدا کر

'তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার তরীকা এই যে, তাঁর সাথে যারা মিলিত হয় তাদের রাস্তা ধরো, সম্পর্ক জোড়; তাহলে ইনশাআল্লাহ সেও মিলে যাবে। সুতরাং যারা আল্লাহওয়ালা, যাদের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার মহব্বত বদ্ধমূল তাঁদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। এঁদের নিকটে থাকো, তাআল্লুক পয়দা কর। মহব্বত কর, এসব কাজের দ্বারা আল্লাহর মহব্বত তোমার হৃদয়ে পয়দা হবে।

আল্লাহর মহব্বত বদ্ধমূল করছি

আব্বা হযরত এই ঘটনা শোনাতেন যে, একবার হযরত থানভী (রহ.) তাঁর মজলিসে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও তাঁর রাসূলের মহব্বত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূবও (রহ.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বয়ানের মাঝপথে হযরত খাজা সাহেব বললেন, হযরত! খোদার দিকে চেয়ে আমার হৃদয়েও খানিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত ঢেলে দিন।

থানভী (রহ.) বললেন, এই যে বয়ান হচ্ছে, এর দ্বারা তোমার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এমনিতেই ভরে যাচ্ছে– এছাড়া আমি আর কিইবা করতে পারি। মোটকথা, যখন মানুষ আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসে, তাঁদের কথা শ্রবণ করে, তাঁদের মুখ নিঃসৃত বাণী শোনে এবং তাঁদের কার্যকলাপ দেখে; এ সকল কাজের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এর দ্বারাই আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত পয়দা হয়। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কোন আল্লাহওয়ালার সাথে তাআল্লুক পয়দা কর।

পঞ্চম পদ্ধতি : নিরবচ্ছিন্নভাবে ইবাদত

মহব্বতের উপকরণের পঞ্চম পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'নিরবচ্ছিন্নভাবে ইবাদত করা'। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার আহকামের আনুগত্য করা। যত বেশি আনুগত্য করবে তত বেশি মহব্বত বাড়বে। আল্লাহ তাআলা 'মহব্বত' ও 'আনুগত্য' এর মাঝে অদ্ভুৎ সম্পর্ক রেখেছেন। তা হচ্ছে এই যে, আনুগত্য দ্বারা মহব্বত পয়দা হয়। এরপর 'মহব্বত' দ্বারা অধিক 'আনুগত্য' সৃষ্টি হয়। পরে এই 'মহব্বত' দ্বারা অধিক আনুগত্যের পরিণতি পাওয়া যায়। এ এক অনিঃশেষ সিলসিলা, যা কখনও শেষ হয় না।

এর দ্বারা 'দাওর' (পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল) হয়ে যাচ্ছে

বলা হচ্ছে– দ্বীনের ওপর চলতে হলে মহব্বত পয়দা কর। আর মহব্বত পয়দা করার জন্য দ্বীনের ওপর চলো। এর দ্বারা 'দাওর' লাযেম আসবে। অর্থাৎ, যে দুটি জিনিস অর্জন করতে চাই, তার একটার ওপর আরেকটা নির্ভরশীল। তাহলে এগুলো কীভাবে অর্জন করবো। এ প্রশ্নের উত্তর খুব গভীরভাবে বুঝতে হবে।

শুরুতে সামান্য মেহনত ও হিম্মত চাই

এর জবাব এই যে, আল্লাহ পাক তাঁর আনুগত্যে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, যখন কোন বান্দা শুরু থেকে সামান্য মেহনত করে আনুগত্য করবে তখন এর দ্বারা তিনি 'মহব্বতের' এক বিশেষ স্তর দান করবেন। পরে 'মহব্বতের' এই বিশেষ মর্যাদার পরিণতিতে অতিরিক্ত আনুগত্যের জযবা পয়দা হবে। একথার সার-সংক্ষেপ হলো, মেহনত ও আমল ছাড়া এমনিতেই কোন প্রকার মহব্বত পয়দা হয় না। আর এমনিতেই আনুগত্য করাও সহজ হয় না। বরং দ্বীন শুরুতেই কিছু ত্যাগ চায়। সামান্য কিছু হিম্মত ও মেহনত চায়। এই হিম্মত ও মেহনত ছাড়া

এই দৌলত অর্জন করা যায় না। সুতরাং শুরুতেই মানুষের এই কাজ করতে হবে যে, কু-প্রবৃত্তির বিপরীত এবং পার্থিব ও মানবিক চাহিদার বিপরীত মেহনত করা লাগবে। আর মানুষ একবার যখন মেহনত করবে তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে একটি নূর পয়দা করে দেবেন।

বাষ্পের চাপে রেল জোরে চলে

কথাটিকে হযরত থানভী একটি উপমা দ্বারা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি রেলের ইঞ্জিনে বাষ্প ভরা থাকে (ওই যুগে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলত, এক্ষণে ডিজেল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালু আছে) তাহলে রেল খুব জোরে চলবে। কিন্তু যদি রেল-এ সবকিছু মওজুদ থাকে, চাকা লাগানো থাকে, কিন্তু ইঞ্জিনে বাষ্প না থাকে। এক্ষণে যদি কেউ ধাক্কা লাগিয়ে ইঞ্জিন চালাতে চায়, তাহলে এই ট্রেন বড্ড কষ্ট করে সারা দিনে এক দু' কিলোমিটারই যেতে পারবে। পক্ষান্তরে ইঞ্জিন যদি বাষ্পভর্তি থাকে তো একবারের বাষ্প দ্বারা দিনভর চার-পাঁচশো মাইল অতিক্রম করতে পারবে।

'মহব্বত' বাষ্প-এর মত

হযরত বলেন, ট্রেন দ্রুতগতিতে চলার জন্য দুটি জিনিস দরকার। ১. বাষ্প, ২. চাকা। যদি ইঞ্জিনে বাষ্প না থাকে শুধু চাকা দ্বারা ট্রেন জোরে চলতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি বাষ্প থাকে কিন্তু চাকা না থাকে তখন বাষ্প এই ট্রেনকে ধ্বংস করে দেবে। ট্রেন যমিনে ধ্বসে যাবে। সুতরাং যেমন বাষ্পের জরুরত আছে, তেমনি আছে জরুরত চাকারও।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এভাবে মানুষের ভেতরের 'মহব্বত' বাষ্পের সাথে তুল্য। আর আমল চাকার সাথে তুলনীয়। এজন্য সামান্য আমল করতে হবে। পরে এই আমলের মাধ্যমে যখন মহব্বতের বাষ্প পয়দা হবে তখন দ্রুতই উন্নতি হবে এবং দ্রুততার সাথে আমল হবে।

ফ্লাইয়ের পূর্বে রানওয়েতে বিমান চলা

আজকাল উপমাটি এভাবেও বোঝা যেতে পারে যে, যেমন ধরুন বিমান। এটি হাওয়ায় ওড়ে। হাওয়ার মাঝে ভেসে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল চলে। কিন্তু ফ্লাইয়ের পূর্বে রানওয়েতে চক্কর দেয়া লাগে। এমন কোন বিমান নেই যা চক্কর না দিয়ে সরাসরি আকাশে ফ্লাই করে; বরং খানিকক্ষণ তাকে রানওয়ের উপর দিয়ে কারের মত চলতে হয়। এ সময়টি আমার মত প্যাসেঞ্জারের জন্য খুবই ধৈর্যবহ

হয়ে থাকে। কেননা যখন জাহাজ উড়াল দেয় তখন আমি আমার লেখার কাজ শুরু করে দিই। যতক্ষণ রানওয়েতে চলে ততক্ষণ কলম বন্ধ রাখি। মোটকথা, বিমান মাত্রই ফ্লাই করার আগে জমিনে কিছুক্ষণ চলে থাকে। পরে সে শূন্যে উড়ে যায়। মহব্বত পয়দা করার জন্য ঠিক এমন সামান্য মেহনত করতে হবে, সামান্য আমল করতে হবে। যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনার্থে কু-প্রবৃত্তির খেলাফ আমল করা শুরু করবে, তখন মহব্বতের বাষ্প আপনার মধ্যে পয়দা হবে এবং পরে দ্রুতই উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন হবে।

ঈমানের স্বাদ আস্বাদন কর

উক্ত কথাই ঐ হাদীসে ফুটে উঠেছে, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন বেগানার প্রতি নজর ফেলতে মন চায় এবং মনে খুবই উৎসাহ জাগে যে, আমি তার প্রতি দৃষ্টি ফেলে স্বাদ আস্বাদন করব; এমতাবস্থায় যদি আপনি তার প্রতি দৃষ্টি না ফেলে নজরকে বাঁচিয়ে নেন তো এর দ্বারা আপনি ঈমানের এমন এক স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন যা ঐ গোনাহের তুলনায় অনেক মজাদার। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'বান্দা আমার! সকাল-সন্ধ্যা আমি তোমার প্রতি কতই না নেয়ামত বর্ষণ করে চলেছি। এর বদৌলতে তোমার কাছে আমার চাওয়া এই যে, আমার খাতিরে তোমার অবৈধ খায়েশগুলো পরিহার কর। যদি তুমি নিজেকে বাঁচাতে পার তাহলে আমি তোমার কাছে ওয়াদা করছি–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (سورة الروم : ٦٩)

অর্থাৎ, যারা আমার রাস্তায় সামান্য কোশেশ করবে তাদেরকে আমি অতি অবশ্যই হাত ধরে পথে তুলে দেব। (সূরা রূম : ৬৯)

প্রবৃত্তি দমনের এই কল্পনা ফলপ্রসূ

অতএব সামান্য কুরবানী করতে হবে। জান্নাত এত সস্তা নয়। মহব্বতও এত সস্তা নয়। আর এই কুরবানী হচ্ছে, নফসকে নাজায়েয খাহেশাত হতে প্রতিহত করার অভ্যাস বানানো। সহজে এ কাজ করার জন্য এই কল্পনা করো যে, এটি দুনিয়া, জান্নাত নয়। এই দুনিয়ার বড় বড় মানুষেরা চায় যে, সে বড় প্রশাসক হবে, পুঁজিপতি হবে, বিত্তশালী হবে। সে কি দাবি করতে পারে যে, আমার যা কিছু হয়েছে তা আমার মর্জি মোতাবেক হয়েছে? বরং এ দুনিয়ায় মানুষের মর্জির বিরুদ্ধে অনেক অবস্থাই আসে। আসতে থাকে। এ থেকে বাঁচা

মুশকিল। আজ যাদের হাতে দুনিয়ার শাসনভার। যাদের কাছে বিত্ত-বৈভবের পাহাড়, নকর-চাকর, পেয়াদা-বরকন্দাজ মওজুদ, দুনিয়ার যাবতীয় উপকরণ যাদের হাতে, তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন— তোমাদের মর্জির বাইরে কাজ হয়েছে কি-না? তাদের প্রকৃতি বিরোধী এমন অনেক কাজ করা হয়, যা আমার আপনার প্রকৃতি বিরোধী করা হয় না। সুতরাং এটি তো কিছুতেই হতে পারে না যে, আমরা হামেশা খোশ থাকব। কোন কষ্ট-মুসীবত আমাকে পেয়ে বসবে না। কোনও আঘাত আমি পাব না। কখনই আমার প্রকৃতিবিরোধী কোন কথা হবে না। সুতরাং বোঝা গেল তবিয়তবিরোধী হালতের সম্মুখীন হওয়া লাগতেই পারে।

দুটি পথ

এক্ষণে দুটি পথই খোলা। প্রথম রাস্তা এই যে, নিজ মনের চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য এমন কাজ অবলম্বন করো, যার পরিণতিতে আল্লাহ পাক রাজী হয়ে যান। আর সেক্ষেত্রে আল্লাহ বলবেন, দেখো, এই হোল আমার বান্দা। যে আমার খাতিরে নিজের মনের চাহিদাকে পদদলিত করে দিয়েছে। দ্বিতীয় পথ হলো, আপনার কু-প্রবৃত্তির চাহিদাকে পূর্ণ করতে থাকো। এর কোশেশ করতে থাকো। কিন্তু এর ফল এই হবে যে, তুমি সারা জীবন মনচাহি যিন্দেগীতে লিপ্ত থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তা হতে দূরে সরে যেতে থাকবে। সুতরাং যখন মনচাহি যিন্দেগীর খেলাফ কাজ হবেই, তখন আল্লাহর চাহিদা মাফিক মন বিরোধী কাজটি করলেই তো সোনায়-সোহাগা হয়।

এই কষ্ট মজাদার হয়ে যাবে

আর যখন আপনি একবার এই কল্পনা করবেন যে, তবিয়তের খেলাফ এই আমল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছেন, তখন এই তকলীফও শেষ পর্যন্ত মজাদার হয়ে যাবে, কিন্তু কেন? এজন্য যে, যখন এই কল্পনা আসবে যে, আলহামদুলিল্লাহ্ প্রকৃত প্রেমাস্পদের জন্য আমি আমার কুপ্রবৃত্তিকে দমন করেছি। এতে মন প্রফুল্ল হবে। এর দ্বারা যে নূর পয়দা হবে তদ্বারা আত্মার প্রশস্ততা ও প্রফুল্লতা আসবে। এর সামনে দুনিয়ার হাজারো মজা মাথা কুটে মরতে বাধ্য।

ভগ্ন হৃদয়ের সাথে আল্লাহ পাক

আল্লাহ তাআলা কখনও এটি চান যে, আমার বান্দা তার হৃদয়কে আঘাত করুক। যেমন একটি কাজ করতে মন চাইছে। কিন্তু মনের বিরুদ্ধে গিয়ে সেই

কাজ হতে বান্দা বিরত থাকল। যখন আল্লাহ তাআলার খাতিরে অন্তরের বিরুদ্ধে যাওয়া হবে তখন আল্লাহ পাক বলবেন, আমি তার হৃদয়ে বসে যাব। এই হৃদয় আমার আলো বিকিরণ কেন্দ্র। যেমন কোন কোন বর্ণনায় আছে যে,

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিদের সাথে আছেন। এক্ষণে ভগ্নহৃদয় দু' প্রকার হতে পারে। অনিচ্ছাকৃতভাবে হৃদয় ভগ্ন হতে পারে। আর তা এভাবে যে, তার প্রতি কোন মুসীবত পতিত হলো। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমি এদের সাথে আছি। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, অন্তরে গোনাহ করার খাহেশ পয়দা হচ্ছিল, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কু-রিপু দমন করল। এর দ্বারা হৃদয় ভগ্ন হোল। আল্লাহ তাআলা এমতাবস্থায়ও বলেন, আমি তোমার সাথে আছি।

অন্তর নূর বিকিরণের কেন্দ্র

এ কথাটি বুঝাতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল বড় সুন্দর একটি কবিতা রচনা করেছেন–

تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

অর্থাৎ, এমনটি করো না যে, তোমার অন্তর বেঁচে থাকবে এবং তন্মধ্যে যে খায়েশ পয়দা হচ্ছে, তাও পুরা করতে থাকবে– এমনটি করো না। কেননা যে সত্ত্বা এই অন্তরকে আয়েনা বানিয়েছেন সেই সত্ত্বাই বলছেন, এই অন্তরের আয়েনা যতই ভাঙ্গা হবে ততই প্রিয় হতে পারবে। ততই আমি অন্তরের সাথী হব। এই অন্তর আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য বানিয়েছেন। এই অন্তর তাঁরই আলো বিকিরণ কেন্দ্র। এতে কারো অংশীদারিত্ব তিনি পসন্দ করেন না। এই 'অন্তর' আল্লাহ তাআলার জন্য ওই সময়ই স্থির হয়, যখন এর খাহেশাতের কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার করা হয়।

আমি বিরাণ ঘরেই থাকি

আমি একটি পংক্তি রচনা করেছিলাম। হযরত হাকীম আখতার ছাহেব এটি খুব পসন্দ করেন। তাঁর মজলিসে এটি শুনিয়েও থাকেন। পংক্তিটি হলো–

دردِ دل دے کے مجھے اس نے ارشاد کیا

ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا

অন্তরকে ভাঙ্গার অর্থ হলো, খাহেশাতকে আল্লাহ তাআলার জন্য কুরবানী করা। অন্তরে গোনাহ করার উৎসাহ জাগছে, গোনাহ করার আকুতি হচ্ছে, চারদিকে ছড়ানো গোনাহের ধুম্রজাল হাতছানি দিচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর খাতিরে আমি অন্তরকে বিরাণ করছি, তার আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি। এ অবস্থায় আল্লাহ পাক ওই হৃদয়ে বসবাস শুরু করেন। পরে এ হৃদয় আল্লাহ পাকের আলোক মিনার হয়ে যায়।

মহব্বত দ্বারা আনুগত্য এবং আনুগত্য দ্বারা মহব্বতের ফল

এ কথাকেই হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, প্রথমেই যখন আনুগত্যের জন্য কিছু কুরবানী পেশ করবে, কিছুটা আগে বাড়বে এবং নিজেই খাহেশাতকে বরবাদ করার কোশেশ করবে, তখন আল্লাহ পাকের ফযল ও করমে তিনি তাঁর মহব্বত দান করবেন। এই তাঁর ওয়াদা। এরপরও মহব্বত পয়দা না হওয়া অসম্ভব। যখন একবার মহব্বত পয়দা হয়ে যাবে, তখন পূর্বে যে কাজ কঠিন ও ভারী মনে হত এক্ষণে তা সহজ অনুমিত হবে। এর ফলে অতিরিক্ত আনুগত্যের সুযোগ মিলবে। আর যখন অতিরিক্ত 'আনুগত্য' হবে, তখন 'মহব্বত' বাড়বে এবং শনৈ: শনৈ: বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর মহব্বতে যখন প্রবৃদ্ধি আসবে তখন এই সিলসিলা আমৃত্যু বজায় থাকবে। এমনকি মৃত্যুর সময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই এই পয়গাম আসবে–

يَٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِيْ عِبَادِيْ، وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

"হে সুস্থির প্রাণ! আজ তোমার পরওয়ারদেগারের দিকে এসো, যার মহব্বতে তুমি দিনাতিপাত করেছ। আজ এসে আমার বান্দা দলে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা ফাজর : ২৭–৩০)

এই পরিণতি উপরোক্ত পরম্পরার। অর্থাৎ, আনুগত্য দ্বারা মহব্বত এবং মহব্বত দ্বারা আনুগত্য। পরে আনুগত্য দ্বারা মহব্বত, আবার মহব্বত দ্বারা আনুগত্য। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক এই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

আনুগত্যের সহজ পন্থা : ইত্তেবায়ে রাসূল

এই আনুগত্য অর্জনের সহজ অথচ সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থাপত্র যা আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে মহব্বত পয়দা করা সম্পর্কে বলেছেন, তা হচ্ছে এই যে–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"আল্লাহ তাআলা হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনি আপনার উম্মতকে বলুন, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করো, এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত করতে চাও তো এর সহজ রাস্তা এই যে, তোমরা আমার অনুসরণ কর অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করো। এর পরিণতিতে আল্লাহ পাক তোমাদের মহব্বত করবেন।

হুযূর সা.-এর অনুসরণ করো, আল্লাহ তাআলা মহব্বত করবেন

বাহ্যত: এটি বলা দরকার ছিল যে, তোমরা যদি আল্লাহর সাথে মহব্বত করতে চাও তো এর সহজ রাস্তা এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কর। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে তখন আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দা হয়ে যাবে এবং তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করতে শুরু করবে— কিন্তু এভাবে বলেননি। বরং বলেছেন, যদি আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত করার ইচ্ছা থাকে তখন আমার আনুগত্য কর। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মহব্বত করবেন– এভাবে কেন বললেন? প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, 'আরে তোমরা আল্লাহর সাথে মহব্বত করতে চাও? আল্লাহ কোথায় আর তোমরা কোথায়? কেননা, তোমাদের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ, তোমাদের সত্ত্বা অপূর্ণ, তোমাদের সত্ত্বা সীমাবদ্ধ। ওদিকে আল্লাহর সত্ত্বা অবিনশ্বর ও অসীম। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত কীভাবে অর্জন করবে? অবশ্য তোমরা যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কর তো আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মহব্বত করবেন। পরে এই মহব্বতের প্রতিবিম্ব তোমাদের হৃদয়ে পড়বে। এই প্রতিবিম্বের নামই আল্লাহ তাআলার মহব্বত।

মহব্বত সর্বপ্রথম প্রেমাস্পদের হৃদয়ে পয়দা হয়

জনৈক ফারসী কবি একথাকে একটি কবিতার মাঝে উল্লেখ করেছেন–

عشق اول در دل معشوق پیدا می شود

অর্থাৎ, প্রথমে প্রেমাস্পদের হৃদয়ে মহব্বত পয়দা হয়। পরে প্রেমাস্পদের প্রেম প্রেমিকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। এভাবে মহব্বত প্রেমিকের অন্তরে স্থানান্তরিত হয়। এ অবস্থাই আল্লাহর মহব্বতের। কেননা যে সত্ত্বাকে দেখা যায় না, পরিপূর্ণ পরিচিতি যার অর্জন করা যায় না; ওই সত্ত্বার সাথে মানুষ মহব্বত করবে কী করে? আল্লাহ পাকের সত্ত্বা আমাদের কল্পনা ও ভাবনার বহু উর্ধ্বে। এজন্য আল্লাহ পাক বলেন, প্রথমে আমি তোমাদেরকে মহব্বত করব, যখন আমি মহব্বত করব তখন আমার মহব্বতের প্রতিবিম্ব তোমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হবে এবং এরপরই তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করবে।

প্রতিটি কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ

মোটকথা, কুরআনুল কারীম এই বাস্তবতা বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার মহব্বত হাসিল করার উত্তম ও সহজতর পন্থা হলো 'সুন্নাতের অনুসরণ'। প্রতিটি কাজে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। আপনার চাল-চলনে, ওঠা-বসায়, কথা-বার্তায়, সীরাত-সুরতে, কর্মকাণ্ডে, খানা-পিনায়, মোয়ামালায়, আচার-আচরণে, পরস্পরের সাথে মেলামেশায় ও চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করবে। যতই সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে ততই আল্লাহ তাআলার মহব্বত বাড়তে থাকবে।

কোন সুন্নাতই ছোট নয়

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, যখনই কোনো বান্দা কোনো ব্যাপারে সুন্নাতের প্রতি আমল করে, চাই সেই সুন্নাত দেখতে যতই ছোট হোক না কেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সুন্নাতই ছোট নয় প্রতিটি সুন্নাতই বিশাল বড়– ঐ বান্দা তখন আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। যেমন: মসজিদে প্রবেশ করতে তোমরা ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে এই ভেবে যে, এটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। মসজিদে প্রবেশ করতে গিয়ে এই দু'আও পড়া সুন্নাত যে–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

যদিও আমলটি ছোট। কিন্তু সুন্নাতের অনুসরণের বেলায় আপনি যখন আমলটি করবেন, তখন আপনি আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হবেন।

ঐ সময় তুমি আল্লাহর প্রিয় হয়েছ

কিংবা যেমন আপনি বাথরুমে প্রবেশ করছেন, বাঁ পা দিয়ে এই নিয়তে প্রবেশ করছেন যে, এটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং প্রবেশের পূর্বে আপনি নির্ধারিত দুআটি পড়ে নিলেন, তখন আপনি আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র হয়ে যাবেন। বাথরুম থেকে বের হবার প্রাক্কালে যখন আপনি বাঁ পা-টি এই নিয়তে বের করবেন যে, এটি হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং বাইরে বেরিয়ে আপনি মাসনুন দুআটি পড়বেন, তখন আপনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবেন। কেননা আপনি প্রেমাস্পদের সুন্নাতের উপর আমল করেছেন। সুতরাং যতটা আপনি 'ইত্তেবায়ে সুন্নাত'-এর ওপর চলবেন, আল্লাহ পাকের মহব্বত ততটা বেড়ে চলবে এবং এর পরিণতিতে দ্বীনের প্রতি আমল করা আপনার জন্য অতিরিক্ত সহজ হয়ে যাবে।

ঐ সুন্নাত যাতে কোন কষ্ট নেই

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনেক। জীবনের পরতে পরতে তা ছড়ানো-ছিটানো। কিন্তু কিছু কিছু সুন্নাত এমনও আছে, যা অবলম্বন করতে কোনও অর্থ ব্যয় হয় না। সময় ব্যয় হয় না। কষ্ট-মেহনতও করতে হয় না। এটি শুধু ধ্যান-খেয়ালের বিষয়। যেমন নাকি এইমাত্র বললাম, ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা, বাম পা দিয়ে বের হওয়া। বলুন, এটুকু আমল করতে কী এমন কষ্ট হয়? কতটা সময় ব্যয় হয়? কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়? মেহনতইবা লাগে কতখানি? আরে ভাই! পা তো বের করতেই হবে– এখানে শুধু একটু খেয়াল করার বিষয়। খেয়াল না করার কারণে সুন্নাতের রহমত ও বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাই। কেউ যদি প্রশ্ন করে, ডান পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া কি গোনাহ? জবাবে বলা হবে, গোনাহ নয়। তবে কী বাম পা দিয়ে বের হওয়া ফরয বা ওয়াজিব? না, তাও না। ফরয-ওয়াজিব কোনটাই না। তবে এর উপর আমল না করার কারণে একটি বড় রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া নয় কি? এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের পরিণতিতে যে রহমত নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাআলার যে মহব্বত অর্জন হয়– ক্ষুদ্র এ আমলটি না করার কারণে ঐ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এমনিভাবে ডান হাত দ্বারা খানা খাওয়া সুন্নাত। বিসমিল্লাহ বলে খানা খাওয়া সুন্নাত। খানার স্বাদ নেওয়ার সময় শোকর আদায় কর। দুআ পড়। এমনটি করা কি ফরয ও ওয়াজিব? না। এমনটি না করা কি গোনাহ? না, গোনাহ নয়। এমনটি না করলে

সূচিপত্র

আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন না। তবে না করার পরিণতিতে ইনসান নিজেকে এক বিশাল নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করবে, যে নিয়ামত মুফতে হাসিল হতে পারত।

সুন্নাতের ডায়েরী

সুতরাং সব মানুষই জীবনের অল্প-স্বল্প জরিপ করবে। দেখবে, আমি কোথায় কোথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের হযরতের কিতাব, 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তোমাদের জন্য আমি সুন্নাতের ডায়েরী বানিয়ে দিয়েছি। এই কিতাবকে সামনে রেখে জরিপ করতে থাকো, কোথায় কোথায় আমি সুন্নাতের প্রতি আমল করি। কোথায় কোথায় ছেড়ে দিই। সুতরাং যেখানে আমল ছেড়ে দিয়েছি সেখান থেকে আমল শুরু করে দিই। বেশুমার সুন্নাত এমন রয়েছে, যা কেবল আপনার সামান্য ধ্যান-খেয়ালের প্রত্যাশী। এতে কোন মেহনত, কষ্ট, পয়সা বা সময় ব্যয় হয় না। আর কিছু সুন্নাত এমন আছে যে, যা সময় ও মেহনতের দাবিদার। সামান্য মেহনত করলে ওগুলোও আদায় করা সহজ হয়ে যাবে।

যতক্ষণ বাজারে লাউ পাবে অবশ্যই কিনবে

আমাদের হযরত বলতেন, হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমি আমার বাড়ীতে দেখতাম যে, দস্তরখানে লাউয়ের তরকারী থাকত। বেশ কিছুদিন ধরে এ ধারা চলছিল। বিবি সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লাগাতর লাউয়ের তরকারী পাকাচ্ছ যে? তিনি জবাবে বললেন, আমি একটি কিতাবে পড়েছি লাউ হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওাসাল্লামের খুব পসন্দ ছিল। এজন্য বাজার ব্যবস্থাপককে বলেছি, যতদিন বাজারে লাউ পাওয়া যাবে কিনবে। যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য ইত্তিবা নসিব হয়। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, বিবি সাহেবার এই কথা শুনে আমার শরীরটা কেঁপে ওঠল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাতটি যা না ফরয, আর না ওয়াজিব, বরং এটি তাঁর একটি অভ্যাস মাত্র। এই মহিলার সুন্নাতের প্রতি এতটা গুরুত্ব! আর আমাদেরকে আলেম বলা হয়, লোকেরা আমাদেরকে আলেম জানে অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের এতটা গুরুত্ব নেই।

তিন দিন পর্যন্ত সুন্নাতের জরিপ

এরপর থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, যতক্ষণ আমি গোটা জীবনের জরিপ করে না দেখবো যে, কোথায় কোথায় আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের প্রতি আমল করছি না, ততক্ষণ আগে বাড়ব না। সুতরাং জীবনের জরিপ করতে তিন দিন লাগালাম। দেখলাম, কোথায় কোথায় সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত। পরে আল্লাহ্ পাকের ফযল ও করমে আমল এর পথ স্পষ্ট হয়ে গেল এবং যে সকল সুন্নাত ছুটে গিয়েছিল আল্লাহ্ সেগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করেন। মোটকথা, এই ইত্তেবায়ে সুন্নাত এমন একটি জিনিস, আপনি যতটা এর দিকে আগাবেন আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত ততটা বদ্ধমূল হবে।

এ অপবাদ গলার হার বানাও

বিভিন্ন সময়ে মানুষেরা যখন সুন্নাতের প্রতি কদম বাড়ায় তখন তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়, তিরস্কার করা হয়। অনেক সময় এদের নিয়ে হাসি-তামাশাও করা হয়। এই ধরনের ভর্ৎসনার দরুণ অনেকে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। অথচ কুরআনুল কারীম এদের প্রশংসা করছে এইভাবে–

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (المائدة : ٥٤)

অর্থাৎ, এরা আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করে, কোনও নিন্দুকের নিন্দাবাদে ভয় পায় না। দুনিয়াবাসী যা চায় বলতে পারে। চাইলে ওরা আমাদের পশ্চাদপদ বলবে, চাইলে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলবে। না হয় অজ্ঞ মুসলমান বলবে। আরে এই কিসিমের ভর্ৎসনা আল্লাহ্ পাকের পথিকদের গলার হার। এই ভর্ৎসনা নবীদেরকেও করা হয়েছে। তাদেরকে 'বেকুফ' বলা হয়েছে। নবীদের অনুসারীদের বলা হয়েছে–

أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ (البقرة : ١٣)

আমরা তেমন ঈমান আনব যেমন এই বেকুফরা ঈমান এনেছে? এই ভর্ৎসনা নবীরাও পেয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের ভাগ্যেও জুটেছে। তাঁদের 'পাগল' বলা হয়েছে, 'দিকভ্রান্ত' বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন আল্লাহর রাস্তায় এই শ্রেণীর ভর্ৎসনা এসেই যায়, তখন একে 'পদকপ্রাপ্তি' ও 'সম্মাননা' মনে করতে হবে। দুনিয়াদারদের মুখ কতক্ষণ আটকিয়ে রাখবে? কতক্ষণ তাদের পরওয়া করবে?

কিয়ামতের দিনে ঈমানদাররা কাফেরদের লক্ষ্য করে হাসবেন

সুতরাং যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে চলবে তখন ভর্ৎসনা থেকে উদাসীন থাকো। কোমর বেধে তৈরি হও। ভাবো, এই যে

সূচিপত্র

ভর্ৎসনা ও টিপ্পনি আমরা পাচ্ছি এটা আল্লাহর রাস্তার একটি সম্মাননা। কিন্তু কুরআনের বক্তব্য এক্ষেত্রে–

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ

"আজ সময় এসেছে ঈমানদারদের ওই কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে হাসার। আসবে সে সময়। কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং দুনিয়াদারদের ভর্ৎসনায় ভেঙ্গে পড় না। যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে চাও।

جس کو ہو جان و دل عزیز – اسکی گلی میں جائے کیوں

যার কাছে নিজের দিল ও মন প্রিয় সে তাঁর গলিতে যাবে কেন?

এ রাস্তায় চলতে গেলে টিকা-টিপ্পনী শুনতে হবে। আল্লাহ তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আটাশিতম মজলিস

আল্লাহর কাছে আল্লাহর মহব্বত কামনা করুন

আল্লাহর কাছে আল্লাহর মহব্বত কামনা করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

মহব্বত অর্জন করার পঞ্চম তরীকা

বিগত ক'দিন ধরে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত ও এর উপকরণ নিয়ে আলোচনা চলছিল। একটি বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) মহব্বত হাসিল করার পাঁচটি উপকরণ বর্ণনা করেছিলেন। এর চারটির বর্ণনা আল্লাহর রহমতে শেষ হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এক্ষণে পঞ্চম উপকরণটি বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলার কাছে দু'আ করা। এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. যেটি গতকাল বলেছি যে, আল্লাহর কাছে কিছু না কিছু চাইতে থাকো। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে মনে মনে চাও। দুই. 'মহব্বতও তাঁর কাছে চাও।' বলো, হে আল্লাহ! আমরা আপনার যে মহব্বতের মুখাপেক্ষী। আপনিই আপনার মহব্বত আমাদেরকে দান করুন। সুতরাং হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِىْ حُبُّهٗ عِنْدَكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনারই মহব্বতকামী। আমার অন্তরে আপনার মহব্বত পয়দা করে দিন। যার মহব্বত আপনার নিকট আমাকে উপকার পৌঁছায়– তার মহব্বত দান করুন।

অপর একটি দুআয় তিনি বলেন–

اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ

'হে আল্লাহ! আপনার মহব্বত আমাকে দুনিয়ার সকল নিয়ামতের চেয়ে প্রিয় বানিয়ে দিন।'

আল্লাহর মহব্বত এই তিন জিনিসের চেয়ে অধিক

অপর একটি দুআয় তিনি ইরশাদ করেন-

اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَرْدِ

'হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতকে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় করে দিন। আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে প্রিয় করে দিন। ঠাণ্ডা পানির চেয়ে প্রিয় করে দিন। এর দ্বারা ঠাণ্ডা পানির প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহ ও শখের দিকটাও ফুটে ওঠে।

ঠাণ্ডা পানি খুবই প্রিয় ছিল

ঠাণ্ডা পানির প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতটাই আগ্রহ ছিল যে, 'বীরে গরস'-যা মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে ছিল- সেখান থেকে তাঁর জন্য পানি আনা হত। হাদীসে এমন কোন জিনিসের কথা উল্লেখ হয়নি যে, অমুক খাবারের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকর্ষণ ছিল এবং খাদ্য অন্য স্থান থেকে আনা হত। শুধুমাত্র পানির ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, 'বীরে গরস' থেকে তাঁর জন্য পানি আনা হত। এজন্য যে, ঐ কূপের পানি অন্য কূপের পানির তুলনায় ঠাণ্ডা ছিল। পানি খুব মিষ্টিও ছিল। সুতরাং তিনি মৃত্যুর আগে অসীয়তও করে যান যে, আমাকে যেন এই কূপের পানির দ্বারা গোসল দেওয়া হয়। ঐ কূপের পানির দ্বারাই তাঁকে গোসল দেওয়া হয়েছিল। ঠাণ্ডা পানি তার নিকট এত পছন্দনীয় ছিলো যে, তিনি দুআর মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনার সত্ত্বাকে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় করে দিন। আমার পরিবার- পরিজনের চেয়েও প্রিয় করে দিন। ঠাণ্ডা পানির চেয়েও প্রিয় করে দিন। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে মহব্বত কামনা করুন। সকল মহব্বত অপেক্ষা যে মহব্বত উত্তম সেটাই।

ঝুলি ও পেয়ালা তার কাছেই চান

আব্বা হযরত এই ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একদা হযরত থানভী (রহ.)-এর দরবারে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হচ্ছিল যে, সকল কিছুই আল্লাহর কাছে চাও।

সূচিপত্র

কেননা তাঁর ভাণ্ডারে দেওয়ার ঘাটতি নেই। একথাই কোন কবির চরণে ফুটে উঠেছে এভাবে–

کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج
ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

হযরত বলেন, চাওয়ায় ঘাটতি থেকে যায় নয়ত মানুষ যদি চায় তাহলে আল্লাহর দেওয়ায় কোনও কমতি নেই। ব্যাস! আল্লাহর সামনে ঝুলি পাত। আল্লাহ পাক ঝুলি ভরে ফেরত দিবেন। হযরত মাজযূব ছাহেব (রহ.) প্রশ্ন করেন, হযরত! কারো কাছে যদি ঝুলিই না থাকে সে কী পাতবে? হযরত বলেন, ঝুলিও তাঁর কাছে চাও। বলো, হে আল্লাহ! আমার ঝুলিও নেই। তোমার রহমত দ্বারা আমাকে একটি ঝুলি দাও। আমার ভেতরে চাওয়ার পদ্ধতি নেই। চাওয়ার পদ্ধতিও দান কর।

চাওয়ার পদ্ধতিও তাঁর কাছে কামনা কর

সুতরাং এক দুআয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে চান যে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَسْئَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ الْإِجَابَةِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তমভাবে চাওয়ার পদ্ধতি কামনা করছি। অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে উত্তমভাবে চাইব। ভাল কথা কামনা করব। হে আল্লাহ! আপনার কাছে চাচ্ছি, আমাকে ভাল দুআ করার তাওফীক দান করুন, যাতে তা ভালভাবে কবুল হয়। সুতরাং ঝুলিও তাঁর কাছে চাও।

ভাল দুআর শক্তি তাঁর কাছেই কামনা কর

আপনি যখন কবুলের সময় বা দুআ কবুলের স্থানে যাবেন, যাতে দুআ কবুলের আশা করা হয়। যেমন ইফতারের সময়, সাহরীর সময়, তাহাজ্জুদের সময়, জুমুআর দিন, বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি পয়লা নজরের সময় কিংবা তাওয়াফ করার সময়। এই সকল স্থানে দুআ করার পূর্বে এভাবে চান, হে আল্লাহ! আমাকে ভাল দুআর তাওফীক দিন। অর্থাৎ, এমন দুআ করব, যা আমার দ্বীন-দুনিয়ার জন্য উপকারী হয়। হে আল্লাহ! দুআটি আমার অনুকূলে কবুল করে নিন। সুতরাং দুআ কবুলের স্থানে দুআ করার তাওফীকও তাঁর কাছে চান।

বায়তুল্লাহর প্রতি পয়লা নজরের দুআ

মানুষ প্রথমবার যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দেখবে, এটি দুআ কবুলের একটি সময়, তখন তার বুঝে আসে না যে, এ সময় কী দুআ করতে হবে? আল্লাহর বান্দাদের এ সময় বিস্ময়কর সুখানুভূতি জাগে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, এই সময় কি দুআ পড়ব? ইমাম সাহেব বললেন, মিঞা! এ দুআ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে 'মুসতাজাবুত দাওয়াত' বানিয়ে দাও যে, সারা জীবনের সব দু'আই যেন কবুল হয়। আল্লাহ তাআলা ইমাম সাহেবের মনে এই দুআ ঢেলে দিয়েছিলেন। মোটকথা, চাওয়াও একটি বিদ্যা; একটি বিষয়। যা সকলকে দিয়ে হয় না। আমার যখন হারামাইন (মক্কা-মদীনা) যাওয়া হয়েছিল এবং বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি নজর পড়েছিল, তখন আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ! আমার বুঝে আসছে না, হে আল্লাহ! আপনার সমীপে যে দুআ আমার পক্ষে উত্তম তা আমার হৃদয়ে ঢেলে দিন এবং সেভাবে দুআ করার তাওফীক দিন। এ দিকটিই হযরতের কথায় ফুটে উঠেছে যে, ঝুলিও তাঁর কাছে চাও। এভাবে মহব্বত তাঁর কাছে কামনা কর যে, হে আল্লাহ! তোমার মহব্বত আমার অন্তরে পয়দা করে দাও এবং এই মহব্বতকে সকল মহব্বতের ওপর বিজয়ী কর।

মহব্বতের উপকরণের খোলাসা

মোটকথা, হযরত থানভী (রহ.) মহব্বতের মোট ছয়টি উপকরণ বলেছেন।

১. অধিকহারে যিকির।

২. আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ।

৩. নিজের কর্মকাণ্ড আচরণ ও বাস্তবতাকে চিন্তা করা।

৪. কোন আহলুল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

৫. ইবাদতের ধারাবাহিকতা।

৬. আল্লাহর কাছে দুআ।

এ ছয়টি জিনিস দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয় এবং তাঁর মহব্বত অন্তরে পরিপক্ক হয়। আল্লাহ তাঁর ফযল ও করমে এসব কথার ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

মহব্বতের কোন বিশেষ স্তর তলব করো না

এরপর হযরত থানভী (রহ.) সংস্কারধর্মী (মুজাদ্দিদানা) কথা বলেন,

> এই তদবীরগুলোয় কোনও ভুল নেই, শুধুমাত্র জ্ঞানগত একটি সংশয় আছে, যা সতর্ককরণযোগ্য। তা এই যে, নিজের

বিবেক মত মহব্বতের কোন স্তর নির্ধারণ করে অপেক্ষমান থাকা– এটি অবশ্য ভুল। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৪)

অর্থাৎ, মহব্বত পয়দা করার বিষয়ে যেসব কথা এবং যে সব উপকরণ বলা হয়েছে এতে কোন ভুল নেই। এগুলো ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণপুষ্ট। ইনশাআল্লাহ, এর দ্বারাই মহব্বত পয়দা হবে। কিন্তু ভুল এভাবে হয় যে, মহব্বতের বিশেষ কোন স্তর ঠিক করে মানুষ অপেক্ষমান থাকে যে, আমার মহব্বতের ঐ স্তর হাসিল হওয়া চাই। যেমন মনে মনে এই পরিকল্পনা এঁকে বসা যে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) যে স্তরের মহব্বত হাসিল করেছিলেন, তা আমার হাসিল হয়ে যায় এবং শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) যে মহব্বত অর্জন করেছিলেন– তা আমার অর্জন হয়ে যায়। মোটকথা মহব্বতের কোন একটি স্তর নির্ধারণ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যে, আমারও যেন মহব্বতের এই স্তর অর্জিত হয়ে যায়। ফলে এই লোক হয় আল্লাহ পাকের নাশোকরী করবে, কিংবা মহব্বত পয়দা করার উপকরণসমূহের প্রতি সন্দিহান হবে। সবশেষে হতাশার শিকার হয়ে বসবে।

পাত্র মোতাবেক মহব্বত দেওয়া হয়

এজন্য কোন্ স্তরের 'মহব্বত' আপনি অর্জন করবেন? সে ফয়সালা করার অধিকার আপনার নেই। যে স্তরের মহব্বত আপনাকে দেওয়া হয় ওটিই আপনার জন্য যথোপযুক্ত ও উপকারী।

وہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

পাত্র হিসেবে বস্তু দেওয়া হয়। আপনার গ্রহণের পাত্র যেমন ওই শ্রেণীর মহব্বত পাবেন আপনি। কিন্তু মহব্বতের বিশেষ কোন স্তর তালাশ করে এই বলবেন যে, এই শ্রেণীর মহব্বত আমার পাওয়া উচিত। এই ধরণের তলব করার কোনও অধিকার নেই আপনার। অবশ্য মহব্বতের যে স্তর পাবেন আপনি নিশ্চিতভাবেই তা আপনার জন্য যথেষ্ট। তবে শর্ত হলো এসব তদবীরের ওপর আমল করতে হবে।

অকৃতজ্ঞতা ও হতাশার শিকার হয়ে পড়বেন

হতে পারে একদিকে আমরা বুযুর্গদের বাতানো একটি উপকরণের ওপর আমল শুরু করে দিলাম অন্য দিকে কোন একটি উঁচু স্তর সাব্যস্ত করে নিলাম যে, এটি আমার মাকাম। এই উচ্চ মাকামে আমাকে পৌঁছতে হবে। ঐ উপকরণসমূহের উপর আমল শুরু করার পরে দেখা যাবে ঐ মাকাম দূরে বহু

দূরে। এর দ্বারা ফল এই দাঁড়াবে যে, এ যাবত যা কিছু হাসিল হয়েছে এর অবমূল্যায়ন ও অকৃতজ্ঞতা শুরু হয়ে যাবে। কেননা উদ্দিষ্ট মাকাম এখনও অর্জিত হয়নি। এজন্য হতাশার শিকার হতে থাকবে এবং এই কারণেই এক সময় উপকরণসমূহের ওপর আমল করা ছেড়ে দিবে। এক সময় আমলই ছেড়ে দিবে। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) নিজের পক্ষ থেকে কোন স্তর নির্ধারণ করো না। উপকরণ শুদ্ধ হলে ইনশাআল্লাহ ফল অবশ্যই বেরুবে। চাই তুমি যেটি নির্ধারণ করেছিলে ওই স্তরের ফল না হোক। অবশ্য তোমার জন্য যতটুকু ফলদায়ক অতি অবশ্যই তা অর্জিত হবে। কোন কবি কতইনা চমৎকার বলেছেন–

بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

যখন এই রাস্তায় এসে গেছেন তখন ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবেনই। সুতরাং এদিক ওদিক দেখার দরকার নেই। যা কিছু আপনি পেয়েছেন এর ওপর শোকর আদায় করুন এবং তদবীরে লেগে যান। এটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট।

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) একটি বিস্ময়কর কবিতা রচনা করেছেন। অন্য কেউ এই কবিতার গভীরে পৌঁছতে পারেনি। তিনি বলেন–

مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی مئے
میرے پیمانے میں لیکن حاصل میخانہ مئے

অর্থাৎ, আমার এটার কী দরকার যে, অন্যরা কী পেয়েছে আর কী পায়নি। আমার জন্য আল্লাহ তাআলা যা দান করেছেন তারই যোগ্য ছিলাম আমি। আর অর্জনও করেছি আমি তাই। সুতরাং নিজের জন্য কোন স্তর সাব্যস্ত করা, পরে অপ্রাপ্তির দরুন অভিযোগ ঠোকা, নিরাশ হওয়া– সবই ভুল। তদবীর ও উপকরণ বিশুদ্ধ হলে ইনশাআল্লাহ ফলও সুনিশ্চিত প্রকাশ পাবে।

একটি চিঠি ও হযরতের জবাব

একবার আমি হযরতকে চিঠি লিখলাম যে, অমুক অমুক কাজ আমার দ্বারা হয় না। যে লোকের দ্বারা এতটুকু কাজ করা হয় না সে দুনিয়াতে আর কী কাজ করবে? হযরত আমার শেষের লাইনটির নিচে রেখা টেনে এর সামনে এই জবাব লিখলেন–

সূচিপত্র

'কী ব্যাপার নিজের সত্ত্বা নিয়ে অতি উচ্চাঙ্গ বিষয়ের আশা রাখছ যে? অর্থাৎ, তোমার এই যে কথা, আমার দ্বারা কোন কাজ হয় না। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, তুমি নিজের প্রতি উচ্চাশা পোষণ কর। ভেবেছ, আমি খুব উঁচু স্তরের মানুষ। কাজেই আমার দ্বারা এমন এমন কাজ হতে হবে। ঐ সব যেহেতু হচ্ছে না সেহেতু হতাশ হচ্ছো।

সত্যি বলতে কী এই জবাব দ্বারা তিনি সতর্ক করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে মনে এই ধরণের খেয়াল পয়দা হওয়া অহংকারের আলামত। অর্থাৎ, নিজের জন্য মহোত্তম বিষয় সাব্যস্ত করে রাখা হয়েছে। ভাবা হয়েছে, আমার দ্বারা এই কাজ হওয়া চাই। কিন্তু সে কাজ হচ্ছে না। সেই কাজ যখন হচ্ছে না, তখন হতাশ হয়ে পড়েছো। সুতরাং এই ধরণের কামনা বাস্তবিকপক্ষে অহংকারই।

মোটকথা!

মোদ্দাকথা এই যে, মহব্বত অর্জনের যে মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, এর ওপর আমল কর এবং নিজের জন্য 'মহব্বতের' কোনও স্তর সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাক যে, আমাকে মহব্বতের অমুক স্তরে পৌছতে হবে। এই তদবীরের পরিণতিতে 'মহব্বত' এর যে স্তর তুমি পাবে এটিই তোমার জন্য উত্তম প্রাপ্তি। তুমি এরই যোগ্য। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উননব্বইতম মজলিস

ইবাদতে আবেগ-উদ্দীপনা উদ্দেশ্য নয়

ইবাদতে আবেগ-উদ্দীপনা উদ্দেশ্য নয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

'মহব্বত'-এ অস্থির থাকি

এক লোক হযরত থানভী (রহ.)কে পত্র লিখল যে, 'আমার বড্ড শখ জাগছে যে, যে কোন উপায়ে হোক আল্লাহ তাআলার মহব্বতে অস্থির থাকব।'

এই পত্রের জবাবে হযরত থানভী (রহ.) লিখলেন–

> 'কিন্তু এর পাশাপাশি এই দু'আও করো যে, এই অস্থিরতার মাঝেও যেন আমি শান্তিতে থাকতে পারি।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৪)

জবাব অন্য কিছু হওয়া দরকার ছিল

এই জবাবটি যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আপনার কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে। যারা হযরত হাকীমুল উম্মতের মাওয়ায়েয ও বাণীসমূহ পড়েছেন এবং যারা হযরতের মেযাজ-প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য অবগত– তাদের ধারণা হবে যে, হযরত অবশ্যই জবাব দেবেন যে, তোমার মাঝে এই অস্থিরতার শখ কেন পয়দা হয়েছে? অস্থিরতা সে তো নিজের ক্ষমতা বহির্ভূত অবস্থার নাম। সেটি হাসিল হোক বা না হোক, এর পেছনে পড়ছ কেন? কেননা হযরতের শিক্ষার একটি বড় মূলনীতি এই যে, ইচ্ছাধীন আমলের প্রতি গুরুত্ব দাও এবং ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়ের চিন্তা-ভাবনা ছাড়। ভারী সুন্দর এই সোনালী উসূল। কেননা ক্ষমতা

বহির্ভূত অবস্থায় কোন কোন সময় ইবাদতের শখ পয়দা হতেই পারে। আবার কখনও এটি নাও থাকতে পারে। কখনও ইবাদতে দিল জমে যেতে পারে আবার কখনও নাও জমতে পারে। এই হালত আসা-যাওয়া করে। এর পেছনে পড়ার দরকার নেই। প্রকৃত উদ্দেশ্য আমল। এটিই হযরত থানভী (রহ.)-এর তালিমের সার-নির্যাস। এজন্য যারা বিশেষ অবস্থার পেছনে দৌড়ায় হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) সাধারণত: তাদের নিরুৎসাহিত করেন।

প্রত্যেক রোগীর জন্য পৃথক ব্যবস্থাপত্র

মোটকথা, হযরতের উত্তর না পড়লে মন এদিকে যাবেই যে, হযরত এক্ষেত্রে হয়ত উত্তরে বলবেন, এটি শরীয়তসম্মত কোন নির্দেশিত বিষয় নয় যে, মানুষ অস্থির হবে। কিন্তু তিনি এখানে এই শ্রেণীর জবাব দেননি। সত্যি বলতে কী, ডাক্তারদের কাজ হলো, রোগীর অবস্থা অনুপাতে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। এই নয় যে, একই ব্যবস্থাপত্র সব রোগীদের বেলায়ই প্রয়োগ করা। এজন্য রোগীর রোগের ধরণ বুঝে দাওয়াই দেয়া হয়। এমনই একজন মুর্শিদে কামেলের কাজ হলো যে, তিনি দেখবেন, মুরীদের বর্তমান অবস্থায় এ পথ্যটি তার জন্য প্রযোজ্য কি-না? এই যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা মুর্শিদে কামেলকে দিয়ে থাকেন। আমরা যদি মুর্শিদে কামেলের কাছে যাই তাহলে তিনি আমাদেরকে এই ব্যবস্থাপত্র দিবেন।

'অন্তরের অনুভূতি' আল্লাহর মেহমান

এখানে হযরত থানভী (রহ.) পত্রের জবাবে লিখেননি যে, তোমার মাঝে এই শখ জাগল কেন? কীইবা এর প্রয়োজন ছিল? কেন তিনি এ জবাব লিখলেন না? এর কারণ সম্ভবত: এই যে– আল্লাহই সর্বজ্ঞ; হযরত বুঝতে পেরেছিলেন লোকটার হৃদয়ে যে শখ পয়দা হয়েছে, এটি ওই লোকের ব্যাপারে তার 'আল্লাহ প্রদত্ত অন্তরের অনুভূতি।' হযরত সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরে যা কিছু আরোপিত হয়, আরোপিত বিষয়াবলীর অবমূল্যায়ন করো না। কেননা এ বিষয়সমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মেহমান। সুতরাং এই মেহমানের আদর-যত্ন করলে সে বারংবার আসবে। পক্ষান্তরে যদি এই মেহমানের আদর-যত্ন না কর বরং তার অবমূল্যায়ন কর, তো এই মেহমান রুষ্ট হয়ে চলে যাবে। আর কোনদিনও সে আসবে না।

শরীয়তে প্রশান্তি কাম্য

যদি ঐ লোকের জবাবে এই লিখে দিতেন যে, তোমার এই অস্থিরতার চিন্তা দুরস্ত নয়। তাহলে এই অবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত অন্তরের অনুভূতির বিরোধিতা

হওয়ায় তার ক্ষতি হতে পারত। ভবিষ্যতে এই ধরণের 'অনুভূতি' আসা বন্ধ হয়ে যেত। পক্ষান্তরে জবাবে যদি তাকে উৎসাহ দেওয়া হয় যে, তোমার এই চিন্তা বড় ভাল কথা, আমরাও দুআ করি আল্লাহ তাআলা তোমার এই অবস্থা বজায় রাখুন। তাহলে সেটিও শরীয়তবিরোধী হত। এজন্য যে, শরীয়তে অস্থিরতা কাম্য নয়। শরীয়ত প্রশান্তি ও স্থিরতা অর্জন কাম্য। কুরআনুল কারীমে আছে–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ, আল্লাহরই যিকির দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জন হয়। সুতরাং শরীয়তের উদ্দেশ্য এই নয় যে, কোন লোক তাঁর ভেতরের অস্থিরতাকে মূখ্য বানাবে। বরং শরীয়তের দাবি হচ্ছে, মানুষ স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জন করবে। খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِىْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে রহমতের আশা করি। যদ্দারা আমার প্রশান্তি ও স্বস্তি আসে। আমার অস্থিরতাকে তুমি স্বস্তি দ্বারা বদলে দাও। বোঝা গেল, শরীয়তের উদ্দেশ্য, প্রশান্তি ও স্বস্তি। উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা ও অস্বস্তি কাম্য নয়।

বিস্ময়কর জবাব

মোটকথা, এই চিঠির জবাবে যদি প্রথম কথাটি লিখে দিতেন, তাহলে তরীকত বিরোধী কাজ হতো, আর যদি দ্বিতীয় কথাটি লিখে দিতেন তা হতো শরীয়তবিরোধী। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বিস্ময়কর জবাব দিয়েছেন যে, এর সাথে এই দুআও করো যে, 'ওই অস্থিরতার মাঝেও যেন স্বস্তি থাকে।' এজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে উদ্বিগ্নতা কাম্য নয়, বরং কাম্য হল, স্বস্তি ও প্রশান্তি। কিন্তু সেই 'স্বস্তি'ও আল্লাহ তাআলার 'মহব্বতের অস্থিরতা' এর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার মহব্বতে অস্থির হতে হবে। এই অস্থিরতা'র মাঝেই 'স্বস্তি' নিহিত।

ہم اضطراب سے حاصل "قرار" کرلیں گے
یہ "جبر" ہے تو اسے اختیار کرلیں گے

"এই অস্বস্তি মূখ্য নয়, কিন্তু এর ফলে কোনো কোনো সময় স্বস্তি লাভ হয়। যে লোক এ পথের পথিক নয়, তার পুরোপুরি এর অনুভূতি, উপলব্ধি ও বুঝ হয় না। অবশ্য একথা ঠিক যে, শুরুর দিকে ভাবাবেগে শখ উদ্দীপনা উপচে পড়ার দরুণ অস্থিরতা আসে। পরে এমন এক স্তর আসে যখন ওই অস্থিরতার মাঝে এক প্রকার স্বস্তি এসে পড়ে। এজন্য হয়ত হযরত এই উত্তর দিয়েছেন।

খেলাফত এত সস্তা নয়

এর দ্বারা আরেকটি জিনিস বোঝা গেল যে, অপরকে ইসলাহ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সামান্য কিছু পরিভাষা মুখস্ত করেই লোকদের ইসলাহ শুরু করে দিলাম।

ہزار نکتۂ باریک تر زمو ایں جاست
نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند

এটি বড় নাজুক কাজ। কেননা কারো জন্য কিছু ফয়সালা করলেই তার উপকার হবে এর নিশ্চয়তা কী? এজন্য হযরত থানভী (রহ.) এর সিলসিলায় এই 'খেলাফত' এত সস্তা নয়, যেমন নাকি অনেক মাশায়েখের এখানে রেওয়াজ আছে যে, দরবারে আসামাত্রই খেলাফত দিয়ে দেওয়া হয়। যেই আসছে খেলাফত পাচ্ছে। যাকেই দেখল যে, সে নামাযের পাবন্দী করছে, কিছু খুশু পয়দা হয়েছে এবং কিছু যিকির আযকার করছে, তাকেই খেলাফত দিয়ে দেওয়া হোল– এ যেন ছেলেখেলা। আমাদের হযরতের এখানে 'খলীফা' হওয়া এত সোজা ছিল না।

ডাক্তার হওয়ার জন্য সুস্থ হওয়া যথেষ্ট নয়

কেন ছিল না? এজন্য যে, নিজে সুস্থ হওয়া এক জিনিস আর অপরকে সুস্থ করা আরেক। প্রতিটি সুস্থ মানুষই ডাক্তার হয় না। সুস্থ ঐ মানুষকে বলা হয়– যার মাঝে কোন রোগ-বালাই নেই। কোন সমস্যা নেই। বড় তাগড়া। ঐ সুস্থ মানুষটিই কাউকে চিকিৎসা করবে, এমন কোন কথা নেই। এজন্য যে, ডাক্তার হবার জন্য অনেক ঘাটের পানি খেতে হয়। রুটি বেলার বেলুন দ্বারা রুটির মতো পিষ্ঠ হতে হয়। তবেই কেবল ডিস্‌পেনসারী খোলার অনুমতি পাওয়া যায়। এক্ষণে যদি কেউ একথা বলে যে, আমি বিলকুল সুস্থ, আমার দেওয়া সকল বটিকা বিশুদ্ধ, আমার দেহের সকল কাঠামো সচল। কাজেই আমি ডাক্তার হবার

যোগ্য। কিংবা কেউ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য এলো, ডাক্তার তার চিকিৎসা করল। যখন এই লোক শতভাগ সুস্থ হয়ে গেল তখন ডাক্তার তাকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিল 'তুমি এখন ডাক্তার'। কেননা তুমি এখন সুস্থ।

খেলাফত একটি সাক্ষী এবং সনদ

এখানেও এই অবস্থা যে, শায়খের কাছে কেউ ইসলাহের উদ্দেশ্যে এল। শায়খ তার ইসলাহ করে দিলেন। সে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের প্রতি ফিরে এল। তার নামায সঠিক হয়ে গেল, রোযা বিশুদ্ধ হলো– শুধুমাত্র এইসব আমলের দুরস্ত হওয়া দ্বারাও কেউ খেলাফতের যোগ্য হয়ে যায় না। খেলাফতের মর্ম হলো, অপরকে চিকিৎসার যোগ্য করে তোলা। চিকিৎসা করা– এটি সকলের জন্য সহজ নয়।

এজন্যে আমাদের বুযুর্গদের এখানে বহু দেখভাল ও তত্ত্ব-তালাশ করে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা শেষে খেলাফত দেওয়া হয়। কাজেই খেলাফতের মূল মর্ম হলো, খোদার সৃষ্ট জীবের সামনে এই সাক্ষ্য দেওয়া এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা যে, আমি তাকে খুব ভাল করে পরখ করেছি, ঝালিয়ে দেখেছি, এক্ষণে এ লোক তোমাদের রূহানী চিকিৎসার যোগ্য। 'খেলাফত' এই কথার সার্টিফিকেট নয় যে, এ লোক সুস্থ, সুন্নাতের অনুসারী। সুতরাং যতক্ষণ এই আস্থা না হচ্ছে যে, এ লোক অপরকে চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে, এ লোক ইসলাহকামী-দেরকে তাদের মেযাজ ও জরুরতমাফিক ব্যবস্থাপত্র পেশ করতে পারে– ততক্ষণ পর্যন্ত এমন সাক্ষ্য প্রদান জায়েয হবে না।

আমাদের মুরুব্বীগণ এই ঝুঁকি নিতেন না

বুযুর্গদের রং বিভিন্ন ধরণের হয়। কিছু বুযুর্গের রং ও মেযাজ এমন হয় যে, তারা ধারণা করেন, যখন আমরা কোন লোককে খেলাফত দেব, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে যোগ্য বানিয়ে দিবেনই। কিন্তু আমাদের মুরুব্বীগণ এ ধরণের ঝুঁকি নিতেন না। আমাদের হযরতগণ বলতেন, সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঝুঁকি নিই না। এজন্য যে, কেউ যদি এই উসূল স্মরণ করে নেয় যে, 'অমুক জিনিসটি প্রশংসিত আর অমুকটি নিন্দিত' তাহলে এই উসূল সে সব জায়গায় প্রয়োগ করবে। অথচ এতটুকু যথেষ্ট নয় বরং আগন্তুককে দেখতে হবে যে, তার মধ্যে কী যোগ্যতা আছে? আর কী নেই? সুতরাং অপরের ইসলাহ করা সহজ নয়।

খেলাফতের খেয়াল নিকৃষ্টতর পর্দা

হযরত এও বলেন যে, যখন শায়খের কাছে চিকিৎসার জন্য যাও, তখন চিকিৎসার প্রতি মনোনিবেশ কর। এই চিন্তায় থেকো না যে, অমুক স্তর আমার হাসিল হোক, অমুক মাকামে আমি উন্নীত হই বরং শায়খের হুকুম পালনে, তাঁর তত্ত্বাবধানে ও ফলাফলের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমল করে যেতে থাক। অনেকে শায়খের কাছে যখন নিজের ইসলাহর জন্য যায় তখন তার ধ্যান-খেয়াল এর মধ্যে থাকে যে, তিনি আমাকে এক সময় খেলাফত দেবেন। এই খেয়াল ইসলাহের পথে নিকৃষ্টতর বাধা। এই খেয়াল থাকলে কখনোই ইসলাহ হবে না। ইসলাহ সম্ভবও নয়। কেননা তার এই ইসলাহের মাঝে ইখলাস নেই। বরং নিয়তটি এমন যে, বিশেষ পদ অর্জন করবে। এক কথায় বলতে গেলে, খোদার দিকে চেয়ে শায়খের সাথে তাআল্লুক কায়েম করেনি। তার ইসলাহ সত্যান্বেষী হিসেবে নয়। আর যখন কোন ব্যাপারে সত্যান্বেষী না হয়, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাহের খাতায় নাম না লেখায়— এ ধরনের ব্যক্তির শায়খের কাছে যাওয়ার দ্বারা কোন ফায়দা নেই।

সুতরাং যখন কোন শায়খের কাছে যাবে, তখন এই খেয়াল মাথা থেকে ছেঁটে ফেলবে। কেবলমাত্র ইসলাহের নিয়তে যাবে। বিশেষ কোন পদ অর্জনের খেয়াল রাখা যাবে না। মাকাম অর্জনেরও চিন্তা করা যাবে না।

ইবাদতে আবেগ, উদ্দীপনা ও স্বাদ মুখ্য নয়

এরপর হযরত থানভী (রহ.) অন্য এক মালফূযে ইরশাদ করেন–

> "আবেগ মুখ্য নয়, কবুল হওয়ার শর্তও নয়। ইখলাসের সাথে আমল হওয়া জরুরী। ইবাদতে আবেগ না থাকলেও এমনকি সহজাত কষ্ট হলেও সমস্যা নেই। যেমন হাদীসের বাণী–
>
> إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ
>
> কষ্টের সময় উত্তমভাবে ওযু করা এর প্রকৃষ্ট দলীল। অতিরিক্ত এতটুকুও প্রমাণ হয় যে, এর ফলে প্রতিদান ও সওয়াব বেড়ে যায়। যৌক্তিক বাস্তবতা এর এই যে, ইবাদত কারো জন্য 'খাদ্য'-এর মত, আর কারো জন্য 'ঔষধ' এর মত। আর বাহ্যতঃ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ঔষধ ফলপ্রদ হওয়ার জন্য তার প্রতি আকর্ষণ জরুরী নয়। বরং এ অবস্থায় এর ব্যবহার

অধিক হিম্মত ও মুজাহাদা কারণ। আর এতে হেকমতও থাকে। যেমন আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্তি এবং নিজের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষকরণ। সুতরাং খাঁটি বান্দার মত-পথ এমনই হওয়া চাই। (আনফাসে ঈসা ১৯৫ পৃষ্ঠা)

আবেগ-উদ্দীপনা নন্দিত, ইখলাস কাম্য

উক্ত বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বিস্ময়কর উসূল বর্ণনা করেছেন। এতে বহু লোক বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তা এই যে, ইবাদতে আবেগ-উদ্দীপনা কাম্য নয়। মানুষের মাঝে এই চেতনার উদ্রেক হওয়া ভাল নয়। এগুলো আমল কবুল হওয়ার পূর্ব শর্তও নয়। কোথাও একথা বলা হয়নি যে, যখন তোমরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ইবাদত করবে তখন তোমাদের ইবাদত কবুল করা হবে– নতুবা নয়। আবেগ-উদ্দীপনার মর্ম হলো, নামাযের মধ্যে আপনার মজা আসা শুরু হয়েছে। এই শখের দরুণ আপনি জলদি নামায পড়তে যান। এই ধরণের শখ যদি পয়দা হয় তাহলে তা খোদাপ্রদত্ত নিয়ামত মনে করতে হবে। এটি ভাল ও নন্দিত বিষয়। তাই বলে এটি উদ্দেশ্য নয় এবং এটি আমল কবুল হওয়ার শর্তও নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা এ কথা বলবেন না যে, তুমি যে নামায পড়েছ তা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পড়োনি, অতএব তোমার নামায কবুল হবে না। নামাযের কবুলের জন্য বরং ইখলাস জরুরী। সুতরাং আমল যদি ইখলাসের সাথে হয়, সুন্নাত মোতাবেক হয়, এ দুটি যদি আমলের মাঝে পাওয়া যায় তাহলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে। ইনশাআল্লাহ, সেক্ষেত্রে আমল কবুল হবে। চাই সে আমল যত কষ্টবহুল হোক না কেন, মনে চেয়েছিল কিংবা নাইবা চেয়েছিল। অলসতা ছিল বা ছিল না। কিন্তু আপনি ভাবছেন যে, নামায ফরয, যা আমাকে পড়তে হবে। এটি ভেবে আপনি আগ্রহ ছাড়াই জোর জবরদস্তিমূলক নিজের ওপর সুন্নাত মোতাবেক নামায চাপিয়ে দিলেন– যেহেতু ইখলাস ও সুন্নাত মোতাবেক এই নামায ছিল এজন্য তা আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হবে। আল্লাহ একথা বলবেন না যে, যেহেতু তুমি অনীহা সহ শখহীন অবস্থায় নামায পড়েছ এজন্য তোমাকে সাজা পেতে হবে। এজন্য যে, এটি কোন মূখ্য বিষয় নয় কিংবা কবুল হওয়ার শর্তও নয়।

নামায আমার চক্ষু শীতলকারী

অবশ্য নামাযের মধ্যে আবেগ-উদ্দীপনা থাকা প্রশংসনীয়। এর দলিল হুযূর কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদীস যাতে তিনি বলেছেন–

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

'নামায আমার চক্ষু শীতলকারী।'

মর্ম হলো, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে মজা ও বিশেষ অবস্থা উপলব্ধি হত, যা দুনিয়ার অন্য কোনও জিনিসের মধ্যে অনুভূত হত না। এটি তিনি অর্জন করেননি (বরং খোদা তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন)। কিন্তু তিনি অপরকে একথা বলেননি যে, যতক্ষণ তোমাদের নামাযে বিশেষ ঐ অবস্থা সৃষ্টি না হবে যা আমার হয় ততক্ষণ তোমাদের নামায কবুল হবে না– বরং তিনি বলেছেন–

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

'তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো সেভাবেই নামায পড়।'

আবেগহীন আমলে সওয়াব বেশি

অনেক লোক এই চিন্তায় পড়ে আছে যে, নামাযে মজা আসে না। শখ-আগ্রহ পয়দা হয় না। ভাই! মজা তো উদ্দেশ্যই নয়? মূখ্য উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি। যদি সেটি হাসিল হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। বরং হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, কোনো কোনো সময় ঐ ব্যক্তির আমলের সওয়াব বেশী হয় যে ব্যক্তি মন না চাইলেও আমল করে, কষ্টবহুল সময়ে আমল করে, তার এই আমলে মজা একেবারেই আসে না। অন্যদিকে যার ইবাদতে মজা লাগে। তার সওয়াব ঐ ব্যক্তির চাইতে কম হয়, দলিল ওই হাদীস যাতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ..... فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ

অর্থাৎ, যে লোক ঐ সময় সুন্দর করে অযু করে, যে সময় অযু করা খুবই কষ্টকর ও পীড়াদায়ক, সে জিহাদের সওয়াব পাবে। যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, প্রবল শৈত্য প্রবাহ বইছে, বরফ পড়ছে, পানি খুবই ঠাণ্ডা, গরম পানির কোনই এন্তেজাম নেই, নামাযের সময় আসন্ন– এ সময় ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অযু করা খুবই কষ্ট। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহর হুকুম মাথা পেতে নিয়ে যে লোক অযু করবে তখন তার এই আমল জিহাদের রাতে ময়দানে পাহারা দেওয়ার মত। এক্ষণে বলুন, এই অযুতে কার কবে মজা আসে? বোঝা গেল, কষ্টবহুল সময়ে ইবাদত করলে কোনো কোনো সময় সওয়াব বেড়ে যায়– ওই আমলের চেয়েও যা

আবেগ-উদ্দীপনার সাথে করা হয়। কারণ, আবেগের সাথে করা আমলে কষ্ট-তকলীফের ব্যাপারটি থাকে না।

যার নামাযে মজা আসে না তাকে মুবারকবাদ

এজন্য হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলতেন, 'আমি ঐ লোককে মুবারকবাদ দেই, যে কিনা সারা জীবন নামায পড়েও মজা পায়নি; এরপরেও সে আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে নামায পড়ছে—' কারণ, নামাযের মধ্যে মজা আসা তো ভাল, কিন্তু এতে শঙ্কাও থাকছে। আর তা এভাবে যে, হতে পারে সে মজা পাবার অভিলাষে নামায পড়ছে কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়। যদ্দারা 'ইখলাস' হারানোর প্রবল সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কথা এই যে, নামাযের মধ্যে যখন অধিক মজা লাগতে থাকে, তখন নামাযীর মধ্যে আত্মম্ভরিতা পয়দা হতে থাকে। এ রকম খেয়াল হতে থাকে যে, আমি তো মাকামে পৌঁছে গেছি। এই আত্মগৌরবও তার মাঝে বাসা বাঁধে যে, এখন বুযুর্গীর উচ্চ মাকামে পৌঁছা সময়ের ব্যাপার মাত্র। গেছি আল্লাহওয়ালা হয়ে। ইবাদতটি আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে গেছে। মজার দরুণ মানুষের মাঝে এই খারাবি পয়দা হয়। পক্ষান্তরে যার নামাযে মজাই আসে না তার মনে এই খেয়াল আসবে কোত্থেকে? তার তো সর্বদা এই ভয় থাকে যে, আমার নামায না আবার আমার মুখেই ছুঁড়ে মারা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত লোকের নামায

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বড্ড প্রিয় একটি উপমা টানতেন। বলতেন, মানুষেরা 'ভাবাবেগ'কে 'আধ্যাত্মিকতা' ভেবে থাকে। অর্থাৎ ইবাদতে আবেগ-উদ্দীপনা ও মজা এসে থাকলে মনে করে, 'রূহানিয়াত' বা 'আধ্যাত্মিকতা' বেশ আছে। এই ধরনের ধারণা ভুল। বরং যে ইবাদতে যতখানি সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে ততখানিই রূহানিয়াত বাড়বে। ভাবাবেগের সাথে রূহানিয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। পরে এর একটি উপমা দিয়ে বলতেন, দুই লোক। এর একজন চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাপন করছে, তার রেশন জারী আছে, পেনশন দিয়ে ভালই যাচ্ছে তার দিনকাল। ছেলে সন্তানেরাও কামাই করছে, বাল-বাচ্চাদের বিয়ে-শাদী শেষ করে ফেলেছে। এক্ষণে তার আর কোন চিন্তা নেই। আরামের সাথে ঘরে বসে জীবনকাল অতিক্রম করছে। এই লোক আযান হতেই অযু করে নেয়। আযান শুনেই মসজিদ পাণে ছুটে যায়। পয়লা কাতারে নামায আদায় করে। ওখানে গিয়ে তাহিয়্যাতুল অযু ও দুখুলুল মসজিদ আদায় করে। সুন্নাত পড়ে, নামাযের অপেক্ষায় থেকে যিকির করে,

সূচিপত্র

সবশেষে যখন জামাত দাঁড়ায় পরম ভক্তিভরে খুশূ-খুযুর সাথে জামাতের সাথে নামায আদায় করে। পরম তৃপ্তিভরে ঘরে ফিরে আসে এবং পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকে।

ফেরিওয়ালার নামায

অপর এক লোক ফেরি করে নিজের ও পরিবারের পেট চালায়। সড়কের কিনারে দাঁড়িয়ে আওয়াজ হেঁকে নিজের পসরা বিক্রি করে। ঘরে খাবার সদস্য ১০ জন, সর্বদা মুখে খাবার তুলে দেওয়ার চিন্তা, কীভাবে পয়সা কামাব, মাল বেচব, রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করব। এই অবস্থায় নামাযের আযান হলো। ক্রেতারা তার পণ্য কিনছে। একে দিচ্ছে কিছু, অপরকে দিচ্ছে কিছু; কিন্তু তার মাথায় ঠিকই 'আযান হয়েছে নামায পড়তে হবে' চিন্তাটিও ঘুরপাক খাচ্ছে। এক্ষণে সে খরিদদারদেরকে তাড়াতাড়ি বিদায় করছে। যখনই নামাযের সময় হয়ে গেল মাথার ঝুড়ি এক স্থানে রেখে তার ওপর কাপড় দিয়ে ঢাকল। দ্রুতই মসজিদে চলে এল। দ্রুতই অযু সারল এবং জামাতে শরীক হয়ে গেল। এক্ষণে তার দিল-দেমাগ কোথায়? এই কথা মনে আসছে, আমার ঝুড়ি কেউ নিয়ে যায় কি-না, পণ্য চুরি হয় কি-না। এক্ষণ সে নামাযে একাগ্রতা আনতে সচেষ্ট হলো। কিন্তু অবস্থাটি এমন যে, একাগ্রতা আসা মুশকিল। তবে আর যাই হোক সে সুন্নাত তরীকায় নামায পড়ছে। দ্রুত সুন্নাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ঝুড়ির উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেছে। কাপড় সরিয়ে আবারো স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লেগে গেছে। শেষ পর্যন্ত বেচাকেনা শুরু করে দিয়েছে।

রূহানিয়াত কার নামাযে বেশি

হযরত বলেন, বলো কার নামাযে রূহানিয়াত বেশি? বাহ্যত: মনে হবে অবসরপ্রাপ্ত লোকটির নামাযে। যিনি বড্ড প্রশান্তি ও স্বস্তির সাথে নামায আদায় করছেন তার নামাযটি ঈর্ষণীয়ও বটে! কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে চিন্তা করলে দেখা যাবে, ঝুড়িওয়ালা মাল বিক্রি করছিল– তার নামাযেই রূহানিয়াত বেশি। কেননা, প্রথম লোকটার তো কোন কাজ নেই। এজন্য সে নামাযে আসার সময় বের করে নিয়েছে। সুতরাং তার নামায এমন কী আহামরি। আহামরি সেতো ফেরীওয়ালার নামায। কেননা তার ঘরের সদস্য সংখ্যা অধিক, মাথায় এদের খাদ্য জোগানের চিন্তা। ঝুড়ির আশেপাশে ক্রেতার আনাগোনা, এই অবস্থায় আযানের আওয়াজ কানে আসতেই ঝুড়ি ঢেকে মসজিদে আসা অনেক বেশি রূহানিয়াতপূর্ণ নয় কি। কেননা এই নামাযে কায়িক ও মানসিক প্রেসার ছিল। এজন্য এ আমলের মাঝে

রূহানিয়াত বেশি। এজন্য সে সওয়াবও অধিক পাবে। সুতরাং আবেগ-উদ্দীপনা থাকলে ইবাদত কবুল হবে, নতুবা নয়; এই ধারণা ঠিক নয়।

ওখানে হুকুম তামিলের জযবা দেখা হয়

আল্লাহ তাআলার দরবারে হুকুম পালনের জযবা দেখা হয়। আমি যে হুকুম দিয়েছি সে তা পালন করতে এসেছে যদিও তার মন-মানসিকতা বিক্ষিপ্ত। তবে যেহেতু ইখলাসের সাথে এসেছে, আমার হাবীবের সুন্নাত মোতাবেক ইবাদত আঞ্জাম দিয়েছে। ব্যাস, তার ইবাদত গৃহীত। এজন্য হযরত বলেন, এই আবেগ-উদ্দীপনা অর্জনের চিন্তা করো না।

সাকী যেভাবে পান করায় তাই তার মেহেরবাণী

তবে হ্যাঁ, কারো যদি আবেগ-উদ্দীপনার নিয়ামত হাসিল হয়ে যায় তো এর জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার এই ইবাদতকে সহজ করেছেন, আমার ইবাদতে মজা ও তৃপ্তিও আসতে শুরু করেছে। তবে এর পেছনে খুব একটা মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। সুতরাং তিনি শেষের দিকে মাওলানা রূমী (রহ.)-এর কবিতার দু' চরণ লিখেছেন–

بدرد وصاف ترا حکم نیست دم درکش

کہ آنچہ ساقی ما ریخت عین الطاف است

অর্থাৎ, তোমার এই অধিকার নেই যে, তুমি সাকীর কাছে এই দাবি করবে যে, আমাকে পরিচ্ছন্ন শরাব দান করবে– তলানি দেবে না। বরং সাকী যেমন শরাব তোমাকে দেবে সেটি একান্ত তার মেহেরবাণী। চাই তিনি পরিচ্ছন্ন শরাব দিন, কিংবা তলানিযুক্ত। তবে তিনি যাই হোক দিবেনই। এমনিভাবে আল্লাহ পাকের কাছে আমলের তাওফীক কামনা করতে হবে। যখন তাঁর পক্ষ থেকে আমলের তাওফীক হয়ে যাবে তখন সেটি তাঁর দয়া, কৃপা ও অনুকম্পা মনে করতে হবে। চাই ওই আমলে মজা আসুক কিংবা না আসুক। তৃপ্তি হোক বা না হোক। শুধুমাত্র এতটুকুতে সন্তুষ্ট থাকবে যে, আমালের তাওফীক হচ্ছে– এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

সারকথা

ইবাদতের মধ্যে আবেগ-উদ্দীপনা ও মজা আসা মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। আর ইবাদত গৃহীত হবার জন্য এটি পূর্বশর্তও নয়। সুতরাং এর চিন্তায় না পড়ে

ইখলাস ও সুন্নাত মোতাবেক ইবাদতের চিন্তা-ফিকির করুন। পরে এটি চলে আসলে ভাল। না এলে দুঃখ পাবার কিছু নেই। আজকাল বহু লোক এই ফিকিরে সময় খরচ করে যে, আমরা নামায পড়ছি, কিন্তু নামাযে মজা আসছে না। এর দরুণ নিজের আমল ও ইবাদতের অবমূল্যায়ন ও না-শোকরী শুরু করে দেয়। এমনটি করা উচিত নয়। ইবাদতের মধ্যে দুটি জিনিসই মূখ্য ও যথেষ্ট। এক. ইখলাস থাকা, দুই. সুন্নাত মোতাবেক হওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

নব্বইতম মজলিস

মহব্বত প্রকৃতিগত না-কি জ্ঞানগত

মহব্বত প্রকৃতিগত না-কি জ্ঞানগত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

ঐ লোক মুমিন নয়

একটি বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

'জ্ঞানগত মহব্বত এই যে, মানুষ তার প্রকৃতিকে শরীয়তের উপর আমল করার দিকে ধাবিত করে।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৫)

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার সম্পদ, জীবন ও তার সন্তান-সন্তুতি থেকে আমি প্রিয়পাত্র না হব। অর্থাৎ, যতক্ষণ না এই অবস্থা পয়দা হবে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত মানুষের অন্তরে তার মাল ও সন্তান-সন্তুতির মহব্বতের চেয়েও অধিক না হবে। এমনকি তার জীবনের চেয়ে প্রিয় না হবে। ততক্ষণ কোন মানুষ মুমিন হতে পারবে না। সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বড় কথা ইরশাদ করেছেন।

ঈমানের ব্যাপারে শঙ্কা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বললে ফারূকে আযম (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি আমার মাল-সম্পদের চেয়ে আপনাকে বেশি ভালবাসি। সন্তান-সন্তুতির চেয়েও বেশি ভালবাসি, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা ভালবাসা অনুমিত হচ্ছে না। এজন্য ঈমান নিয়ে আমার শঙ্কা জাগছে। ঐ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র

হস্ত মুবারক ফারূকে আযম (রাযি.)-এর বক্ষে মারলেন এবং বললেন, কোন মানুষ তার সহায়-সম্পদ, জীবন ও সন্তান-সন্তুতি থেকে আমাকে অধিক ভালবাসতে না পারলে মুমিন হতে পারবে না। এ সময় হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখন! অর্থাৎ, এখন আপনাকে আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি।

ঈমানের মাপকাঠি আল্লাহর মহব্বত নাকি রাসূলের

এটি বড় মুশকিল হাদীস। আমাদের জন্য ওই মাকামকে বুঝা সহজ নয়। এজন্য যে, যে মাকাম থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস ইরশাদ করেছেন এবং যে মাকাম থেকে ফারূকে আযম (রাযি.) প্রশ্ন করেছেন এবং যে মাকাম থেকে এই প্রশ্নের উত্তর সমাধা হয়েছে– এসব এমন উঁচু কথা, যা আপনার-আমার জ্ঞানের সীমায় পরিব্যপ্ত নয়। এই হাদীসের ওপর পয়লা প্রশ্ন এই যে, এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি ভালবাসাকে ঈমানের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন– আল্লাহর প্রতি নয়। অথচ আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে ঈমানের মাপকাঠি বলা দরকার ছিল। এ প্রশ্নের জবাব অতি সহজ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও আল্লাহ তাআলার মহব্বত একটি অপরটির জন্য পরিপূরক। উভয় মহব্বত একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না। যখন কারো হৃদয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত জাগরুক হবে তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে তার মাঝে আল্লাহর মহব্বতও জাগরুক হবে।

কেননা যখন কারো হৃদয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত হবে সে মহব্বত প্রকারান্তরে আল্লাহরই মহব্বত। কেননা আল্লাহর পয়গাম নিয়ে তিনি আমাদের কাছে তাশরীফ এনেছেন। তিনি আল্লাহর আহকাম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনিই আমাদেরকে আল্লাহর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনিই আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে মহব্বতের নেপথ্যে মূলত: আল্লাহ তাআলারই মহব্বত।

একের মহব্বত অন্যের মহব্বতকে আবশ্যক করে

এ কারণে কারো অন্তরে এ কথার অনুভূতি হয় যে, আমার আল্লাহ তাআলার প্রতি অধিক মহব্বত, কারো অন্তরে আবার এই উপলব্ধি হয় যে, আমার হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক মহব্বত। প্রকৃতপক্ষে যখন একজনের প্রতি মহব্বত হবে, তখন অপরজনের প্রতিও মহব্বত হবে। কুরআনুল কারীমের যেখানেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে

সেখানেই হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

সুতরাং আল্লাহ তাআলার মহব্বত হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ওদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতও আল্লাহ তাআলার মহব্বতকে বাধ্য করে।

হযরত রাবেয়া বসরী ও আল্লাহর মহব্বত

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) একজন উঁচু স্তরের তাবেয়ী ছিলেন। নারী আউলিয়াদের সর্বশীর্ষে তাঁর নাম। তাঁর সম্পর্কে কথিত আছে যে, একবার স্বপ্নযোগে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি ওই স্বপ্নযোগে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমাকে মাফ করুন। কেননা আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার অন্তরের মহব্বত এতটা বদ্ধমূল এবং আল্লাহপ্রেমে আমি এতটাই মত্ত যে, এ কারণে অধিকাংশ সময় আপনার দিকে আমার মহব্বতের ধ্যান যায় না। আপনার মহব্বতের উপলব্ধি আমার ভেতরে হয় না– যতটা আল্লাহর মহব্বত হয়। হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন, এতে উৎকণ্ঠার কী আছে? তুমি যে আল্লাহর মহব্বতে মত্ত সেটি মূলত: আমারই মহব্বত। সুতরাং এখানে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের কিছু নেই।

উভয় মহব্বতের সার একই

উৎকণ্ঠার ব্যাপার এজন্য নেই যে, মহব্বতের রং বড় বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন। কখনও আল্লাহ তাআলার মহব্বতের জোশ-জযবা ও উদ্দীপনা অধিকহারে উপলব্ধি হয়, আবার কখনো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের জোশ-জযবা ও উদ্দীপনা উপলব্ধি হয় বেশি। প্রকৃতপক্ষে একজনের মহব্বত অপরজনের মহব্বতের জন্য অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান, আমি সবার চেয়ে প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবে না– এর মতলব, হয় আমি সর্বাধিক প্রিয় হব, না হয় আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক প্রিয় হবেন কিংবা দু'জনই প্রিয়পাত্র হবেন। কারণ, উভয়ের মহব্বতের সার একই। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এভাবেই শেষ হলো।

ঈমান কী ক্ষমতা ও ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয়?

এই হাদীসের উপর দ্বিতীয় প্রশ্ন যা হয়, তা নিয়ে উলামায়ে কেরাম খুবই হয়রান। তা এই যে, এ হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেছেন, যতক্ষণ তোমার জান-মাল ও আওলাদ থেকে আমি প্রিয়পাত্র না হব ততক্ষণ তুমি মুমিন হতে পারবে না। আর মহব্বত বিষয়টি ইচ্ছাধীন নয়। এক্ষণে যদি কারো হৃদয়ে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ওই স্তরের না থাকে– তাহলে তার ঈমানও নেই। আর যখন ঈমান নেই তখন সে কাফের। এর দ্বারা বোঝা গেল ঈমানও ইচ্ছাধীন (اختیاری) থাকল না। কেননা মহব্বত যখন ক্ষমতা ও ইচ্ছা বহির্ভূত (غیر اختیاری) বিষয় এবং ঈমান সেই মহব্বতের উপর নির্ভরশীল তো ঈমানও ইচ্ছাধীন থাকল না।

এক মুহূর্তেই এই বিপ্লব এলো কী করে?

তৃতীয় প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, হযরত ফারূকে আযম (রাযি.)-এর মত লোক যিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রাণোৎসর্গী ছিলেন তিনি বলছেন, আপনি আমার প্রাণাধিক নন। পর মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বক্ষে হস্ত মুবারক রাখলেন এবং ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন আর তিনি বললেন, "الآن" অর্থাৎ, এখন আপনি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। প্রশ্ন হয় এক মুহূর্তেই এই মহাবিপ্লব এলো কী করে?

প্রকৃতিগত মহব্বত (محبت طبعی)

উলামায়ে কেরাম উভয় প্রশ্নের বিভিন্ন রকম জবাব দিয়েছেন। কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বিস্ময়কর জবাব দান করেছেন। তিনি বলেন, মহব্বত দুই প্রকার। এক. প্রকৃতিগত (স্বভাবগত) মহব্বত (محبت طبعی)। দুই. জ্ঞানগত বা যৌক্তিক মহব্বত (محبت عقلی)। সাধারণত: আমরা মহব্বত বলতে যা বুঝি তা মহব্বতে তবয়ী বা প্রকৃতিগত মহব্বত। অর্থাৎ, মানব প্রকৃতির যে জিনিসের সাথে মহব্বত হয়ে যায় তার স্মরণে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে যায়। তার কল্পনায় সময় কাটায়। সর্বদা তাকে স্মরণ করে। যখনই তার কল্পনা আসে তখনই হৃদয়ে এক ধরণের জোশ উতলে ওঠে। এরই নাম প্রকৃতিগত মহব্বত। যেমন সন্তানের প্রতি বাবার মহব্বত। সন্তান যদি দূরে থাকে, তখন বার বার তার নাম মনে পড়ে। তার সাথে সাক্ষাৎ করতে মন চায়। এবং স্মরণে আসে। সাক্ষাৎ করতে মন চায় এবং মন অস্থির হয়ে ওঠে। এটাই হলো প্রকৃতিগত মহব্বত। এই মহব্বতটি ইচ্ছা বহির্ভূত ব্যাপার। এ স্তর কারো অর্জন হয় আর কারো হয় না। কারো মহব্বত বেশি থাকে আর কারো থাকে কম।

জ্ঞানগত বা যৌক্তিক ভালবাসা (محبت عقلی)

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, জ্ঞানগত বা যৌক্তিক মহব্বত (محبت عقلی)। জ্ঞানগত মহব্বতের মর্ম হচ্ছে, যদিও এই মহব্বতে জোশ-জযবা উপচে পড়ে না তথাপিও যখন এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয় তখন দিমাগে একথা আসে যে, এই সত্ত্বা মহব্বতের যোগ্য। এই সত্ত্বার সাথে অতি অবশ্যই মহব্বতের সম্পর্ক কায়েম করা উচিত। এই মহব্বতের ফল এই যে, মানুষ তাঁর হুকুমের আনুগত্য করে। তাঁর ইশারা দেখে তাঁর প্রদর্শিত-নির্দেশিত পথে চলে। তাঁর বলা কথায় আমল করে। এরই নাম মহব্বতের আকলী বা জ্ঞানগত ভালবাসা।

জ্ঞানগত মহব্বতের পরিণতি

এজন্য এই বাণীতে হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেন–

'জ্ঞানগত মহব্বত' এই যে, মানুষ নিজের প্রকৃতি (طبیعت)

কে শরীয়তের উপর আমল করার প্রতি মনোনিবেশ করাবে।'

কেননা এই শরীয়ত জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত এবং তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। যখন আমি জ্ঞান খাটিয়ে চিন্তা করব তখন জানতে পারব, এই শরীয়ত অবশ্য অনুকরণীয় এবং জীবনকে এরই সাঁচে গড়তে হবে। এই শরীয়তই আমার সংশোধন ও উন্নয়নের জামিন। যখন এই মূল্যবোধ পয়দা হবে, তখনই মহব্বতে আকলী তথা জ্ঞানগত মহব্বত অন্তরে বদ্ধমূল হবে।

জ্ঞানগত মহব্বতের উপমা

জ্ঞানগত মহব্বতের সাদৃশ্যহীন উপমা এই যে, এক লোক অসুস্থ হলো। ডাক্তার তাকে একটি তেঁতো ঔষধ বা একটি ইনজেকশান পুশ করা সাব্যস্ত করলেন। সাধারণত তেঁতো ঔষধ ও ইনজেকশান লাগাতে মন চায় না। বরং মন চায় কোনোভাবে ইনজেকশান লাগানো থেকে বেঁচে গেলে ভাল হত। কিন্তু মন না চাইলেও ওই লোককে ঐ ঔষধ পান করতে হয়। অবশ্য ঐ ঔষধের প্রতি তার কোনই মহব্বত নেই। সুতরাং যে দিন ডাক্তার বলবেন, ঐ ঔষধ আর পান করার দরকার নেই সেদিন সে ঐ ঔষধ দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে। যতক্ষণ ডাক্তার বলবেন, তোমার রোগের উপশম ঐ তেঁতো ঔষধের মধ্যেই নিহিত ততক্ষণ সে ঐ ঔষধ পান করতে থাকবে। এক্ষণে ঔষধের সাথে তার প্রকৃতিগত মহব্বত নেই। আছে জ্ঞানগত বা যৌক্তিক মহব্বত। সুতরাং মনে প্রচণ্ড অনীহা সত্ত্বেও সে এই ঔষধ পান করে যাবে।

এই উপমা জ্ঞানগত মহব্বতের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথের মহব্বতটি ঔষধের সাথে তুল্য হতে পারে না। এখানে প্রকৃতিগত মহব্বত ও জ্ঞানগত মহব্বতের পার্থক্য বুঝানোর নিমিত্তে উক্ত উপমাটিকে টানা হয়েছে। নতুবা কোথায় ঔষধের মহব্বত আর কোথায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মহব্বত। উভয়টির মাঝে কোন সম্পর্ক নেই।

চিন্তা-ভাবনার পরিণতিতে হুযুরে আকরাম সা.-এর মহব্বত

মোটকথা, যখন মানুষ ভাবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার সৃষ্টিকর্তা, আমার মালিক, তাঁর প্রিয়নবীকে আমার হেদায়েত ও পথ নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদের হেদায়েতের জন্য কত গঞ্জনা সয়েছেন, কত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়েছেন, আমার জন্য এই শরীয়ত নিয়ে এসেছেন। আমার জন্য হেদায়েতের সাজ-সরঞ্জাম উপহার দিয়েছেন। এই বিচার-বিশ্লেষণের দরুণ যৌক্তিক দৃষ্টিকোণে মানুষ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করবে। এই মহব্বতে ঐ জোশ-জযবা ও আবেগ-উচ্ছাস নেই, যা নিজের সন্তানের বেলায় হয়ে থাকে। কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টিকোণে সে বুঝবে, তাঁর সত্ত্বা সবার চেয়ে বেশি মহব্বত পাওয়ার যোগ্য।

জ্ঞানগত মহব্বত কাম্য

মহব্বতের যে স্তর কাম্য ও মূখ্য তা এই জ্ঞানগত মহব্বতই, যা ঈমানের জন্য পূর্বশর্ত। এই জ্ঞানগত মহব্বতটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে সবার ওপরই প্রবল থাকতে হবে। পরে হযরত থানভী (রহ.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর বিবৃতির ব্যাখ্যা এভাবে দিচ্ছেন যে, যখন হযরত ওমর (রাযি.) এই হাদীস শোনেন 'সবকিছুর চেয়ে আমি প্রিয়পাত্র না হলে মুমিন হওয়া যাবে না' তখন হযরত ওমর (রাযি.) প্রথমে এই বুঝেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতিগত মহব্বতের কথা বলছেন। আর প্রকৃতিগত মহব্বত এই স্তরের অর্জিত ছিল না তাঁর। এজন্য হযরত ওমর (রাযি.) প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্ত মুবারক ওমর (রাযি.)-এর বক্ষে মারেন এবং ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করেন তখন তিনি বুঝে ফেলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'প্রকৃতিগত মহব্বতে'র কথা বলছেন না, বলছেন 'জ্ঞানগত মহব্বতের' কথা। আর এই 'জ্ঞানগত মহব্বত' আমার মাঝে অর্জিত হয়েই আছে। এজন্য তিনি এ সময় বলে ওঠেন, اَلْآنَ। 'এখন'। অর্থাৎ, এখন আমার বুঝে এসেছে। আলহামদু লিল্লাহ, জ্ঞানগত মহব্বত

আমার আছে। এই ব্যাখ্যাই হযরত থানভী (রহ.) দিয়েছেন। মোটকথা, উদ্দেশ্য ও কাম্য হলো জ্ঞানগত মহব্বত।

আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা

অবশ্য ভিন্ন আরেকটি ব্যাখ্যা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) করেছেন। তিনি বলেন, উক্ত হাদীসে যে মহব্বতের আলোচনা করা হয়েছে একে 'জ্ঞানগত মহব্বত' বলে চালিয়ে দিলে হাদীসের আবেদনই নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা জ্ঞানগত মহব্বত তো তাকে বলে যে, অন্তরে ঐ সত্ত্বার প্রতি কোনও বিশেষ মহব্বত নেই।' কিন্তু তথ্য প্রমাণাদি তালাশ করার দ্বারা জবরদস্তিমূলক মহব্বত করা হয়। সুতরাং এই হাদীসে 'প্রকৃতিগত মহব্বত'ই মূখ্য– জ্ঞানগত মহব্বত নয়। হাদীসে প্রকৃতিগত মহব্বত মূখ্য হলেও সেটি জ্ঞানগত মহব্বতেরই পরিণতি।

প্রকৃতিগত মহব্বত দলিল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়

দেখুন, এক রকম প্রকৃতিগত মহব্বত ঐটি হয়, যা কোন লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা, দলিল-প্রমাণ ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বাস্তবিকই মানুষের অন্তরে মওজুদ হয়। যেমন সন্তানের প্রতি পিতার মহব্বতটি প্রকৃতিগত। এমনটি কী হয় যে, যখন সন্তান পয়দা হয় তখন বাবা যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করে ফল বের করেন? অর্থাৎ, বাচ্চা আমার, আর প্রত্যেক বাচ্চাকে তার বাবার মহব্বত করা উচিত, অতএব তাকে আমার মহব্বত করতে হবে– এমনটি হয় না। হয় যা তাহলো, যখনই বাচ্চা পয়দা হয় তখনই মহব্বত পয়দা হয়ে যায়। খালেছ এই মহব্বতটিই প্রকৃতিগত মহব্বত।

জ্ঞানগত মহব্বতের পরিণতিতে প্রকৃতিগত মহব্বত

প্রকৃতিগত মহব্বতের দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানগত মহব্বতের ফলে পয়দা হয়। অর্থাৎ, প্রথমে সামান্য ভাবতে হয়, চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। পরে যখনই চিন্তা করে, তখনই চিন্তার ফলশ্রুতিতে মহব্বত সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহব্বতের কথা বলেছেন, তা 'প্রকৃতিগত মহব্বত'ই। অবশ্য এ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা জ্ঞানগত মহব্বত। কাজেই যার হৃদয়ে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃতিগত মহব্বত পয়দা না হয় তখন সে ভাববে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের এক একটি লোকের ওপর কী বিশাল ইহ্সান করেছেন! এ সময় সে মহব্বতের উপকরণ নিয়ে চিন্তা করবে।

হুযূর (সা.)-এর মাঝে মহব্বতের চারটি উপকরণই ছিল

'নশরুত তীব' নামক সীরাত গ্রন্থে হযরত থানভী (রহ.) লিখেন, মহব্বতের চারটি উপকরণ হয়ে থাকে। যদি কারো সাথে মহব্বত হয় তো ঐ উপকরণের কোন একটির পরিণতিতেই মহব্বত হয়। এক. তার সৌন্দর্যের কারণে মহব্বত হয়। দুই. তার পূর্ণতার কারণে মহব্বত হয়। তিন. তার বদান্যতা ও দানশীলতার কারণে মহব্বত হয়। চার. তার ধন-সম্পদের কারণে মহব্বত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বায় এই চারটি উপকরণই মওজুদ ছিল। তা এই পরিমাণে যে, জগতের কারো মাঝেই মওজুদ হতে পারে না। তাঁর সৌন্দর্য এমন ছিল যে, হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন যে, যুলায়খার সখীরা ইউসুফ (আ.)কে দেখে তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, যদি তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জগতালোককারী সৌন্দর্য দেখত তাহলে হাতের বদলে বক্ষই কেটে ফেলত। এই হলো তাঁর সৌন্দর্যের নমুনা। পূর্ণতার কথা বলতে গেলে এ দিকটি তাঁর যতখানি ছিল জগতের আর কোন মাখলূকের বেলায় তা কল্পনাও করা যায় না। দান-বদান্যতা এমন যে, অর্থ-বিত্তের দান, মাল-সম্পদের দান, জ্ঞানের দান, ধর্মীয় দান পুরো উম্মত ১৪ শ' বছর ধরে তাঁর বদান্যতা ও দানের দ্বারা স্নাত হয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে। মানুষ যখন এসব উপকরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তার জ্ঞানগত মহব্বত থাকবে না। বরং 'জ্ঞানগত মহব্বত' ক্রমশ: 'প্রকৃতিগত মহব্বতে' রূপান্তরিত হবে।

প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে হুযূর (সা.)-এর মহব্বত

সত্যি বলতে কী, একজন মুসলমান যতই খারাপ হোক না কেন, ফাসেক হোক, গোনাহগার, গুণ্ডা কিংবা আওয়ারা যাই হোক না কেন তথাপিও হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত তার অন্তরে এই পরিমাণ বদ্ধমূল থাকে, সে বে-নামাযী, বে-রোযাদার ও ফরয ইবাদত থেকে উদাসীন থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তার সামনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখী করে তো সে মরণপণ লড়াই করতেও প্রস্তুত হয়ে যায় এবং প্রাণ উৎসর্গ করে। এ রকম অনেকেই জীবন দিয়েছেন। যেমন গাজী ইলমুদ্দীন। এই তো কিছুদিন আগে তার সামনে এক লোক হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখী করে, সে এই লোককে হত্যা করে ফেলে। যখন এ নিয়ে হত্যা মামলা হয় এবং তার বিচারকার্য শুরু হয়, লোকেরা তাকে বলে, তুমি একবার বলো, আমি তাকে হত্যা করিনি কিংবা সামান্য কথা ঘুরাও। সে জবাব দেয়, কিভাবে আমি কথা ঘুরাব। সারা জীবন তো একটা আমলই করেছি।

আমার আমলনামায় শুধুমাত্র একটি আমলই বিদ্যমান। আর কোন আমল নেই। সুতরাং রায় তার বিরুদ্ধে গেল। তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হলো। মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে সে জীবন দিল।

আখতার শিরানীর ঘটনা

আখতার শিরানী বিখ্যাত এক কবি। বড্ড স্বাধীনচেতা কবি। মদপানকারী ছিল। তার কবিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। কাউকে সে তোয়াক্কা করে কবিতা লিখত না।

একবার সে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে হোটেলে বসা ছিল। শরাব পানে লিপ্ত ছিল। লোকেরা তাকে উৎপাত করত এবং নেশা অবস্থায় নানা লোকের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করত এবং তার দ্বারা (সে লোকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন) কথা বলাত। মানুষেরা বলত, অমুক লোকের ব্যাপারে তোমার খেয়াল কী? কবি এই প্রশ্নের জবাবে এক কথা শুনিয়ে দিতেন। অমুকের ব্যাপারে অভিমত কী? এ সময়ও তিনি এক কথা বলে দিতেন। কখনওবা রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত। কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত, সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত। সকলের জবাবেই তিনি তার কথা শুনিয়ে দিতেন। এই সময় জনৈক হতভাগা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? এক্ষণে একদিকে সে নেশায় বুঁদ আবার অপর দিকে পরিবেশ এমন যে, সকলের প্রশ্নের জবাবে তার মন্তব্য পেশ করছেন। এই প্রশ্ন শুনেই তার শরীরটা কেঁপে ওঠল। তার হাতে একটা মদের গ্লাস ছিল। গ্লাসটি প্রশ্নকারীর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। বললেন, হতভাগা! তুমি আমার জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও ছিনিয়ে নিতে চাইছ? সন্দেহ নেই আমি বড় গোনাহগার, নেহায়েতই হতভাগ্য তথাপিও ওই পবিত্র সত্ত্বার বিরুদ্ধে কোনও অসম্মানজনক বাক্য সহনীয় নয়। মোটকথা, একজন মুসলমানের অবস্থা এমন হয় যে, সে যত বড় পাপীই হোক না কেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত তার মাঝে থাকেই। এটি কেবল 'জ্ঞানগত মহব্বত' নয়, বরং 'প্রকৃতিগত মহব্বত'। তবে এটি 'জ্ঞানগত' মহব্বতেরই পরিণতি। এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্যও তাই।

মহব্বত এক জিনিস, জোশ-জযবা আরেক জিনিস

আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, মহব্বত এক জিনিস আর জোশ-জযবা আরেক জিনিস। কোনো কোনো সময় কারো মহব্বতের জোশ-জযবা অধিকই বোঝা যায় কিন্তু প্রকৃত মহব্বত অন্যের প্রতি বেশি থাকে। যেমন সন্তানের প্রতি পিতার মহব্বত। এই মহব্বতে জোশ-জযবা বেশি থাকে। মন চায়– তাকে স্নেহ

করতে, কোলে তুলে নিতে, মন চায় তাকে বুকে আগলে রাখতে, কথা বলতে। পক্ষান্তরে পিতার প্রতি সন্তানের যে মহব্বত হয় তাতে জোশ-জযবা থাকে না। বাবাকে সব সময় বুকে আগলানো, কোলে তুলে নেওয়া, আদর-সোহাগ করার জোশ-জযবা ও শখ হয় কী? না। বোঝা গেল পিতার সাথে ঐ জোশ-জযবা চলে না, যা পুত্রের বেলায় চলে। সুতরাং বাপের সাথে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে বাপের মহব্বতে এতটুকু কমতি নেই। ক্ষেত্র বিশেষ বাবা-মার মহব্বত সন্তানের মহব্বতের অধিক হয়। তাই কখনো যদি উভয় মহব্বতের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে যায়, তখন মানুষ মা-বাপকে প্রাধান্য দেয়। বোঝা গেল, মা-বাপের মহব্বত অধিক এবং সন্তানের বেলা জোশ-জযবা অধিক। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত বেশি হওয়া চাই। অবশ্য জোশ-জযবা এক্ষেত্রে মূখ্য নয়। মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় 'প্রকৃতিগত মহব্বত'ই কাম্য, যা 'জ্ঞানগত মহব্বতের'ই পরিণতিতে হয়।

উভয় ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য একই

এই ব্যাখ্যা হযরত কাশ্মীরী (রহ.)-এর। সত্যি বলতে কী, শাহ ছাহেব অত্যন্ত উঁচু ও সূক্ষ্ম কথা বলেছেন। আমার ধারণা, হযরত শাহ্ ছাহেব (রহ.)-এর কথা হযরত থানভী (রহ.)-এর কথার বিরোধী নয়। খুব সম্ভব উভয় ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য ও মর্ম এক ও অভিন্ন। তা এভাবে যে, হযরত থানভী (রহ.) যাকে 'জ্ঞানগত মহব্বত' বলছেন এর সারকথা এই যে, এ মহব্বত কোন দলিল দ্বারা হাসিল হয়। কিন্তু এ মহব্বতও অন্তর থেকেই উৎসারিত হয়। কেননা মহব্বতের ক্ষেত্র তো হৃদয়ই আর জ্ঞানের ক্ষেত্র 'মস্তিষ্ক'। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে যে মহব্বত যদিও তা বিবেকের চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতির উপর আবর্তিত হয়, এতদসত্ত্বেও সেটি যখন মহব্বত তখন তা অন্তর থেকেই উৎসারিত। এজন্য দু' হযরতের কথার মধ্যে কোনই তফাৎ নেই। অবশ্য হযরত শাহ ছাহেব (রহ.) মহব্বতের ব্যাখ্যা এমনভাবে দিয়েছেন যে, তা সহজে বুঝে আসে এবং এতে কোন প্রশ্নও থাকে না।

আহলে মহব্বতের কথা পড়

হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'মহব্বত, দরদ ও একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য 'মছনবী শরীফ' ও 'দেওয়ানে হাফেয' রোজানা দু' পৃষ্ঠা করে পড়লে উপকার হবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৫)

সত্যি কথা বলতে কী, এই 'মহব্বত' ও 'ইশক' এমন কোন বিষয় নয়, যার ওপর কোন লেকচার দিলে তা অর্জন হবে। বরং এটি একটি 'অবস্থা' যা অন্তরে পয়দা হয়। এই অবস্থা পয়দা হওয়ার জন্য পূর্বে যে সমস্ত উপকরণ বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। যেভাবে আল্লাহওয়াদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে উপকৃত হওয়া যায়, সেভাবে যেসব আহলে মহব্বত অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের অবস্থাদি, জীবনী, বাণী ও শিক্ষা অধ্যয়ন করলেও মহব্বত বৃদ্ধির উপকরণ হয়। এ দু' হযরত অর্থাৎ হযরত মাওলানা রূমী (রহ.) 'মছনবী প্রণেতা'। হাফেয শিরাযী যিনি 'দেওয়ানে হাফেয' প্রণেতা। এমন দু' 'আহলে মহব্বত', যাঁদের উভয়েরই হৃদয়ে মহব্বতের আগুন আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছিল। তাঁদের কথা পড়লে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলার মহব্বত পয়দা হবে।

হযরত খাজা শামসুদ্দীন তাবরিযী (রহ.)-এর দুআ

এই মহব্বত কেন পয়দা হয়? কেননা এই মছনবী, যা মাওলানা রূমী (রহ.) লিখেছেন বিস্ময়কর এক কিতাব। ইলহামী কিতাব। মাওলানা রূমী (রহ.)-এর শায়খ শামস তাবরিযী (রহ.) বড় উঁচু দরজার ওলী ছিলেন– তবে উম্মী ছিলেন অর্থাৎ, লেখাপড়া তাঁর ছিল না কিন্তু তাঁর, হৃদয়ে আল্লাহ পাক বিস্ময়কর ইলম ও মারেফাত ঢেলে দিয়েছিলেন। মজলিসেও অনেক ইলমী কথা বয়ান করতেন। এই ইলম মজলিস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত। একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন– হে আল্লাহ! আমার কলবে আপনি নানা বিষয় ঢেলে দিয়ে থাকেন, কিন্তু ঐসব বিষয় ওই মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। আমি বিলকুল যবানহীন লোক। আমার দ্বারা লেখার কাজও হয় না, সংকলনও হয় না। কোনও কবিতাও রচনা করতে পারি না। অতএব হে আল্লাহ! আমাকে একটি যবান দান করুন, যা আমার এই ইলম ও মারেফাতকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাতে সহায়ক হয়।

শামসুদ্দীন তাবরিযী (রহ.)-এর দুআর ফসল

সুতরাং এই দুআর বদৌলতে মাওলানা রূমী (রহ.) খাজা শামসে তাবরিযী (রহ.)-এর কাছে বায়আত হয়ে যান। এদিকে এই মাওলানা রূমীও জীবনে কোন কবিতা রচনা করেননি, যখনই শায়খের খেদমতে ইসলাহের জন্য হাজির হলেন এবং বায়আত হলেন এরপরই তিনি রীতিমত কবি হয়ে গেলেন। এ সম্পর্কে এই চরণ উচ্চারণ করেন–

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

"মৌলভী ততক্ষণ রোমের মাওলা হতে পারেনি, যতক্ষণ না সে শামসে তাবরিযীর গোলাম হতে পেরেছে।"

মোটকথা, শায়খের গোলামী অবলম্বন করেন এবং তার নিকট বায়আত হন। এর পরিণতিতে হযরতের দুআ কবুল হয়। আল্লাহ পাক মাওলানা রূমীকে শামসে তাবরিযীর যবান বানিয়ে দেন। হঠাৎ একদিন স্বত:স্ফূর্তচিত্তে মাওলানার যবানে কাব্য জারী হয়ে যায় অথচ এর পূর্বে কোনদিন তিনি কাব্য রচনা করেননি। শুরু হলো মাওলানার কলম চলা। ওই কবিতার মাঝে উলূম, মারেফত, কেচ্ছা-কাহিনী, ভেদতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ের বয়ান শুরু হলো। এক সময় ছয়টি দফতর হয়ে গেল। এসবের মধ্যে অধিকাংশই হেকায়েত ও কাহিনীনির্ভর বর্ণনা। কিন্তু প্রতিটি হেকায়েত দ্বারা বিস্ময়কর অর্থ, মর্ম, তত্ত্ব ও তথ্য বেরোয়। শেষের দিকে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। ঘটনাটি তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ তাঁর কবিতা আসা বন্ধ হয়ে গেল। লিখে দিলেন, এটি শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটি আমার ইচ্ছাধীন নয়। আল্লাহ পাক অন্য কোন বান্দাকে পয়দা করবেন সেই-ই কবিতার পরিশিষ্ট লিখবে।

মছনবীর সমাপ্তি হলো কীভাবে?

আল্লাহ পাক তাঁর কুদরত দেখালেন। বুঝালেন, রূমী যা লিখেছে আমার দেওয়া ইলম ও ইলহামের মাধ্যমেই লিখেছে। সুতরাং এরপর হাজার বছর পেরিয়ে যায় কেউই ওই অবশিষ্ট কাহিনী লিখতে পারেনি। মুফতী এলাহী বখশ কান্ধালবী (রহ.)-ই এই কাহিনীর সমাপ্তি টানেন। তাঁর যবানেই কবিতা জারী হয়ে যায়। যেখান থেকে মাওলানা রূমী তার অসম্পূর্ণ কেচ্ছার ইতি টেনেছিলেন তিনি সেখান থেকেই শুরু করে মছনবীর পরিসমাপ্তি টানেন। এজন্য তিনি 'খাতিমুল মছনবী' নামে খ্যাত। এর দ্বারা জানা গেল মছনবী এক ইলহামী কিতাব, যা এই দুই আল্লাহওয়ালার হৃদয়ে এলহাম হয়েছিল। কাজেই যারা এই কিতাব পড়বে তাদের সাথে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হয়ে যাবে। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এই কিতাব পড়ুন। যারা ফারসী জানেন না তারা উর্দূ তরজমা পড়ুন। উর্দূ ভাষায় এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। (আলহামদু লিল্লাহ বাংলা ভাষায়ও মছনবীর গ্রহণযোগ্য দুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাওয়া যায়– অনুবাদক)

দেওয়ানে হাফেয ও মছনবীর ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় যে কিতাবখানি পড়তে হযরত থানভী (রহ.) নির্দেশ করেছেন, তা 'দেওয়ানে হাফেয'। এও এক বিস্ময়কর কিতাব। সবচেয়ে মজার কথা হলো,

সূচিপত্র

হযরত থানভী (রহ.) যে দু'টি কিতাব পড়ার প্রতি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন সে দুটি কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তিনিই লিখেছেন। মছনবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'কালীদে মছনবী' নামে বেশ ক' ভলিয়মে লিখেছেন। আর 'দিওয়ানে হাফেয' গ্রন্থখানি 'ইরফানে হাফেয' নামে ব্যাখ্যা লিখেছেন। ভাবতে অবাক লাগে, হযরত এত সময় কোথায় পেতেন? তিনি 'দেওয়ানে হাফেয'-এর ব্যাখ্যা লিখেছেন যা কবিতা ও কবিত্বের সমন্বিত আকর গ্রন্থ। এর মাঝে অধিকাংশই গযল। এতে শরাবের উল্লেখ বিদ্যমান। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য, মটকা বা বোতলের শরাব নয় বরং এর উদ্দেশ, 'মহব্বতের শরাব', 'মারেফাতের শরাব'। হাফেযের প্রতিটি কবিতায় মহব্বত ও মারেফাত ভরপুর। হযরত জানতেন, এই কিতাব পাঠ করলে মহব্বত বাড়বে। এজন্যই তিনি এর ব্যাখ্যা লিখেছেন।

হাফেয শিরাযীর একটি ঘটনা

এদিকে হাফেয শিরাযীর ব্যাপার-স্যাপারও বিস্ময়কর। ইনি

"اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ"

'আল্লাহ যাকে খুশি নির্বাচন করেন'

এর পর্যায়ভুক্ত। তাঁরা বেশ কয়েক ভাই ছিলেন। সকল ভাই নানা কাজে লিপ্ত ছিল। কেউ ব্যবসা করত, কেউ করত চাকুরি। কিন্তু শিরাযী জঙ্গলে আওয়ারার মত ঘোরাফেরা করতেন। শিক্ষা-দীক্ষা, কাজ-কর্ম, রুজি-রোজগার কোন কিছুতেই তাঁর মন বসত না। বড়রা তাঁকে নিয়ে খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বাবা খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দীর মুরীদ ছিলেন। খাজা ছাহেব একদিন হাফেয শিরাযীর বাড়িতে এলেন। বাবা তাঁর সন্তানদের খাজা ছাহেবের সম্মুখে পেশ করলেন এবং দুআ করালেন। শায়খ সব বাচ্চাকে দুআ দিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার তো আরেকটি পুত্র আছে, সে কোথায়? বাবা বললেন, ওতো উদাসীন ও ভবঘুরে টাইপের। ওর কোন সন্ধান নাই। খুব সম্ভব বন-বাদাড় মাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শায়খ বললেন, তাঁকে ডেকে পাঠাও। বাবা কারো মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি গিয়ে বললেন– শায়খ বাড়িতে এসেছেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কর। দুআ নাও। তিনি বাড়িতে এলেন, শায়খের প্রতি নজর পড়তেই দাঁড়ানো অবস্থায় কবিতা পড়লেন–

آنا کہ خاک را بنظر کیمیا کنند

آیا بود کہ گوشۂ چشم بما کنند

অর্থাৎ, যারা মাটিকে এক নজরে মূল্যবান পরশ পাথরে পরিণত করে। –উদ্দেশ্য এর দ্বারা, খাজা বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী (রহ.)। –এমনটি কী কখনও হবে যে, তিনি তাঁর চোখের নজর আমার প্রতি সামান্য ফেলবেন। এই কবিতা শুনে খাজা বাহাউদ্দিন (রহ.) দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন,

نظر کردم، نظر کردم، نظر کردم

অর্থাৎ, তুমি যে নজর ফেলানোর আবদার করছ সেই নজর ফেললাম। সেই দিন থেকে হাফেযের ভবঘুরে ভাব দূর হোল। শায়খের খেদমতে পড়ে গেলেন। হয়ে গেলেন তাঁর গোলাম। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন মাকামই দান করলেন, যা দেখে বড় বড় লোকেরা ঈর্ষাকাতর হয়।

দেওয়ানে হাফেযের একটি কবিতা

এরপরে তিনি 'দেওয়ানে হাফেয' লেখা শুরু করেন। 'দেওয়ানে হাফেযের' আপাদমস্তক ইশক মহব্বতে ভরপুর, যদি কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। হৃদয়ঙ্গম করার লোক কমই ছিল সেজন্য হযরত থানভী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা লিখেন। সরাসরি কেউ বুঝতে না পারলেও ব্যাখ্যা গ্রন্থের মাধ্যমে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, এর মধ্যে কী আছে। এটি একটি কাব্যগ্রন্থের মতই। একটি কবিতায় তিনি বলেন–

بدہ ساقی مئے باقی کہ در جنت نخواہی یافت
کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

দেখলে মনে হবে কোন উদাসীন কবির চরণ। এই কবিতার মধ্যে তিনি বলছেন, হে সাকী! যে শরাব বাকী রয়ে গেছে তাও আমাকে দাও। কেননা জান্নাতে এই শরাব পাওয়া যাবে না। জান্নাতের কিনারায় রুকনাবাদ উপকূলের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীও নাই। না কোন ফুলের জায়নামায ওখানে আছে, না আছে শরাব। দুনিয়াতে আমাকে তা দাও। বাহ্যত: মনে হচ্ছে তিনি দুনিয়ার শরাবের পিয়াসী। দুনিয়ার নদীর উপকূল উদ্দেশ্য।

কবিতার সঠিক মর্ম

কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) কবিতার সঠিক মর্ম লিখেন যে, এই কবিতা দ্বারা হাফেয বুঝাতে চাচ্ছেন, জান্নাতে অন্য সব নেয়ামত পাওয়া যাবে, কিন্তু সেখানে

সূচিপত্র

আল্লাহকে পাগলপারা হয়ে খোঁজার মজা পাওয়া যাবে না। এজন্য যে, ওখানে পৌঁছার পর সব স্বাদ ও নিয়ামত হাসিল হয়ে যাবে। প্রেমাস্পদের তলব ও অন্বেষায় যে স্বাদ তা এই দুনিয়াতেই পাওয়া যায়। সুতরাং যতক্ষণ তুমি জীবিত আছো অন্বেষা ও তলবের স্বাদ নিতে থাক। এটি আর কোথাও মিলবে না। কবিতায় হাফেয শিরাযী এ কথাই বলতে চাচ্ছেন।

যে বোঝে না সেই আপত্তি তোলে

মোটকথা, হাফেয শিরাযীর কবিতা এমনই। এক্ষণে যারা কাণ্ডজ্ঞানহীন, মূর্খ, যারা তাঁর কবিতাকে বুঝতে পারে না, এমনকি তারা হযরত থানভী (রহ.)-এর সমালোচনা করেন যে, তিনি এমন একটি কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন যে, যে কিতাবে শরাবের উল্লেখ আছে, জান্নাতে যে শরাব মিলবে না। এই শরাব দ্বারা দুনিয়ার শরাব ছাড়া আর কোন্ শরাব উদ্দেশ্য? আসল শরাব তো জান্নাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু হযরত এই কবিতাকেও তাসাওউফের লেবাস পরিয়ে দিয়েছেন। সত্যি বলতে কী, যারা নাবুঝ তারাই যে কোন ব্যাপারে আপত্তি তোলে। মোটকথা, এটি এমন এক কিতাব, যে বা যারা এটি অধ্যয়ন করবে তার মনে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হবেই। এজন্য হযরত বলেন, দৈনিক দু' পৃষ্ঠা 'মছনবী' ও 'দেওয়ানে হাফেজ' পড়। এতে ইনশাআল্লাহ 'মহব্বত'-এ উন্নতি হবে। আল্লাহ পাক তাঁর রহমত দ্বারা আমাদেরকেও তাঁর মহব্বতের সামান্য দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

একানব্বইতম মজলিস

প্রতিটি বস্তু আল্লাহর দান

প্রতিটি বস্তু আল্লাহর দান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

এই দেহ আল্লাহর নিয়ামত

এক বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> "সালেক (মুরীদ) যখন দেখে যে, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর নৈকট্য লাভে আমাদের সাহায্য করেছে, তখন সে এই দৃষ্টিকোণে এর সাথে মহব্বত করে এবং নিজের চোখের হেফাযত করে, মস্তিষ্ক হেফাযত করে, নিজের বস্তু হিসেবে নয়; বরং এই কারণে যে, এগুলো আল্লাহপ্রদত্ত (নিয়ামত)।
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৯৭)

আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক ও তাঁর মহব্বতের বর্ণনা চলছিল। এই বাণীতে হযরত বলেন, যখন মানুষের নজর দুরস্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সহীহ করে দেন, তখন জগতের প্রতিটি বস্তুতে সে আল্লাহর কুদরতের ঝলক দেখতে পায় এবং যে বস্তুর সাথেই তার মহব্বত হোক না কেন মূলত: সেটি আল্লাহরই মহব্বতের ভিত্তিতে হয়। সুতরাং তিনি বলেন, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ– যা আল্লাহ পাক দান করেছেন। এই চোখ, এই কান, নাক, এই হাত-পা ইত্যাদির সাথে মহব্বতকারী বান্দার যে মহব্বত হয়– তা এই কারণে নয় যে, এগুলো তার নিজের জিনিস, বরং এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত এবং এর মাধ্যমে আমার আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার শক্তি হয়েছে, এজন্য ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মহব্বত হয়।

সূচিপত্র

নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মহব্বত করবেন, কিন্তু

আমার আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর কবিতা

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است

افتم بپائے خود کہ بکویت رسیدہ است

অর্থাৎ, আমার চোখের উপর গৌরব করি যে, সে তোমার সৌন্দর্য দেখেছে, তোমার সুষমা অবলোকন করেছে। আমি আমার পা নিয়ে গৌরব করি, এ কারণে যে, তা তোমার গলি পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং আমাকেও ঐ গলিপথে এনেছে। এ কারণেই ওগুলোর সাথে আমার মহব্বত আছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের পথের যে পথিক আল্লাহর রাস্তায় চলে, আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার আগ্রহ তার অন্তরে পয়দা হচ্ছে, সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথেও মহব্বত করে, কিন্তু মহব্বতের ধরণ ভিন্ন হয়। আমরা এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এজন্য ভালবাসি যে, এগুলো আমাদের, এ চোখ আমার, কান আমার, নাক আমার, হাত আমার, পা আমার, এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমাদের উপকার হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে স্বীয় মারেফাত দান করেছেন সেও নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মহব্বত করে, কিন্তু সে এজন্য মহব্বত করে যে, এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করেছি। এগুলো আল্লাহর দান– এজন্যই মহব্বত করে।

চিন্তা কর এগুলো এসেছে কোত্থেকে?

আরেক স্থানে হযরত ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক স্থাপনের আরেকটি তরীকা এও যে, জগতের যা কিছু তোমার নজরে ভাল দেখায়, যদ্দারা তুমি শান্তি লাভ কর, আরামবোধ কর– এ নিয়ে ভাবো যে, এগুলো কোত্থেকে এসেছে? কে বানিয়েছেন এগুলো? কে দিয়েছেন আমাকে? যে পরিমাণ চিন্তা করবে সেই পরিমাণ আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি হবে। এজন্য যে, এই অবস্থায় জগতের প্রতিটি বস্তুতে তুমি আল্লাহ তাআলার ঝলক দেখতে পাবে। যেমন খাবার সামনে এল, খাবারটি মজাদার, তোমার ভালই লাগছে। এর দ্বারা তুমি আরামবোধ করছ। এক্ষণে তুমি সামান্য ভাবো যে, এই খানা কোত্থেকে এসেছে? কে দিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গি যদি সংকীর্ণ হয়, তখন মানুষ এতটুকু ভাববে যে, বাড়ীর লোকে রান্না করেছে, ভাল রাঁধুনি রেঁধেছে। ব্যাস! এ পর্যন্ত গিয়ে বিবেকের দৌড় শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ পাক যদি দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে

দেন এবং বিবেকী বুঝ দান করে থাকেন তাহলে সে ভাববে, রাঁধুনি ও বাড়ির লোকদের কী এমন শক্তি ছিল যে, তারা এমন খাবার রান্না করতে পারে? এবং বাহ্যত: খাবারের মাঝে যে অংশগুলো নজরে পড়ছে চাই সেটি কোন পশুর গোশত হোক, সব্জি কিংবা তরকারী হোক, কিংবা মসলা হোক– এগুলো সব কোত্থেকে এসেছে? এ সবের প্রতি গভীর নজর ফেললে দেখবে, প্রতিটি বস্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, তাঁরই অপার দান। নতুবা কোন মানুষের সাধ্য নেই এগুলো পয়দা করে হাসিল করে।

এই গোশত কোত্থেকে এলো?

এই যে, গোশত, যা আপনি মজা করে খাচ্ছেন– কোত্থেকে এলো? কে পয়দা করলেন? যদি উত্তর দেন, গাঁটের পয়সা খর্চা করে বাজার থেকে খরিদ করে এনেছি, কিন্তু এমনও তো হয়, পকেটে পয়সা ঠিকই আছে, কিন্তু গোশত বাজারে মিলছে না। কোনও পশুরও দেখা নেই– তখন? সামান্য ভাবুন! এই পশুগুলো কোত্থেকে এসেছে? কে পয়দা করেছেন? কেউ কি পয়সা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? সত্যি বলতে কী, এগুলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর হুকুমে অস্তিত্বে এসেছে। পরে এই পশু তিনি আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন। নতুবা প্রাণী হবার দৃষ্টিকোণে পশু ও আপনি সমান্তরাল ছিলেন। আপনার মধ্যেও প্রাণ আছে, তার মধ্যেও প্রাণ আছে। কাজেই আপনি যদি তাকে ভক্ষণ করার অধিকার রাখেন তাহলে সেও আপনাকে ভক্ষণ করার অধিকার রাখবে না কেন? তার মধ্যেও শক্তি-সামর্থ আছে। বরং কোনো কোনো জানোয়ার তো আপনার চেয়েও শক্তিশালী। আল্লাহ পাক এই পশুগুলো আপনার অধীন করে দিয়েছেন। এমন অধীন করেছেন যে, আপনি তার বংশধরের পর বংশধরকে খেয়ে সাবাড় করে চলেছেন। কিন্তু এই জানোয়ারগুলো আপনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠেনি কোনদিনও। বলেনি, এরা আমাদের কয়েক প্রজন্ম উদরে ঢুকিয়েছে। শুধু কী তাই! এই জানোয়ারগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন যাতে আপনারা গোশত অর্জন করতে চাইলে সহজে-সুলভে গোশত পেতে পারেন।

তরকারী ও ফল কোত্থেকে এল?

অন্যদিকে তৃণলতা ও তরকারী দেখুন! আপনি বেশির চে বেশি এতটুকু করেছেন যে, যমীনে বীজ বপন করেছেন। কিন্তু আপনার কী এই শক্তি ছিল বা আছে যে, ঐ বীজে অংকুর উদগত করাবেন? পরে ঐ অঙ্কুরকে চারায় রূপান্তরিত করবেন? সবশেষে চারা থেকে তরকারী? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই শস্যবীজে তিনি অঙ্কুর উদগম করালেন। সে অঙ্কুরও এমন স্পর্শকাতর যে, ছোট বাচ্চা এতে হাত

রাখতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু শক্ত মাটির বুক চিরে একে তিনি বের করেছেন। আল্লাহ পাকই তাঁর অপার কুদরত দ্বারা একে জমি থেকে বের করেছেন, দিচ্ছেন অঙ্কুর, হচ্ছে চারা। এই চারার উপর গোটা বিশ্বের সকল শক্তি ব্যয় হচ্ছে। এর উপর আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বায়ু প্রবাহ হচ্ছে। এর উপর সৌর রশ্মি পড়ছে, চন্দ্রকিরণ বিকিরিত হচ্ছে। এর দ্বারা তাদের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। পরে এই চারা থেকে তরকারী ও ফল হচ্ছে। এগুলো তুলে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। আপনি বাজারে যাচ্ছেন। সুতরাং এক গ্রাস খাবার যা আপনি খাচ্ছেন, গোটা প্রকৃতির অবদান কীভাবে এর পেছনে কার্যকরী তা ভেবে দেখেছেন কী? এ কথাই মাওলানা রূমীর কবিতায় ফুটে উঠেছে–

ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری

"রুটির টুকরা যা তুমি মুখে পুরেছ যদি তুমি চিন্তা কর তাহলে দেখতে পাবে যে, এতে মেঘ, বায়ু, চাঁদ, সূর্য সব শক্তি ব্যয় হয়ে তবেই কেবল তোমার মুখে লোকমা উঠছে।"

খাদ্যে স্বাদ এলো কোত্থেকে?

খাবার সামনে এলে আপনি বলছেন, বড্ড ভাল বাবুর্চি। বেশ মজাদার একটা খাবার রান্না করেছে। খাবার রান্নায় তার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু সামান্য ভাবলে দেখা যাবে, খাবার রান্নার পদ্ধতি সে মায়ের পেট থেকে শিখে আসেনি। বাবুর্চি এই নিয়ম কোত্থেকে শিখল? একটি জিনিস সে এক নিয়মে পাকাচ্ছে। আরেকজনে আরেক নিয়মে রান্না করছে। এক লোক এতে এক ধরনের স্বাদ আনছে, অপরজন আরেক ধরনের। কে সেই সত্ত্বা, যিনি মানুষের মেধা-মননে খাবার রান্না করার বিচিত্র পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, এভাবে রান্না করলে স্বাদ বেশী। খানা খাওয়ার সময় যদি কেউ এটি চিন্তা করে তাহলে সেখানেও আল্লাহ তাআলার (কুদরতি) ঝলক দেখতে পাবে এবং এর দ্বারা আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।

এই গ্লাসের পানি কোত্থেকে এলো?

যখন পানি পান করেন তখন কী একটু ভেবে দেখেছেন, গ্লাসভর্তি এই পানি কোত্থেকে এল? কীভাবে আল্লাহ তাআলা সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠিয়েছেন। যতক্ষণ

এটি সমুদ্রে ছিল ততক্ষণ এই পানি লবণাক্ত ও ক্ষার ছিল। পান করতে চাইলেও এ কারণে পারতেন না। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত রাখার কারণ লাখো প্রাণী এখানে মারা যায়, যদি সমুদ্রের পানি লবণাক্ত না হয় তাহলে পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ পাক পানিকে লবণাক্ত করেছেন। কিন্তু আপনাকে পান করানোর জন্য আল্লাহ পাক পানিকে বৃষ্টিবাহী মেঘের আদলে উঠিয়ে কুদরতি মেশিনে এর লবণাক্ততা ও তিক্ততাকে সমুদ্রে রেখে সুপেয় করে তুলে এনেছেন।

আপনি পানির ভাণ্ডার জমাতে পারতেন?

এরপর যদি আল্লাহ তাআলা বলতেন, দেখো, আমি সমুদ্র থেকে মেঘ ওঠাচ্ছি। সেটি তোমাদের বৃষ্টি দিচ্ছে। সুতরাং তোমরা ছ' মাসের জন্য পানি স্টক করে রাখো। ছ'মাস পরে আবার বৃষ্টি হবে। তোমরা নিজ দায়িত্বে পানি হেফাযত কর। মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল কী ছ'মাস পানি স্টক করার? না। যেহেতু এটি মানুষের সাধ্যাতীত। এজন্য আল্লাহ তাআলা নিজ দায়িত্বে হেফাযত করেন। ইরশাদ হচ্ছে–

فَأَسْكَنّٰهُ فِى الْأَرْضِ

অর্থাৎ, এই পানি মেঘরূপে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সমুদ্র থেকে উঠিয়ে পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে যাই। যখন পাহাড়ে বৃষ্টি বর্ষণ হয় তখন ওখানে খোদাপ্রদত্ত অটো ফ্রিজ কায়েম করে দেওয়া হয়। সুতরাং এই পানি বরফের আকার ধারণ করে পাহাড়ে জমায়েত হয়। তোমাদেরকে স্টক করার মত কষ্ট দেইনি।

আর আপনি চিন্তাও করেননি

এরপর যদি আপনাকে বলা হত, পাহাড়ের ওপর আমি স্টক করে দিয়েছি, যাও ওখানে গিয়ে পানি সংগ্রহ কর, তাহলে কারই শক্তি ছিল না পাহাড় থেকে পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবাণীতে সূর্য রশ্মি দ্বারা এই বরফকে গলিয়ে দিয়ে থাকেন। পরে তা ঝর্ণা ও নদীর রূপ নেয়। নদীর মাধ্যমে পানি গোটা সৃষ্টিকূলের কাছে চলে যায়। পরে ভূগর্ভে পানির স্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আপনি জমিতে বোরিং করলে অবলীলায় পানি পেয়ে যান। এতগুলো মাধ্যমে আপনার গ্লাসে পানি উঠছে। আর আপনি ঢকঢক করে তা পান করে চলেছেন এবং তৃষ্ণা নিবারণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেননি কোত্থেকে আসছে এই পানি?

এই রঙ-বেরঙের ফুল কোত্থেকে এল?

অতএব আপনি সন্ধানী দৃষ্টি দিলে আল্লাহ তাআলার কুদরতি ঝলক যেমন পানির মাঝে দেখতে পাবেন, সেভাবে খাদ্য-খাবারে দেখতে পাবেন, গোটা

বিশ্বের সব কিছুতেই দেখতে পাবেন। যেমন আপনি বাগানে গেলেন। ওখানে নয়নাভিরাম ও দৃষ্টিনন্দন ফুল আপনার ভাল লাগল। মনে দাগ কাটল। চোখ তৃপ্ত হল। ব্যাস! এটুকুতেই কী শেষ! একটু আগ বাড়িয়ে চিন্তা করুন। ভাবুন, এই ফুল কোত্থেকে এসেছে? কোন সে সত্ত্বা, যিনি এ ফুলের মাঝে নান্দনিকতা সৃষ্টি করেছেন? জমি তো একটাই, পানিও এক, বীজও এক রকমের; কিন্তু যখনই এই বীজ যমীনে বপন করবেন, তখন এ থেকে রকমারী, বাহারী ফুল ফুটবে। ভিন্ন বীজ ভিন্ন ধরনের ফুল দিবে। এভাবে গোটা প্রকৃতিতে আল্লাহ্ পাক রকমারী পুষ্পের সমাহার করেছেন। কোন সে সত্ত্বা, যিনি ফুলের বোটা তৈরি করেছেন? পরে আরো চিন্তা করুন। যিনি এত সৌন্দর্যের স্রষ্টা, তিনি কত সুন্দর। মোটকথা, যা কিছু এ জগতে আছে, তা ওই সত্ত্বাই পয়দা করেছেন। তিনি এর মাঝে সৌন্দর্য-সুষমা দিয়েছেন। করেছেন দৃষ্টিনন্দন। এসব কিছুই তাঁর অবদান।

জনৈক গ্রাম্য লোকের কাহিনী

আমাদের পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) এই কথাটিকেই একটি উপমা দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, জনৈক গ্রাম্য লোক ছিল। সে কখনো রেলগাড়ী দেখেনি। প্রথমবার যখন সে রেলগাড়ী দেখে তখন সে বড্ড তাজ্জব হয় যে, এই বিশাল দেহকে কে নাড়াচ্ছে, কে চালাচ্ছে? একে যে চালাচ্ছে সে নিশ্চয়ই খুব শক্তিধর। সুতরাং সে স্টেশনে গেল। ওখানে রেলগাড়ী দাঁড়ানো ছিল। সে দেখল, রেল গাড়ীর গার্ড সবুজ পতাকা হাতে দণ্ডায়মান। সে যখন পতাকা নাড়ল রেল চলা শুরু করল। গ্রাম্য লোকটা ভাবল, বিশাল এই রেল গাড়ীকে এই সবুজ পতাকাই চালাচ্ছে। এর মাঝে নিশ্চয়ই অনেক বড় শক্তি আছে। সুতরাং গ্রাম্য লোকটা ঝাণ্ডার কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে পূজা শুরু করে দিল যে, তোমার মাঝে এত প্রচণ্ড শক্তি। তুমি এই বিশাল রেলগাড়ী টেনে নিচ্ছ।

ড্রাইভারের কাছে মস্তকাবনত

কেউ তাকে বলল, এ তুমি করছ কি, একটা ঝাণ্ডাকে পূজা করছ? গ্রাম্য লোকটি বলল, এই ঝাণ্ডা বৃহৎ এই রেলগাড়ী চালাচ্ছে এজন্য তার সামনে আমি মাথা নোয়াচ্ছি। কেউ বলল, ঝাণ্ডার তো কোন শক্তি নেই। এটি একটি প্রতীক মাত্র। মূলত: গাড়ী চালাচ্ছে ড্রাইভার। গাড়ীর ভেতরে থেকেই সে এ কাজটি সমাধা করে চলেছে। যাও ঐ যে, সামনে ইঞ্জিন ওখানে গিয়ে দেখো। সুতরাং গ্রাম্য লোকটা ইঞ্জিনের কাছে গেল। ড্রাইভার ঘটনাক্রমে ইঞ্জিনে বসা ছিল। গ্রাম্য লোকটা বলল, তুমিই কী এই গাড়ী চালাও? তাহলে আমার কুর্নিশ আর মাথা তোমার সামনেই নোয়ানো দরকার। সুতরাং ড্রাইভারের সামনে গ্রাম্য লোকটা মাথা নোয়াল, কুর্নিশ করলো। ড্রাইভার বলল, ভাই! আমি তোমার মতই একজন মানুষ। আমার মাঝে এমন শক্তি নেই যে, বিশাল এই রেলগাড়ী চালাতে পারি।

বরং ইঞ্জিনে যে বাষ্প দেখছ, এর মধ্যেই শক্তি আছে, এই বাষ্পই রেলগাড়ী চালাচ্ছে। গ্রাম্য লোকটা এবার বাষ্পকে কুর্নিশ করা শুরু করল, মাথা নোয়াল। এখানে কাহিনীর শেষ।

বাষ্প সৃষ্টিকারী কে?

আব্বা হযরত বর্ণনা করতেন, বাষ্প পর্যন্ত গিয়ে কাহিনী শেষ। এজন্য শেষ হলো যে, ঐ পতাকা নজরে আসছিল, ড্রাইভারকে চোখে দেখা যাচ্ছিল, ঐ বাষ্পও চোখে দেখা যাচ্ছিল। এজন্য সে কিছু একটা বুঝে এদের পালাক্রমে পূজা করেছে। কিন্তু গ্রাম্য লোকটি ভাবেনি, এই বাষ্প কোত্থেকে এলো? যা এই বিশাল রেলগাড়ীকে টেনে নিচ্ছে। তার জ্ঞান বাষ্প থেকে আর অগ্রসর হতে পারেনি। পরিণতিতে সে প্রকাশ্য উপকরণকে নিয়ামক শক্তি মনে করে এদেরকে পূজার আসনে বসিয়েছিল। যদি বাস্তবিকপক্ষে চিন্তা করে এক কদম অগ্রসর হত এবং ভাবত যে, এই বাষ্প কে তৈরি করেছে? তাহলে আল্লাহ তাআলার কুদরতের ঝলক দেখতে পেত। মোটকথা, বিশ্বের সব জিনিসের দিকে যখন বাস্তব দৃষ্টি ফেলে তাকানো হবে, তখন দেখা যাবে, এতে আল্লাহর কুদরত অবশ্যই কাজ করছে। তবে দেখার মত চোখ লাগবে আবার চিন্তা করার মত মন লাগবে।

ইমারতে আল্লাহর কুদরত

যেমন আপনি বহু শানদার এক বিল্ডিং দেখলেন। আপনি এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বিল্ডিংটি খুবই সুন্দর, সুউচ্চ ও দৃষ্টিনন্দন। কিন্তু এও ভাবুন, বিল্ডিংটি কী করে অস্তিত্বে এলো। প্রথমেই আপনার নজরে আসবে মিস্ত্রী। পরে ভাবতে পারেন, মিস্ত্রী এত সুন্দর বিল্ডিং বানায় কী করে? নিশ্চয়ই এর পেছনে 'আর্কিটেক্ট' আছে যে এই বিল্ডিংয়ের নকশা করেছে। সকলে বেশির বেশি 'আর্কিটেক্ট' পর্যন্ত গিয়েই থেমে যাবে। কিন্তু আরো আগে কদম বাড়ান। ভাবুন, আর্কিটেক্টারের মাথায় এই পরিকল্পনা কে ঢেলে দিয়েছেন? যদি ভাবেন তাহলে আল্লাহ তাআলার কুদরতের ঝলক দেখতে পাবেন।

সালেকের প্রতিটি কদমে আল্লাহর ঝলক

জনৈক কবি ছিলেন। তার নাম ছিলো মরহুম বাহযাদ লক্ষ্ণৌবি। আল্লাহ পাক তাঁর মাগফিরাত করুন। সুন্দর নাত লিখতেন। তার গযলের একটি চরণ এমন–

وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل

جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے

অর্থাৎ, যে মুসাফির প্রতিটি কদমে প্রতিটি ক্ষেত্রে, হে আল্লাহ! তোমার ঝলক দেখে না সে কেমন মুসাফির। সে কেমন পথিক। কেমন সালেক। প্রকৃত সালেক সে-ই, যার প্রতিটি কদমে আল্লাহ পাকের কুদরতের ঝলক নজরে আসবে।

জনাকীর্ণ মাহফিলে একাকী দেখি তোমায়

যখন এই চিন্তা বহু গুণে বেড়ে যায়, তখন নজরে আসতে থাকে যে, এই গোটা জগতে প্রকৃত ও আসল অস্তিত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের। অন্য সবকিছু তো তাঁর সৃষ্টি। তাঁর অনুগামী। তাঁর ওপর নির্ভরশীল। একেই বলা হয়, 'ওয়াহদাতুল উজুদ' 'একক অস্তিত্বশীল'। আপনারা 'ওয়াহদাতুল উজুদ' শব্দটি শুনে থাকবেন। এরও ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। এর কারণে মানুষেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তবে 'ওয়াহদাতুল উজুদে'র সঠিক অর্থ হলো, বিশ্ব চরাচরে, গোটা প্রকৃতিতে প্রকৃত অস্তিত্ব কেবল আল্লাহ তাআলার। এছাড়া আর কারোর নয়। সকলেই তাঁর সামনে নিথর ও শূন্যের মত। আমাদের হযরত খাজা মাজযূব (রহ.) একটি কবিতার মধ্যে 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এর পুরো অর্থ তুলে ধরেছেন–

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے

تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

আসমানের ওপর সারা রাত তারার মাহফিল জমে থাকে। হাজারো নয় লাখো সংখ্যক তারকা চমকায়। তারকার চমক ও দীপ্তি দেখা যায়। তারায় তারায় বেষ্টিত পুরো আসমান। আসমানে তারার দরবার সাজানো। কিন্তু সকালে যখন সূর্য ওঠে। এখনও উঠে পারেনি বরং ফর্সা হতে চলেছে। দিগন্তের নিচে কোন ভোরের ছটা ফুটে ওঠছে। ব্যাস সকল তারকা নিষ্প্রভ। ওই তারকারাজি কোথাও কী চলে যায়? না, মওজুদই থাকে। কিন্তু যখন সৌররশ্মি আসে, তখন গোটা তারকাকে নিষ্প্রভ করে ফেলে।

সকালে সূর্য উদয়ের সময় উদয়স্থল পরিষ্কার ছিল

এ কথাকেই গালিব মরহুম একটি কবিতায় এভাবে বলেছেন–

ہر ستارہ رات کو محفل میں محو لاپ تھا

صبح دم خورشید جب نکلا تو مطلع صاف تھا

অর্থাৎ, রাতে হাজারো তারকা ডিগবাজি মারছিল যে, আমার রোশনাই এতটা তীব্র। কিন্তু সকালে যাবৎ সূর্য উদিত হল, তখন আকাশ পরিষ্কার। ডিগবাজিধারী তারকারাজী গায়েব। কারো নিশানাটুকুও ছিল না। ব্যাস কেবল একটি সূর্যই নজরে আসছিল। এমনিভাবে যখন আল্লাহ তাআলার কুদরতের ঝিলিক-সূর্য উদিত হয়, তখন গোটা অস্তিত্বের তারকা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ব্যাস! এর নামই 'ওয়াহদাতুল উজুদ'।

প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর হুকুমের অধীন

মোটকথা, মানুষ যদি সামান্য চিন্তার অভ্যাস করে তোলে যে, যা কিছু দেখছি এর পেছনে কারো হাত থাকলেও মূলত: আসল নিয়ামক আল্লাহ তাআলা। সবই তাঁর কর্ম কুশলতা। এই একটি বিল্ডিং দেখুন, পাহাড় দেখুন, নদী বা সমুদ্রই দেখুন, মানবতৈরি বস্তু দেখুন। যেমন গাড়ীসমূহ দেখুন, প্রতিটি জিনিসের পেছনে আল্লাহ তাআলার কুদরতের ঝলক দেখতে পাবেন। দেখুন! আপনার সামনে উড়োজাহাজ উড়ছে। আপনি কেবল উড়োজাহাজই দেখেন, কিন্তু ভেতরকার প্যাসেঞ্জার আর পাইলটকে দেখতে পান না। কিন্তু কেউ এটি মনে করে না যে, এটি এমনিতেই উড়ছে। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মাত্রই বুঝে, কোন না কোন পাইলট, কোন না কোন মাধ্যম একে উড়াচ্ছে এবং এর ভেতরে যাত্রীও আছে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা যদি বাস্তবমুখী নজর দান করেন তাহলে দেখতে পাবেন, জগতে যতসব বস্তু যেখানে যে অবস্থায় স্ব-স্ব ঝলক দেখাচ্ছে বাস্তবিক পক্ষে এর সবকিছুই আল্লাহ তাআলার অনুগামী হয়ে ঝলক দেখাচ্ছে।

বাস্তবমুখী দৃষ্টি অর্জনের উপায় কী?

বাস্তবমুখী দৃষ্টি পয়দা হয় আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে। ভাল মজলিসে বসার দ্বারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত আছে, আল্লাহ তাআলার সাথে যাদের সম্পর্ক মজবুত তাঁদের সাথে উঠাবসা করার দ্বারা। তাদের কথা শোনার দ্বারা এমন দৃষ্টি পয়দা হয়। সাধারণ লোকেরা একটা জিনিস দেখে চলে যায়, কিন্তু যাদের আল্লাহওয়ালাদের সোহবত অর্জিত হয়, তারা যখন এসব জিনিস দেখে তদ্দারা আল্লাহ তাআলার মারেফাত হাসিল করে। হযরত থানভী (রহ.) বলেন: সালেকের প্রথম সবক হচ্ছে, যাই কিছু দেখো এবং যে নেয়ামতই তোমার সামনে আসে এর নেপথ্যে আল্লাহ তাআলার সুনিপুণ কর্ম কুশলতার মুরাকাবা করো। তাহলে ইনশাআল্লাহ প্রতিটি জিনিসেই তাঁর কুদরতের ঝিলিক দেখতে পাবে। আর এই জিনিস মশক দ্বারা হাসিল হয়। যত মশক করবে ততই আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি দান করবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকে এসব গুণ দান করুন। আমীন।

ঐ সত্ত্বা কেমন গুণের আধার হবেন?

হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

'যে বস্তুর সাথে কারো মহব্বত হবে। তাতে এই চিন্তা করবে যে, এই যোগ্যতা তার মাঝে এলো কোত্থেকে? (একথা স্বতসিদ্ধ কারো যোগ্যতার কারণেই মহব্বত আসে।) মুসলমানের অন্তর তাড়াতাড়িই জবাব দেবে যে, আল্লাহ তাআলাই এই যোগ্যতার স্রষ্টা। এক্ষণে অন্তরকেও এটি বুঝাতে হবে যে,

چہ باشد آں نگار خود کہ بندآں نگارھا

যিনি এমন এমন জিনিস পয়দা করেছেন– তিনি কেমন হবেন। সাথে সাথে ক্ষণস্থায়ী প্রিয়জনের ধ্বংস হওয়ার কথাও চিন্তা করবে। (আনফাসে ঈসা, পৃ. ২০০)

অবিনশ্বর সত্ত্বার সাথে মহব্বত কর

অর্থাৎ, দুনিয়ার যে লোকের সাথে কিংবা যে বস্তুর সাথে মহব্বত হচ্ছে, তা নিয়ে ভাবুন যে, বাহ্যত: এই বস্তুটি তো বড্ড ভালই লাগছে। কিন্তু একটা সময় আসতে যাচ্ছে, যখন এর সৌন্দর্য, এর সুষমা এবং এর পূর্ণতা ও যোগ্যতা সব ক্ষয় হয়ে যাবে। নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যে সত্ত্বার পূর্ণতা হামেশা বাকী থাকবে– সেই সত্ত্বাই এই পূর্ণতা দান করেছেন। সুতরাং মহব্বতের যোগ্য এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমূহ নয় বরং মহব্বতের আসল ও প্রকৃত যোগ্য আল্লাহ তাআলার সত্ত্বা যিনি এই গোটা সৌন্দর্যের স্রষ্টা, মরহুম ইকবাল বড় সুন্দর বলেছেন–

وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک

اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا

অর্থাৎ, যে ইশকের আগুন মৃত্যু ফুঁৎকারে দপ করে নিভে যায় যে, এদিকে মৃত্যু এলো তো ওদিকে গোটা ইশক ঢিলে হয়ে গেল। ঐ ইশকে প্রতীক্ষার উত্তাপের স্বাদ নেই। হ্যাঁ যে ইশক-অগ্নি কখনোই নির্বাপিত হয় না। মৃত্যুর ফুঁৎকারে নিভে যায় না, মৃত্যুও যাঁকে ছুঁতে পারে না– সেটি আল্লাহ তাআলার মহব্বত। এই ইশকই সব মুমিন, সব ইনসানের বেলায় মূখ্য ও কাম্য।

মৃতের সাথে প্রেম করো না

সামনে বলছেন, সাথে সাথে ক্ষণস্থায়ী প্রেমাস্পদ এর লয়-ক্ষয় হওয়ার কথা স্মরণ কর যে, এটা সামান্য কিছু দিনে ধ্বংস হয়ে মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবে। তার সৌন্দর্য-সুষমা সাময়িক আর আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণতা সত্ত্বাগত ও অবিনশ্বর।

عشق با مردہ نہ شد پائیدار
عشق را با حی و قیوم دار

অর্থাৎ, কোন মৃতের সাথে ইশক স্থায়ী হতে পারে না। হ্যাঁ চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর সত্ত্বার সাথে যে ইশক হবে তা অটুট থাকবে– কখনোই নিঃশেষিত হবে না।

আল্লাহর মহব্বতে মুসীবত সহজ হয়ে যায়

এক বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> "খোদার মহব্বতে আল্লাহওয়ালাগণের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তাদের কাছে তামাম মুসীবত সহজ হয়ে যায়। কয়েদখানায় তাদের তকলীফ হয় না। ক্ষুধায়ও কষ্ট হয় না– তাদের শান এই হয় যে, তাদের কিছুই থাকে না, তারপরেও তারা খুশি থাকে। কেননা একটি জিনিস তাদের কাছে এমন থাকে যে, এটি তাদের কাছে থাকা অবস্থায় অন্য জিনিসের পরওয়া থাকে না। তাহলো প্রেমাস্পদের কোল, প্রিয়ের সন্তুষ্টি, ইবাদতের স্বাদ, মুনাজাতের স্বাদ, স্বাদ নৈকট্যের।"
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ২০১)

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক যাকে মহব্বতের স্বাদ দান করেন তার উপর দুনিয়ার মুসীবতসমূহ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আসতে থাকলেও এগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এ কারণে তার মাঝে কোন উদ্বেগ থাকে না। সে তার স্থানে সটান থাকে। কেননা আল্লাহ পাক তার হৃদয়ে প্রেমের চেরাগ জ্বেলে দিয়েছেন, এর দরুণ সকল মুসীবতই সহজ হয়ে যায়– বাহ্যত: তার যতই কষ্ট অনুভব হোক না কেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক থাকে– এজন্য কখনই তার মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকে না।

হযরত আইয়ুব আ.-এর পরীক্ষা

হযরত আইয়ুব (আ.) কেমন অসুখে পড়েছিলেন এবং এই অসুখে তিনি আল্লাহর কাছে দুআও কামনা করেছিলেন। বলেছিলেন–

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (الانبياء : ٨٣)

'হে আল্লাহ! আমার মারাত্মক কষ্ট হচ্ছে। আপনি বড়ই দয়াশীল। দয়া করে আমার এই কষ্টকে দূর করে দিন। কিন্তু এই অসুখেও তাঁর মাঝে কোন উৎকণ্ঠা দেখা যায়নি। তাঁর নামে একটি সহীফা 'সহীফায়ে আইয়ুবী' নামে বাইবেলে মওজুদ আছে। এই সহীফায় তাঁর বিস্ময়কর অবস্থা ও সংলাপ বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন রোগ দেন, যা বস্তুত: একটি পরীক্ষা। এই রোগ কালে অতিরিক্ত পরীক্ষার জন্য তিনি তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতাকে মানবাকৃতি দিয়ে প্রেরণ করেন। ওই ফেরেশতাদ্বয় দৈনিকই তাঁর কাছে আসত এবং তাঁর সাথে কথা বলত। তাঁদের বক্তব্যের একটি উক্তি এমনো ছিল যে, তোমাকে এই যে কষ্ট দেয়া হচ্ছে এটি প্রভুর দরবার থেকে বঞ্চিত হবার আলামত এবং তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখার প্রয়াস। এজন্যই তোমার প্রতি এই মারাত্মক রোগ দেয়া হয়েছে।

এটিও আমার মাওলার পক্ষ থেকে

ফেরেশতার প্রতিটি কথার জবাবে হযরত আইয়ুব (আ.) বলেন, না না ব্যাপারটি এমন নয়, যখন আমি সুস্থ ছিলাম– তখন সেটি তাঁর মহানুভবতা ছিল। আজ যে অবস্থায় আছি এও তাঁর মহানুভবতা। তাঁর মহানুভবতার ঢং বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ওটি ছিল খুশির ঢং আর একটি হচ্ছে কষ্টের ঢং। ঐ খুশিও আমার মাওলা দিয়েছিলেন। আর এই কষ্টও আমার মাওলা দিচ্ছেন। পুরো সহীফাটি এ ধরণের সংলাপে ভরপুর। সহীফাটি পাঠ করলে বোঝা যায়, আল্লাহ পাক তাঁকে এই অবস্থায়ও কত প্রশান্তি ও আস্থা দান করেছিলেন। যখন তিনি অসুখে কষ্ট অনুভব করছিলেন। আল্লাহর সাথে তাঁর যে সম্পর্ক ও মহব্বত ছিল তা আরো মজবুত ও স্থিতিশীল হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি যেহেতু কমজোর, এজন্য তাঁর মহানুভবতা সইতে অক্ষম হচ্ছি। এজন্য দুআ করছি, আয় আল্লাহ! আমার থেকে এই কষ্ট দূর করে দিন। প্রকৃতপক্ষে এটিও তাঁর মহানুভবতার একটি রূপ। এই কষ্টের বদৌলতে তিনি আমার মর্যাদা আরো কত বৃদ্ধি করে দিবেন। এর বদৌলতে তিনি আমাকে কী কী পুরস্কার দান করবেন– জানা নেই তা।

এটিও রহমতের রূপ

এ কথাকে হযরত থানভী (রহ.) এভাবে বলেন যে, যখন আল্লাহ তাআলার মহব্বত নসীব হবে এবং তাতে এই উপলব্ধি হবে যে, আমি সর্বদা তাঁর মহব্বতের কোলে রয়েছি, তখন কষ্টের মধ্যে থেকেও কষ্ট অনুভূত হবে না। এর উদাহরণ এমন যে, যেমন আপনার কোন প্রিয় বন্ধু রয়েছেন। হঠাৎই তার সাথে আপনার দেখা হয়ে গেল। গলাগলি করার সময় সে আপনাকে প্রচণ্ড চাপ দিতে শুরু করল। তার দাবানো দ্বারা আপনার কষ্ট হতে লাগল– কিন্তু এই কষ্ট সুখের। কেননা এই কষ্ট আমার প্রিয়জন থেকে আসছে। আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে আসছে। এই অবস্থাই আল্লাহর নেক বান্দাদের হয়ে থাকে। যখনই তাঁর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এসে থাকে তখন সে উৎকণ্ঠিত ও অধৈর্য হয় না। বরং সে বোঝে, এও আমার মাওলার রহমতের একটি ধরন। তবে আমি যেহেতু দুর্বল, এজন্য এই রহমতকে বরদাশত করতে পারছি না। এজন্য তারা আল্লাহর কাছে এই দুআ করেন যে, হে আল্লাহ! এই কষ্টকে দূর করে দিন এবং সুস্থতার আদলে আমাকে রহমত দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মহব্বতের একটা হিস্যা আমাদেরকেও দান করুন। আমীন।

এক লোকের পত্র এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ

এক লোক নানা কষ্টে জর্জরিত ছিল। নানা ধরনের উৎকণ্ঠায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের অবস্থা মানব জীবনে কখনও এসেই থাকে। কখনও রোগ-বালাই, কখনও অর্থনৈতিক সংকট, কখনও রুটি-রুজির দৈন্যতা, কখনও পরিবার-পরিজনের অসুস্থতা ইত্যাদি। এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল এই লোকের বেলায়। ঐ লোক হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে পত্র লিখল যে, হযরত! ইদানিং আমার প্রতি নানা ধরনের রোগ, কষ্ট-মুসীবত এসে পড়েছে। কোন কোন সময় মনে হয়, আল্লাহর সাথে মহব্বতের কমতি হচ্ছে। যতক্ষণ নিয়ামত, শান্তি ও আরাম ছিল ততক্ষণ অন্তরে আল্লাহর মহব্বত অনুভূত হচ্ছিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সমস্ত নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন। কিন্তু যখন এই কষ্ট আসে তখন আল্লাহ পাকের মহব্বতে ঘাটতি অনুভূত হয়। আমাদের মত দুর্বল লোকদের বেলায় এই কষ্টের কারণে অভিযোগ-আপত্তি পয়দা হয়। কখনোবা অকৃতজ্ঞাজনিত শব্দ মুখ থেকে বেরোয়। মনে হয়, 'উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জন্য আমাকেই নির্বাচন করা হলো? আমার প্রতি এত কষ্ট কেন নেমে আসছে? ইত্যাদি। আল্লাহ পাক এ ধরনের না-শোকরি থেকে মুসলমানদেরকে হেফাযত করুন।

কষ্টের মুহূর্তের কিছু তাদবীর

হযরত থানভী (রহ.) ঐ লোকের চিঠির জবাবে কিছু তাদবীর লিখেন, যা আমাদের সকলের জন্য উপকারী। যখন কেউ কষ্টের সম্মুখীন হয়, কিংবা উৎকণ্ঠিত হয়, কোন ব্যথা লাগে, দুঃশ্চিন্তা আসে তখন কী তাদবীর অবলম্বন করবে? হযরত লিখেন–

> 'তাওবা ও ইস্তিগফার করো, দৈনিক কমপক্ষে পাঁচশ বার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম' অযীফা নির্ধারণ করে নাও। এক সপ্তাহের মধ্যে এই মুসীবত দূর হয়ে যাবে। কেননা হাদীসে এসেছে–
>
> لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ، وَدَوَاءٌ تِسْعِيْنَ دَاءً أَيْسَرُهُ الْهَمُّ
>
> অর্থাৎ, লা-হাওলা বাক্যটি জান্নাতের একটি গুপ্ত ভাণ্ডার। এটি নব্বইটি রোগের ঔষধ। যার সর্বনিম্নটি হলো, উৎকণ্ঠা ও পেরেশানী দূর করা। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। এছাড়া অন্য সব থেকে সম্পর্কোচ্ছেদ কর। কেননা কষ্ট-শান্তি সবই তাঁর হাতে। তাঁকে রাজী কর। ইনশাআল্লাহ সকল মুসীবত দূর হয়ে যাবে।
>
> اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ، اَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (النمل : ٦٢)
>
> "বলো তো! কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং লোকদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কী? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর।" (সূরা নামল : ৬২); (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ২০২)

পয়লা তাদবীর, তাওবা-ইস্তিগফার

১. পয়লা তাদবীর এই বাণীতে বলা হয়েছে, "তাওবা ও ইস্তিগফার করো। অর্থাৎ, যখন মানুষের উপর কোন মুসীবত কোন উৎকণ্ঠা আসবে তখন এই সময় মানুষকে ইস্তিগফারের প্রতি ধাবিত হতে হবে। কেন? এজন্য যে, কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

مَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ (الشورى ٣٠)

অর্থাৎ, দুনিয়াতে তোমাদের যে মুসীবত আসে, তা তোমাদের কোন আমলের কারণেই আসে। কোন গোনাহ হয়েছে, নাফরমানী হয়েছে, যদ্দরুণ দুনিয়াতে কষ্ট আসে। সুতরাং যখনই কোন কষ্ট আসে তখন বুঝে নাও, এ আমার কোন গোনাহের পরিণতি। এজন্য প্রথম কাজ তো এই যে, তাওবা-ইস্তিগফার করো যে, হে আল্লাহ! আমি তাওবা-ইস্তিগফার করছি। যা কিছু গোনাহ আমার হয়েছে, যা আমার বুঝে এসেছে আর যা আসেনি– সবকিছুর জন্যই আপনার সমীপে মাফ চাই। এটি পয়লা তাদবীর।

দ্বিতীয় তাদবীর– 'লা-হাওলা' পড়া

দ্বিতীয় তাদবীর এই বয়ান করেন যে, দৈনিক কমপক্ষে ৫০০ বার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম' অযীফা নির্ধারণ করে নাও। কেননা হাদীসে এসেছে এই বাক্যটি জান্নাতের খাযানাসমূহের একটি। অপর একটি কথা এই হাদীসে এসেছে, এটি নব্বইটি রোগের ঔষধ। তন্মধ্যে সবচেয়ে হালকা রোগ যা এর দ্বারা দূর হয় তাহলো, চিন্তা-উদ্বেগ দূর করে। যদি কারো চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা আসে, তাহলে এটি ঐগুলোর মধ্যে সবচে' হালকা রোগ। যার চিকিৎসা এই বাক্য, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।' সুতরাং চিন্তা ও উৎকণ্ঠা রোগে পড়লে ৫০০ বার এই বাক্য পড়াই তার চিকিৎসা।

'লা-হাওলা' জান্নাতের একটি ভাণ্ডার

মানুষেরা সাধারণত: মনে করে যে, এই বাক্যটি শয়তানকে দূর করার তরীকা। এ কারণে এই বাক্যের মুল্যায়ন হয় না। এ বাক্যের মূল্যায়ন ও প্রভাব কে অনুভব করতে পারে, যখন স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– এটি জান্নাতের একটি ধন-ভাণ্ডার। জান্নাতই যখন 'কল্পনা করা যায় না' তখন এর ভাণ্ডারের কল্পনা কীভাবে করা যাবে। কিন্তু এই বাক্যের বিশাল গুণাবলী রয়েছে। যখন (তাসাওউফের পথে) প্রথম দিককার মুরীদদেরকে তাসবীহ দেওয়া হয় তখন এটিও এক তাসবীহ পড়তে বলা হয়।

এই বাক্যের অর্থ ও মর্ম

এই বাক্যের অর্থ ও মর্ম কী? বাক্যটির দুটি অর্থ ও মর্ম হতে পারে। উভয়টিই সহীহ। একটি অর্থ এই যে, আল্লাহ ছাড়া কারো শক্তি নেই, কোন সামর্থ নেই।

যিনি সুউচ্চ তাঁর মত সুউচ্চে আর কেউ নেই। যত শক্তি ও সামর্থ আছে তা এই সুউচ্চ ও বিশাল এর মাঝে নিহিত। এ অর্থের আলোকে বলা যায়, যে ব্যক্তি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এই বাক্য পড়বে সে চিন্তা করেই পড়বে যে, আমার যে উৎকণ্ঠা আছে তা আল্লাহর ইচ্ছায় আছে, এ জগতের কারো শক্তি ও সাধ্য নাই তা আমার থেকে দূর করার। পরে এই চিন্তা করে দ্বিতীয়বার পড়ুন– তাঁর ইচ্ছায় যখন এই উৎকণ্ঠা, তখন এটি তাঁর ইচ্ছা ছাড়া দূর হবার নয়। কাজেই তিনিই দূর করবেন। জগতের কারো মাঝে এই শক্তি নেই যে, আমার কষ্ট দূর করে। যদি কারো মাঝে দূর করার শক্তি থাকে তা আল্লাহ পাকের মাঝেই আছে।

পর্যালোচনার পরিবর্তে আল্লাহর সমীপে প্রত্যাবর্তন

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, আজকাল যখন কারো উৎকণ্ঠা আসে, চাই সেটি সামাজিক হোক, কিংবা ব্যক্তিগত, সাধারণত: তার কষ্টের নেপথ্যের পর্যালোচনা করে যে, অমুক স্থানে এটি হয়েছে। অমুকে এতটা জুলুম করেছে। হযরত বলতেন, যে সময়টা তোমরা এই পর্যালোচনায় নষ্ট করো, সেই সময়টিতে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাবর্তন কর। বলো, হে আল্লাহ! এই উৎকণ্ঠা আছে আমার। তুমি তা দূর করে দাও। আমার যে ভুল-ত্রুটির কারণে এই উৎকণ্ঠা এসেছে হে আল্লাহ! আমাকে ঐ ভুল-ত্রুটির ইসলাহ করে দাও। এমনটি করলে ঐ দুআর সওয়াব তো পাবে। জানা নেই কার মুখ থেকে কোন দুআ আল্লাহ তাআলা কোন সময় কবুল করে বসেন। এর দ্বারা সকল উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাবে। এজন্য পর্যালোচনার স্থলে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা চাই।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে

যদি এই বাক্য 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম' অধিক হারে পড়া হয় এবং এই নিয়তে পড়া হয় যে, যা কিছু হচ্ছে তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। আর আল্লাহ ছাড়া এমন কেইবা আছে? যে একে দূর করতে পারে। কেউ নেই। যদি এই অঙ্গীকারের সাথে পড় তাহলে তার ফল এই হবে যে, এই উদ্বিগ্নতার ফলে মনে যে অস্থিরতা পয়দা হয়েছে তা দূর হয়ে যাবে। এজন্য হযরত বলেন, দৈনিক পাঁচশ বার পড়ো।

দ্বিতীয় অর্থ ও মর্ম

এই বাক্যের দ্বিতীয় অর্থ ও মর্ম হলো, কারো মাঝে কোন শক্তি-সামর্থ আল্লাহ ছাড়া হাসিল হয় না। সুতরাং হে আল্লাহ! এই উৎকণ্ঠাকে সহ্য করার

সূচিপত্র

শক্তি-সামর্থ্য দান কর– তবেই আমার তা হাসিল হবে। এটি ভেবে পড়লে ইনশাআল্লাহ উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাবে। শেষে হযরত বলেন, 'মোটকথা, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক কায়েম কর। তিনি ছাড়া সবার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর। কেননা শান্তি ও কষ্ট সবই তাঁর হাতে। তাঁকে রাজি করো। ইনশাআল্লাহ তিনি সব মুসীবত দূর করে দেবেন।

সারকথা

সংক্ষিপ্ত সার এই যে, উৎকণ্ঠাকালে হযরত তিনটি কথা বলেছেন।

এক. তাওবা ও ইস্তিগফারের আধিক্য।

দুই. লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা বেশি বেশি পড়া। কমপক্ষে দিনে ৫০০ বার পড়া।

তিন. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব।

এই তিনটি কাজ করতে পারলে আশা করা যায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূচিপত্র

বিরানব্বইতম মজলিস

ভয় ও আশা : উভয়টিই কাম্য

ভয় ও আশা : উভয়টিই কাম্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

গত রমযানে (১৪২১ হিজরী) 'আনফাসে ঈসা'-এর যে অংশের ব্যাখ্যা করেছিলাম, তা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও তাঁর সঙ্গে মুহাব্বত' সম্পর্কিত ছিল। আলহামদু লিল্লাহ, প্রয়োজনমাফিক এর ব্যাখ্যাও করে দেয়া হয়েছে। এক্ষণে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। যার শিরোনাম 'ভয় ও আশা'। এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.)-এর বাণী এখানে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহর রহমতে রমযান ১৪২২ হিজরীতে সেই অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি।

ঈমান আশা ও ভয়ের মাঝে

যে বাতেনী আখলাক ও আমাল মানুষের অর্জন করা জরুরী এবং মূখ্য তন্মধ্যে 'ভয় ও আশা'ও আছে। 'ভয়' বলতে আল্লাহর ভয়। কেননা মানুষের যদি আল্লাহর ভয় না থাকে তখন সে মানুষ গাফেল হয়ে যাবে এবং গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। 'আশা' বলতে মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয়ও থাকবে এবং আল্লাহর সত্ত্বার থেকে রহমতের আশাও রাখবে। দুটি জিনিস একত্রে থাকলে পরিপূর্ণ ঈমান হবে। হাদীস শরীফে আছে–

اَلْإِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

ঈমান 'ভয় ও আশার মাঝখানে'।

যদি এ দুটির মাঝে ভারসাম্য এসে যায় তাহলে ঈমান পূর্ণ হবে। আল্লাহকে যে পরিমাণ ভয় পাওয়া উচিত সে পরিমাণ পেতে হবে। এর চেয়ে বেশি কম নয়। এমনিভাবে আল্লাহর রহমত সম্পর্কে যতখানি আশান্বিত হওয়া দরকার– তাতেও বেশ-কম করবে না। এমনটি করলে মানুষের ঈমান পরিপূর্ণ হবে।

ভয় ও আশা উভয়টিই থাকা জরুরী

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, 'ভয় ও আশা' দুটি ডানা। যা দিয়ে সালেহীন দুনিয়া থেকে জান্নাতে উড়ে যায়। পাখি যেভাবে তার ডানা দ্বারা উড়ে যায় ঠিক সেভাবে। সুতরাং এ দুটিকে অর্জন করা জরুরী। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে এই জরুরতের দিকে ইশারা করা হয়েছে। ভয় সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا (السجده : ١٦)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর নেক বান্দা, তাঁদের পিঠ রাতের বেলা বিছানা থেকে পৃথক থাকে এবং আপনার প্রভুকে ঐ অবস্থায়ই ডাকতে থাকে যে, সে আল্লাহকে যেমন ভয় করে তেমনি তাঁর থেকে আশাও রাখে। (সূরা সাজদা : ১৬)

রহমতের আশা এবং জাহান্নামের ভয়

পুরো কুরআনে আপনি সন্ধানী দৃষ্টি দিলে দেখবেন, আল্লাহ পাক জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা পৃথক করেননি। বরং যেখানেই জান্নাতের আলোচনা করেছেন সেখানেই জাহান্নামের আলোচনা করেছেন। কোথাও এর ব্যতিক্রম নজরে পড়েনি আমার। এটি এজন্য করা হয়েছে যে, একবার জান্নাতের ঝলক দেখিয়ে রহমতের প্রতি আশাবাদী করবেন এবং অন্যদিকে জাহান্নামের ঝলক দেখিয়ে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ (الحجر : ٤٩-٥٠)

অর্থাৎ, আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন আমি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। মাগফিরাতকারী ও দয়াপরবশ। পাশাপাশি এও বলে দিন, আমার আযাবও বড় ভয়াল। দেখুন, দু'টি বিষয়ই পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। এক্ষণে রহমতের দাবি এই যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার রহমতের আশাবাদী হবে এবং তাঁর আযাবের দাবি এই যে, মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে। মানুষ যখন দু'টি জিনিস পাশাপাশি নিয়ে চলবে তখন তার ঈমান কামেল হবে।

কতটুকু ভয় থাকা উচিত

মানুষের উপর যদি শুধু ভয় চেপে বসে তাহলে এটিও খুব ভয়াবহ ব্যাপার। যদি কেবল ভয়ই তাকে ঘিরে ফেলে এবং আশা এর কোন কিছু না থাকে তবে এর পরিণতিতে জীবনকাল উজাড় হয়ে যাবে। হতাশা ও নিরাশা পয়দা হয়ে যাবে। সে মনে করবে আমার তো ঠিকানা নেই। এই হতাশা বড় মারাত্মক। এটি মানুষকে ধ্বংসের তীরে উপনীত করে। এজন্য যদি আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, তাঁর মহত্ব ও আযাবের মূল্যায়ন হৃদয়ে এসে যায়, প্রতি মুহূর্তে যদি এটি দিল-দেমাগে ছেয়ে থাকে তখন মানুষ পানাহার থেকে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম থেকে

বিরত থাকবে। এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে 'ভয়' চেয়েছেন কিন্তু কতটুকু? ইরশাদ হচ্ছে–

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

শুধু এই বলেন নাই যে, আমাকে ভয় দান করুন। বরং বলেছেন, হে আল্লাহ! এতটুকু ভয় দান করুন যা আমার ও আমার গোনাহের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টিকারী হয়। সাধারণ ভয় চাননি। কেননা যেসব লোকের প্রতি আল্লাহর সাধারণ ও ব্যাপক ভয় আপতিত হয়েছে এবং ভয় তার দিল-দেমাগে বাসা বেঁধেছে তার জীবনকাল উজাড় হয়ে গেছে। অপর দুআয় তিনি বলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِیْ عَنْ مَعَاصِيْكَ

"হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি এই পরিমাণ ভয় চাই যা আমাকে আপনার নাফরমানি থেকে বিরত রাখে। তিনি শর্তযুক্ত 'ভীতি' চেয়েছেন– এর চেয়ে বেশি নয়। কেননা অধিক ভীতি আপতিত হলে মানবজীবন বিরান হয়ে যাবে।

'ভয়' ও 'তাকওয়া'র মাঝে পার্থক্য

এখানে এই কথাটির বিশ্লেষণ করতে চাই যে, কুরআনুল কারীমের কিছু স্থানে 'তাকওয়া' শব্দ এসেছে, কোথাও এসেছে 'ভয়' শব্দটি। 'তাকওয়া' সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ (ال عمران : ١٠٢)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর মর্যাদা অনুযায়ী তাকওয়া অবলম্বন কর।

তবে 'ভয়' সম্পর্কে একথা বলা হয়নি যে, তাঁকে ভয় করার মত ভয় কর। এজন্য যে, তাকওয়া ও 'ভয়' এর মাঝে পার্থক্য বিরাজমান। 'ভয়' দ্বারা শুধু ভয় বুঝায় যদ্দারা মানুষ প্রভাবিত হয় এবং দিল-দেমাগকে এটি আড়ষ্ট করে ফেলে। এদিকে 'তাকওয়া' সাধারণ বা শুধু 'ভয়' এর নাম নয়। বরং 'তাকওয়া' ওই অবস্থার নাম, যা 'ভয়' এর পরিণতিতে পয়দা হয়। অর্থাৎ, এই চিন্তা হওয়া যে, যাকে আমার ভয় হচ্ছে আমি তাঁর মর্জির খেলাফ কিছু করব না। এই অবস্থার নাম 'তাকওয়া'। সুতরাং সাধারণ ভয় এবং 'ভয় এর ফলশ্রুতি' এক কথা নয়। সুতরাং এ 'ভয়' রাখা যে, আল্লাহ পাক মহাশক্তিশালী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আল্লাহর আযাব বড় কঠিন। তিনি জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন। এই কল্পনায় মনে যা সৃষ্টি হয় তার নাম 'ভয়'। আর এই ভয়ের কারণে যদি আপনি মিথ্যা পরিহার করেন– তাহলে এর নাম 'তাকওয়া'। এই ভয়ের কারণে যদি আপনি পরচর্চা ও বদ-নজরি থেকে বিরত থাকেন তাহলে এর নাম 'তাকওয়া'।

রহিত ও রহিতকারী

কতিপয় উলামায়ে কেরামের মতে, কুরআনুল কারীমের এই আয়াত–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

(ال عمران : ١٠٢)

রহিত (منسوخ) হয়ে গেছে। এ আয়াতকে রহিতকারী (ناسخ) আয়াত হচ্ছে–

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن : ١٦)

অর্থাৎ, প্রথমে হুকুম এসেছিল, আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর। এ হুকুম শুনে সাহাবায়ে কেরাম বড় উৎকণ্ঠিত হলেন যে, আল্লাহর হক কীভাবে আদায় করব? এতো সাধ্যাতীত। কাজেই তাকওয়া কীভাবে অর্জন করা যাবে? সাহাবায়ে কেরামের এই উদ্বেগের পর এ ফরমান রহিত হয়ে যায় এবং এই আয়াত নাযিল হয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن : ١٦)

অর্থাৎ, তোমাদের সাধ্য মোতাবেক আল্লাহকে ভয় কর। অতএব حَقَّ تُقَاتِهِ (ভয় করার মত ভয়) এর কোনও দাবি থাকল না।

প্রথম আয়াত দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীর

কিন্তু অপর কিছু আলেমের মতে, এই আয়াতদ্বয়কে 'রহিত' ও 'রহিতকারী' বলার দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে একটি আয়াত অপরটির ব্যাখ্যা মাত্র। অর্থাৎ, যখন একথা বলা হলো, আল্লাহর পদমর্যাদা বুঝে তাঁকে ভয় কর, তখন সাহাবায়ে কেরাম শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'তাকওয়ার' হক আমরা কীভাবে আদায় করতে পারি? তাদের এই আত্মজিজ্ঞাসার জবাবে আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করে বললেন, 'তাকওয়া'-এর হক ততখানি, যতখানি আদায় করার শক্তি তোমাদের মাঝে আছে। আমরা তোমাদের কাছে 'তাকওয়া'-এর বড় উঁচু স্তরের কিছু একটা চাইছি না। বরং حَقَّ تُقَاتِهِ এর মর্ম مَا اسْتَطَعْتُمْ এ-ই। কেননা আল্লাহ পাক কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا সুতরাং দ্বিতীয় আয়াতখানি প্রথম আয়াতের তাফসীর মাত্র।

এহইউয়াল উলূম গ্রন্থের 'ভয়' অধ্যায়

সংক্ষেপে বলা যায়, এতটুকু ভয় কাম্য নয় যাতে মানুষের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ের তাকওয়া কাম্য যে, সাধ্য মোতাবেক যতটুকু করা যায়। ইমাম গাযালী (রহ.)-এর এহইয়াউল উলূম' বড় শক্তিধর একখানা

কিতাব। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য থাকে। আমার আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) থেকে শুনেছি, ঐ কিতাবের 'ভয় অধ্যায়'টি এক বৈঠকে পুরা পড়া উচিত নয়। বরং বেশ কিছু মজলিসে অল্প অল্প করে পড়া উচিত। কেননা তা মজলিসে পুরোটা পড়ে শোনালে কোনো কোনো সময় ভয় এত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে, যা কাঙ্ক্ষিত 'ভয়' এর সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই কিতাব পড়ার দ্বারা বহু লোকের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তাদের দিল-দেমাগ উল্টে গেছে। তারা হতাশার নিঃসীম আঁধারে হারিয়ে গেছেন। এ পর্যন্ত 'ভয়' এর বিস্তারিত অবস্থা জানলেন।

ভারসাম্যপূর্ণ 'আশা' কাম্য

দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, 'আশা'। যার মর্ম হচ্ছে, আল্লাহর রহমতের প্রতি আস্থা রাখা। তবে এই 'আশা'-তেও স্বাভাবিকতা থাকতে হবে। 'আশা' যদি ভারসাম্যপূর্ণ না হয় তবে সেটা হবে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা। 'আশা' স্বাভাবিকতা কখন ছাড়িয়ে যায়? এ ব্যাপারে একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوٰى هَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ, অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে তার কু-প্রবৃত্তির পেছনে পড়ে থাকে। তার নফস যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যায়। গোনাহ্ করতে কখনোই খটকা লাগে না। গোনাহ থেকে বাঁচার কোনই গুরুত্বানুভব করে না। অন্তরে যে খাহেশ পয়দা হয় তদানুযায়ী আমল করে। হালাল-হারাম এক করে ফেলে। এর পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার প্রতি আশা করেও বসে থাকে। যখন তাকে বলা হয়, এ কাজ নাজায়েয তখন সে বলে, আল্লাহ গাফুরুর রাহীম। এ লোক 'গাফুরুর রাহীম' নিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছে– একে 'আশা' বলে না। কেননা 'আশা' যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তা আত্মম্ভরিতা ও ধোঁকায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং 'আশা'কে তার সীমায় রাখতে হবে। নতুবা সেটি 'হতাশা' ও 'নিরাশা'য় রূপান্তরিত হবে। উভয়কে স্ব-স্ব সীমায় রেখে চলতে হবে।

উভয়টির সীমা কীভাবে বুঝা যাবে?

প্রশ্ন হয়, উভয়টি স্ব-স্ব সীমায় রেখে কীভাবে চলবে? কে বলবে যে, 'ভয়' তার সীমায় রয়েছে এবং 'আশা' তার সীমায় রয়েছে? কে বলবে, তোমার ভয়ের উদ্দিষ্ট স্তর হাসিল হয়ে গেছে এবং 'আশা'-এর উদ্দিষ্ট স্তরও হাসিল হয়েছে? এই খবর নেওয়ার জন্যই 'তাসাওউফ' দুনিয়াতে এসেছে। পীর-মুরিদীর কাজ এ জন্যই। শায়খের কাছে রুজু এজন্যই করতে হয়। শায়খই বলবেন, তোমার 'ভয়' এর স্তর হাসিল হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক তোমাকে এটি দান করেছেন। আর তুমি সীমার মধ্যেই আছ। যদি কেউ সীমার মধ্যে না থাকে তাহলে শায়খ

সূচিপত্র

তাকে ইসলাহ করে সীমায় নিয়ে আসবেন। তাসাওউফের উদ্দেশ্য এবং কোনো শায়খের কাছে রুজু করার মূখ্য উদ্দেশ্য এটিই। আজকাল তাসাওউফ বলতে এই বুঝা হয় যে, শায়খ কিছু তাসবীহ-তাহলীল দিবেন যে, সকাল-সন্ধ্যা এগুলো আমল করো। মনে রাখতে হবে ইসলাহের ক্ষেত্র তাসবীহ-তাহলীল সহযোগী বটে তবে মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। শায়খ ছাড়াই ঘরে বসেই আপনি তাসবীহ আদায় করতে পারেন। কাজেই তাসাওউফ ও শায়খের সাথে সম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্য হল, মানুষের মাঝে যেন 'আধ্যাত্মিক গুণাবলী' পয়দা হয়ে যায় এবং যে সকল কর্ম থেকে বিরত থাকা দরকার তা থেকে যেন বিরত থাকতে পারে। মোটকথা, হযরত থানভী (রহ.) এ অধ্যায়ে 'ভয়' ও 'আশা' উভয়টিই বর্ণনা করেছেন। যাতে আমরা উভয়টির মাঝামাঝি জীবনযাপন করতে পারি।

হতাশ ও নিরাশ হওয়া জায়েয নেই

এক বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'ভগ্নোৎসাহ হওয়া যৌক্তিক কারণেই নিন্দিত। যদি এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আমার প্রতি কখনোই রহমত বর্ষিত হবে না কিংবা আমার বর্তমান অবস্থা এমন নয় যে, আমার প্রতি রহমত বর্ষিত হতে পারে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ২০৪)

যদি কারো মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল হয় যে, আমার প্রতি কখনোই আল্লাহর রহমত হবে না তবে এর নাম 'নিরাশা'। এরই অপর নাম 'হতাশা'। এটি নিন্দিত। কোনও মুমিনের জন্য এই 'হতাশা' জায়েয নয়। এমনটি হওয়া উচিতও নয়। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (الزمر : ٥٣)

অর্থাৎ, হে আমার বান্দারা! যারা আত্মার প্রতি অশেষ জুলুম করেছ, বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা কখনই আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সব গোনাহ মাফ করে দেবেন। তোমাদের গোনাহ যতটা হোক না কেন। বড় বড় গোনাহ করলেও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তাআলার রহমত এমন যে, চাই তোমরা যত বড় গোনাহই করে থাকো না কেন যদি সাচ্চা দিলে একবার তাওবা করে বল, 'আস্তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যানবিও ওয়া আতুবু ইলাইহি' ইনশাআল্লাহ ঐ মুহূর্তেই তোমাকে সব গোনাহ থেকে মুক্তি দান করা হবে। এতে কোন দ্বিধা-সংশয় নেই। সুতরাং এমন মুসলমানের অন্তরে হতাশা আসবে কেন?

সূচিপত্র

আল্লাহর প্রতি যার আস্থা, উদ্বেগ কিসে তার?

হতাশা সে ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যার বেলায় এমন কোন ওয়াদা-অঙ্গীকার নেই। যাকে আল্লাহ পাক এমন রাস্তা না বাতলে দেন 'ভগ্নোৎসাহ' হওয়া তার সাজে। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন–

'আমি তোমার জন্য তাওবার দরোজা উম্মুক্ত রেখেছি। আমৃত্যু উম্মুক্তই থাকছে– এরপরও হতাশা কেন? আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন–

'যার আল্লাহ আছে তার আবার হতাশা কিসের?'

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন এই ওয়াদা করেছেন এবং তরীকাও বাতলে দিয়েছেন– তখন আবার উৎকণ্ঠা কিসের? কিসের হতাশা? গোনাহের ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠিত হওয়া মাত্রই আল্লাহর দিকে রুজু কর। তাওবা করো, ইস্তিগফার করো। ভবিষ্যতে এ ধরনের গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির কর। তবে নিজের গোনাহের মুরাকাবা কখনো করো না যে, আমি অমুক গোনাহ করেছি। আমি অমুক গোনাহ করেছি। অমুক গোনাহ করেছি। আরে যে পরিমাণ সময় এই মুরাকাবায় কাটাবে সেই পরিমাণ সময় আল্লাহর যিকির ও সুবহানাল্লাহ পড়ার মাঝে ব্যয় কর এবং তাওবা করো যে, হে আল্লাহ! আমি যা কিছু গোনাহ করেছি; আমি এর আত্মস্বীকৃতি দিচ্ছি। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনার রহমত খুবই প্রশস্ত। আপনার রহমতের প্রতি আশা রেখে তাওবা করছি, করছি ইস্তিগফার। সুতরাং আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না যে, আমি বিতাড়িত। আমি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে। আল্লাহর রহমত আমার প্রতি হতেই পারে না। এসব শয়তানী ধারণা।

হতাশা প্রবল হওয়ার পরিণতি

কোন কোন সময় হালতের প্রাবল্যের পরিণতিতে, 'ভয়' বা 'হতাশা' মানুষের মাঝে প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রাবল্য বড় খারাপ জিনিস। এজন্য এর পরিণতিতে মানুষ 'কবজে' (قبض) এর শিকার হয় অর্থাৎ, ইবাদতে দিল লাগে না। তাওবার দিকে ধাবিত হয় না। দেমাগে এই খেয়াল সওয়ার হয় যে, আমি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে। এসব ক্ষেত্রে শায়খের দরকার পড়ে। প্রজ্ঞার সাথে কাজ করতে হয়। জনৈক বুযুর্গের এক মুরীদ ছিল। তার উপর (قبض)-এর অবস্থা জারী হল। দেমাগে এই খেয়াল চাপল যে, আমি শয়তান। আর শয়তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো, সে জাহান্নামী। এজন্য আমার জাহান্নামী হওয়া অবধারিত। এজন্য যার সাথে তার সাক্ষাৎ হত তাকে বলত, আমি শয়তান। শায়খ খবর পেয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, কী হয়েছে তোমার? বলল, আমি শয়তান হয়ে গেছি। আল্লাহর রহমত থেকে দূর হয়ে গেছি। জাহান্নাম ছাড়া আমার কোন ঠিকানা নেই। শায়খ তাকে বললেন, বলো, শয়তান কার সৃষ্টি? আরে শয়তান তো তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই তো শয়তানকে পয়দা

করেছেন। তাই ভয় করো কেন? একথা শুনে তার আচ্ছন্নতা কেটে গেল। আল্লাহ তার কবজের হালত দূর করে দিলেন। মোটকথা, চিকিৎসার জন্যও শাইখকে দেখতে হবে যে, বর্তমানে তার জন্য কোন চিকিৎসাটি ফলপ্রদ হবে। এজন্য হযরত বলেন, 'আমার প্রতি কখনোই রহমত আসবে না' এ বিশ্বাসই হতাশা। এটি নিন্দনীয়। এ থেকে বাঁচতে হবে।

হতাশা কীভাবে পয়দা হয়

এই হতাশা এভাবে পয়দা হয় যে, যে সমস্ত আমল করার তাওফীক আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, ওগুলোর প্রতি ক্রমশ: অবমূল্যায়ন থেকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়। প্রায়ই আমাদের যবানে এমন কথা জারী হয় যে, আমাদের নামায আর কি? এতো (মোরগের) ঠোকর মারা। সময় ব্যয় করা। এসবই অবমূল্যায়নজনিত কথা। এই অবমূল্যায়ন করতে নেই। আমাদের হযরত ডাক্তার ছাহেব বলতেন, আরে ভাই! এই ইবাদত আদায় করতে পারার দরুণ প্রথমে শোকর আদায় করে নাও। কত লোকই না আছে যারা এতটুকু ইবাদতও করতে পারছে না। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন এতটুকু ইবাদত করার তাওফীক দিয়েছেন, আগেভাগে তাঁর শোকর আদায় করে নাও। বলো, হে আল্লাহ! আপনার তাওফীক এবং আপনার ফযল ও করমে আমি ইচ্ছা করার শক্তি অর্জন করেছি। আপনিই আমাকে মসজিদে নিয়ে এসেছেন। আমার দ্বারা নামায আদায় করিয়েছেন। হে আল্লাহ! আপনার শোকর আদায় করছি।

নামাযের পরে ইস্তিগফার করো

শোকর আদায় করার পর এই বলো, হে আল্লাহ! আমার থেকে এই নামায সঠিকভাবে পড়া হয়নি। নামাযের মধ্যে কমতি রয়ে গেছে। এর জন্য ইস্তিগফার করছি। সুতরাং নামায পড়ার পর 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়, এর পাশাপাশি 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলো। এরপরে আপনার নামাযের অবমূল্যায়ন করো না। কেননা এই অবমূল্যায়ন ক্রমশ: হতাশার সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত এই খেয়াল দাঁড়ায় যে, আমি যেই ইবাদতই করি না কেন, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এই ধরনের হতাশা থেকে বাঁচো। যতটুকু ইবাদত করার তাওফীক হয় ততটুকুর প্রতি তৃপ্ত থাকো এবং আল্লাহর শোকর আদায় কর। বলো, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

সুতরাং কোন নেক আমল করতে পারার জন্য 'শোকর' আর ভুল-ভ্রান্তির জন্য 'ইস্তেগফার' করতে থাকো। সারা জীবনই এমনটি করতে থাকো। এমনটি করলে ইনশাআল্লাহ হতাশার সৃষ্টি হবে না। আল্লাহ পাক আমাকে ও আপনাদেরকে এ সকল কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তিরানব্বইতম মজলিস

মানুষের ভয় আল্লাহর ভয়ের চেয়ে অধিক হওয়া

মানুষের ভয় আল্লাহর ভয়ের চেয়ে অধিক হওয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

মাখলূককে অতিরিক্ত ভয় করা

এক লোক হযরত থানভী (রহ.)কে পত্র মারফত জানাল যে, আমার এমন মনে হয় যে, আমার অন্তরে মাখলূকের ভয় সৃষ্টিকর্তার ভয়ের চেয়েও বেশি।' এই অবস্থা অধিকাংশ সময়ই হয়। খুব সম্ভব সকলেরই এমন হয়। যেমন: কারো থেকে একটি গোনাহ হল, এক্ষণে ঐ লোকের ভয় হয় যে, কোন মানুষ যদি গোনাহের ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে সেটি বড্ড শরম ও মানহানীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এখন স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে, মাখলূকের ভয় আল্লাহ তাআলার ভয়ের চেয়েও বেশি।

মাখলূকের ভয় বেশি হওয়ার দৃষ্টান্ত

যেমন দুনিয়ার মানুষের এই ভয় হয় যে, আমাকে কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে না ফেলে, কোন জালেম জুলুম না করে কিংবা পুলিশের ভয় আছে, জেলে যাবার ভয় আছে, উর্ধ্বতন অফিসারের ভয় আছে, ভয় আছে শত্রুরও। এ ধরনের ভয় যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তার দিল-দেমাগকে আড়ষ্ট করে ফেলে। কিন্তু যদি এই ভয় হয় যে, আমার থেকে গোনাহ হয়ে গেছে এজন্য আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে কিংবা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টিতে পড়তে হবে। এই ভয় দিল-দেমাগে (অতটা) আড়ষ্ট হয় না। যেমন যদি ঘরে ডাকাত প্রবেশ করে এবং

মাথায় পিস্তল রেখে বলে যে, পয়সা বের কর। তখন এই ডাকাতকে যতটা ভয় লাগে গোনাহ করার পরে আল্লাহকে অতটা ভয় লাগে না যে, আমাকে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে, আল্লাহ তাআলা আমাকে না আবার আযাব দেন। আমাকে না আবার জাহান্নামে প্রবেশ করান। এই ভয় হয় না। মোটকথা, ঐ লোক পত্রে জানাল, সৃষ্টিজীবের ভয় আমার মাঝে প্রবল সৃষ্টিকর্তার ভয়ের চেয়ে। ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ। কেননা, কুরআনে হুকুম দেওয়া হয়েছে– وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ আল্লাহ তাআলা মানুষের চেয়ে অধিক ভয় পাওয়ার যোগ্য। বাস্তবিক পক্ষেই প্রশ্নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। সুতরাং মাখলূককে আল্লাহর তুলনায় অধিক ভয় করলে ঈমানে কোন দুর্বলতা এসে যাবে না তো?

স্বাভাবিকভাবে মাখলূকের ভয় বেশি থাকা খারাপ কিছু না

এক্ষণে হযরত থানভী (রহ.)-এর জবাব শুনুন! তিনি জবাবে বলেন–

> 'মাখলূককে আল্লাহর তুলনায় সহজাত ও স্বাভাবিকভাবে বেশি ভয় পাওয়া নিন্দিত বিষয় না। কেননা এটি ক্ষমতা ও ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয়। তবে জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগতভাবে বেশি ভয় হওয়া অবশ্যই নিন্দিত।
>
> لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ (الحشر : ١٣)
>
> অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। –এরও একই সম্ভাবনা।
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ২০৪)

অর্থাৎ, প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষের মধ্যে মাখলূকের প্রতিই ভয় বেশি অনুভূত হয় এবং আল্লাহ তাআলার ভয় অনুভূত হয় কম এটি নিছক প্রকৃতিগত ব্যাপার। এটি মানুষের ইচ্ছার বাইরের ব্যাপার। সুতরাং আল্লাহ এ ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না।

হযরত উমর (রাযি.)-এর ভয় মানুষের মনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও বেশি

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অকৃত্রিমভাবে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় জানা গেল

হযরত উমর (রাযি.) আসছেন। তখন পর্দার বিধান নাযিল হয়নি। তাঁর আগমনবার্তা শুনে তাঁদের অকৃত্রিমতা দূর হয়ে গেল এবং তাঁদের স্বাভাবিক কথাবার্তা শুরু হলো। হযরত উমর (রাযি.) দরবারে এলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তাজ্জব ব্যাপার যে, তুমি আসার পূর্বে এঁরা সকলে অকৃত্রিমভাবে কথাবার্তা বলছিল। তোমার নাম শুনতেই তাঁরা চমকে ওঠল এবং শিষ্টাচারী হয়ে গেল।

হযরত উমর (রাযি.) উম্মত জননীদের লক্ষ্য করে বললেন–

اَیْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، اَتَهَبْنَنِیْ وَلَا تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“হে আত্মপীড়ক নারীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভয় করো না?

উম্মত জননীগণ বললেন–

نَعَمْ، اَنْتَ اَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“হ্যাঁ। এজন্য যে, তুমি আল্লাহর রাসূলের তুলনায় কঠোর, শক্ত, কর্কশ ভাষার অধিকারী।

এখানে দেখুন! উম্মত জননীদের ভয় হযরত উমর (রাযি.)-এর প্রতি অধিক রাসূলের তুলনায়। এটি প্রকৃতিগত। কেননা এটি ইচ্ছাধীন বিষয় নয়।

শয়তানের হযরত উমর (রাযি.)কে ভয় করা

একটি হাদীসে এসেছে যে, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে রাস্তা দিয়ে উমর যায় শয়তান ভয়ে ঐ রাস্তা দিয়ে যায় না। আব্বা হুযূর বলতেন, হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল যে, ব্যাপার কী, যে রাস্তায় হযরত উমর (রাযি.) চলেন সে রাস্তায় শয়তান যায় না? হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর বেলায় এমনটি ঘটে না। খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় এমনটি ঘটে না যে, তিনি যে রাস্তায় চলেন শয়তান সে রাস্তায় চলে না। তাহলে কী শয়তান হযরত উমর (রাযি.)কে ভয় পায় আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সিদ্দীকে আকবারকে ভয় পায় না? হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রথমে সরাসরি বা বিশ্লেষণধর্মী দিতেন না। প্রথমে তিনি রসিকতামূলক জবাব দিতেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। তিনি বললেন, ঐ বেকুফ (শয়তান)কেই জিজ্ঞাসা কর, সে এমনটি করত কেন? কেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভয় না করে হযরত উমর (রাযি.)কে ভয় করত?

কাউকে অধিক ভয় করা তার শ্রেষ্ঠত্বের দলিল নয়

এরপর তিনি বিশ্লেষণধর্মী জবাব দেন। প্রকৃতপক্ষে ভয়-ডরের ব্যাপারটি একান্তই প্রকৃতিগত। এর নানা উপকরণ হয়ে থাকে। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে বেশি ভয় করা তার শ্রেষ্ঠত্বের দলিল নয় যে, তার বড়ত্ব অন্তরে বেশি আছে। বরং ক্ষেত্র বিশেষে ঐ লোকের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য আছে যদ্দরুণ তার মনে অন্তরায় ও ভয় পয়দা হয়। একজন মানুষ যিনি অপর জনের তুলনায় নরম, তিনি শ্রেষ্ঠ ও বড়; যে কারণে লোকেরা তাঁর সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা বলে। তার কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারে। একটুও দ্বিধা করে না। এজন্য তার মনে ভয় জাগে না। সুতরাং কাউকে অধিক ভয় করা তার শ্রেষ্ঠ ও বড় হওয়ার দলিল না। শয়তান যদি হযরত ওমর (রাযি.)কে অধিক ভয় করে এটি তার প্রকৃতিগত ব্যাপার। এর দ্বারা এটি প্রমাণ হয় না যে, হযরত উমর (রাযি.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বড় হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ), কিংবা সিদ্দীকে আকবার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছেন। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) এই বাণীতে বলেন, মাখলূকের ভয় আল্লাহর তুলনায় অন্তরে বেশি হওয়া নিন্দিত কিছু নয়। কেননা এটি ইচ্ছাধীন বিষয় নয়।

যৌক্তিক দৃষ্টিকোণে আল্লাহর ভয় বেশি হওয়া চাই

তিনি বলেন, 'যৌক্তিক ও বিশ্বাসগত দৃষ্টিকোণে অবশ্য নিন্দিত।' অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ভয় মাখলূকের তুলনায় অধিক হওয়া যৌক্তিক দৃষ্টিকোণের দাবি। প্রকৃতিগত (طبعا) ভাবে আল্লাহর ভয় বেশি হওয়া জরুরী নয়। এক্ষণে প্রশ্ন জাগে যে, যৌক্তিক দৃষ্টিকোণে আল্লাহর ভয় অধিক হওয়ার মর্ম কী? এর জবাব হলো, যখন মানুষ মনে মনে এই চিন্তা করে যে, আমি কি মাখলূক থেকে অধিক কষ্ট পাব, নাকি আল্লাহর আযাবে বেশি কষ্ট পাব? যখন এ দুটির মাঝে তারতম্য করবে তখন স্বত:ই তার সামনে সিদ্ধান্ত এসে যাবে যে, আল্লাহর আযাবই অধিক কষ্টদায়ক। সুতরাং আযাব থেকে বাঁচার চিন্তা অধিক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই কথাটি যদি মনে আসে তাহলে উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যাবে। এরপর প্রকৃতিগত দৃষ্টিকোণে যে অবস্থা দাঁড়ায়, যেমন ভয় পাওয়া, থমকে যাওয়া, স্তম্ভিত হওয়া, চিন্তায় পড়ে যাওয়া, দেমাগ ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া এগুলো সবই ক্ষমতা ও ইচ্ছাবহির্ভূত বিষয়। সুতরাং অনিচ্ছায় যদি মাখলূকের ভয় অধিক হয়ে যায় তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কী বিস্ময়কর কথা হযরত থানভী (রহ.) বলে দিলেন! কী ভয়াবহ সমস্যার জট নিরসন করলেন! কেননা অনেক সময় মানুষ যখন ভাবে,

আল্লাহর তুলনায় মাখলূককে আমার অধিক ভয় হচ্ছে, অতএব আমার ঈমানই খোয়া গেছে। হযরত থানভী এই সংশয় ও খুত-খুতিকে দূর করলেন।

মাখলূক ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য, আল্লাহ অতীন্দ্রীয়

সামনে তিনি আরো বিস্ময়কর কথা বলেছেন যে, কুরআনের এই আয়াত–

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ

এরও এই একই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, মাখলুকের ভয় আল্লাহর তুলনায় অধিক হওয়া বিশ্বাসগত (اعتقادا) দৃষ্টিকোণে নিন্দিত, প্রকৃতিগত (طبعا) দৃষ্টিকোণে নিন্দিত নয়। নিন্দিত না হওয়ার কারণ তিনটি। এক. মাখলূক ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য (محسوس), আর আল্লাহ তাআলা অতিন্দ্রীয় (غير محسوس)। অর্থাৎ, মাখলূককে চর্ম চোখে দেখা যায়। যেমন এক লোক পিস্তল তাক করে দণ্ডায়মান হওয়ায় তাকে দেখা যায়, দেখা যায় তার তাক করা পিস্তলটিও। এও দেখা যায়, তার পিস্তল থেকে বেরোনো গুলি যদি আমার গায়ে লাগে তাহলে মারা যাব। এদিকে আল্লাহ তাআলা সত্ত্বাগত দৃষ্টিকোণে কিংবা বাহ্যত: তিনি ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নন। তাঁকে চর্মচোখে দেখা যায় না। হাত দ্বারা ছোঁয়া যায় না। জাহান্নামের আযাব দেখা যায় না। মানব প্রকৃতিই এমন যে, বাহ্যত: যা সে দেখতে পায় দ্রুতই এর প্রতিক্রিয়া তার মাঝে হয়।

সুতরাং অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তুর প্রতি তার প্রতিক্রিয়াটা অধিক কার্যকরী; অতীন্দ্রীয় যে কোন কিছুর থেকে। যদিও মানুষ অতীন্দ্রীয় বিষয়াবলী স্বীকার করে কিন্তু প্রকৃতিতে সেটির প্রতিক্রিয়া অতটা হয় না যতটা হয় ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তুর বেলায়।

অদৃশ্যের মোকাবেলায় দৃশ্যের ভয় অধিক হয়ে থাকে

কিংবা যেমন কারো এই ভয় হলো যে, আগামীকাল আমার এই ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু একটি ঘটনা যা আজ কিছুক্ষণের মধ্যে তার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি। এই ঘটনার ভয়, ডর এবং এ থেকে বাঁচার চিন্তা ও বিভীষিকা খুব বেশি হবে, আগামীকালের আসন্ন ঘটনা তুলনায়। এজন্য যে, যে ঘটনা কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে তা অনুভূতিগ্রাহ্য। আর আগামীকাল যেটি আসতে যাচ্ছে সেটি অনুভূতিগ্রাহ্য নয়। এটি মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার। এজন্য আল্লাহর ওখানে ধরপাকড় হবে না যে, তোমাদের মাঝে সৃষ্টিজীবের ভয় কেন বেশি ছিল? কারণ, মানব প্রকৃতিই এমন যে, উপস্থিত জনের প্রতিক্রিয়া বেশি অনুপস্থিতের থেকে। যদিও অনুপস্থিত জনের মর্যাদা ও বড়ত্ব অন্তরে বেশি থাক না কেন।

মাখলূক থেকে ক্ষমার আশা কম

দ্বিতীয় কারণ এই যে, মাখলূক থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম, যা সৃষ্টিকর্তার বেলায় অধিক। কেননা মাখলূক বড় খারাপ জিনিস। এ কাউকে ক্ষমা করে না। যদি মাখলূকের সামনে এমন কোন ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, অমুকে গোনাহ করেছে তাহলে মাখলূক তাকে ক্ষমা করে না। বরং তার বদনাম হয় ও তাকে অপদস্থ করে। তাকে শাস্তি দেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। বান্দা গোনাহ করে। পাশাপাশি সে লজ্জাবোধও করে। ভাবে যে, আমার ব্যাপারটি আমার আল্লাহর সাথে। তিনি আমাকে মাফ করে দেবেন। এক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা মাখলূকের তুলনায় অধিক করা যায়। কেননা বান্দার সম্মুখে গোনাহ জাহির হওয়ার দ্বারা মানুষের মনে কম্পন শুরু হয়ে যায়।

জাহান্নামে যাওয়াকে মেনে নিবে

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, খাণিক এই কল্পনা কর যে, তুমি আল্লাহর দরবারে হাজির আছ। তাঁর কাছে দরখাস্ত করেছ, হে আল্লাহ! আমার থেকে যে গোনাহ হয়েছে তুমি তা মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা জবাবে বললেন, আমি তোমার গোনাহ মাফ করে দেব। জাহান্নাম থেকে মুক্তিও দেব, তবে এক শর্তে। তাহলো তোমার গোনাহের একটি ফিল্ম মানুষের সামনে চালাব। ঐ ফিল্মের ধারণ করা দৃশ্য তোমার বাবা, মা, বোন-ভাই, স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, বন্ধু-বান্ধব, শিষ্য-শাগরেদ, মুরীদ এবং ফিল্ম মাস্টার সকলে দেখার পরেই মাফ করব এবং তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেব। আল্লাহ তাআলা মাফ করার জন্য এই শর্ত আরোপ করলে কোন কোন বান্দা এমনও বলবে– আল্লাহ আমাকে কিছুদিনের জন্য জাহান্নামে প্রেরণ করুন, এটি আমার কাছে অনেক সহনীয় মানুষের সামনে ফিল্ম চালানোর চেয়ে। কেননা মানুষের সামনের লজ্জা মারাত্মক হয়ে থাকে। এজন্য যে সে জানে, মানুষের মন পাথুরে। তারা যদি আমার কোনও দুর্বলতা জেনে যায় তাহলে আমাকে ক্ষমা করবে না। আর আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা, মালিক। প্রকৃত বড়ত্বের মালিকও তিনি। কিন্তু তাঁর কাছে আমার আশা আছে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। তাঁর কাছে গোপনীয় কিছু নাই। সবকিছুই তাঁর সামনে।

মাখলূকের সামনে অপমান অসহনীয়

তৃতীয় কারণ এই যে, মাখলূকের সামনে অপদস্থতা অসহনীয়। আল্লাহর কাছে অপদস্থতা সহনীয়। কেননা মানুষের সম্মুখে কোন গোনাহ প্রকাশ পেলে অপদস্থ হতে হবে। তারা বলবে, লোকটা অসৎ, ফাসেক, বড় গোনাহগার, শঠ,

কপট। মাখলুকের সামনে অপদস্থতা সত্যিই অসহনীয়। অপর দিকে আল্লাহ তাআলার কাছে যদি ব্যাপারটি ধরা পড়ে যে, বান্দা বড্ড ফাসেক, মহাপাপী ও অন্যায়কারী- এটিও এক ধরনের অপদস্থতা। এই অপদস্থতা কাম্য। কেননা বান্দা খোদ আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আল্লাহ আমি মহাপাপী, অন্যায়কারী, আমার থেকে ভুল হয়ে গেছে। আমি আত্মস্বীকৃত অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করুন। সুত াং আল্লাহর সমীপে অপদস্থ হওয়াই কাম্য। আর মাখলূকের সামনে অপদস্থ হওয়া নিন্দনীয় ও অসহনীয়। এই অপমান শরীয়তসম্মতও নয়। হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

'হে আল্লাহ! আমাকে আমার নজরে ছোট করে দাও আর মানুষের চোখে বড় করে দাও। কেননা লোকের নজরে বড় হওয়া কাম্য- অপদস্থতা কাম্য নয়। অবশ্য আল্লাহ তাআলার কাছে অপদস্থ হওয়া প্রকৃতই কাম্য ও মূখ্য। এজন্য হযরত ফরমান, মাখলূকের ভয় বেশি হয় সৃষ্টিকর্তার তুলনায়, এটি ঈমানের দুর্বলতার পরিচয় নয়। ঘাবড়ানোরও কিছু নয়।

শায়খে কামেলই সঠিক সমাধান বলতে পারেন

এসব কথা শায়খে কামেলই বলতে পারেন। নতুবা কোন মামুলি লোকের সামনে যদি কেউ বলে যে, মাখলূকের ভয় আল্লাহর তুলনায় আমার মাঝে অধিক তাহলে সে তাকে কাফের বলে দেবে। বলে দেবে, চলে যাও আমার সম্মুখ থেকে। তুমি আল্লাহকে ভয় করো না? আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ (الاحزاب : ٣٧)

কিন্তু যারা নফসের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে প্রাজ্ঞ, তারা জানেন- ওরা মানুষ। আল্লাহ ওদের প্রকৃতির মাঝে কী কী রেখেছেন। বাস্তব অবস্থা কী এদের? সামান্য শব্দে এদের সব সমস্যা তারা সমাধান করে দিতে পারেন। সকল সংশয়-সন্দেহ দূর করে দেন। আল্লাহ হেফাযত করেন, এ এমন এক মাকাম যে, যদি এখানে পথ নির্দেশ বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক হয়ে যায় তাহলে মানুষ কুফরী ও নেফাকীতে পড়ে যাবে। হতাশার নিঃসীম আঁধারে হারিয়ে যাবে। ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়বে। শয়তানের হাতিয়ার হয়ে যাবে। কিন্তু শায়খে কামেল এসব কিছু উল্টে দেন এভাবে যে, সকল সংশয়, সন্দেহ, খুতখুতি দ্রুতই দূর হয়ে যায়। বাস্তব অবস্থা তিনি খুলে খুলে বাতলে দেন।

চিকিৎসার আরেক পদ্ধতি : তাসাববুরে শায়খ (শায়খের কল্পনা)

এই কারণেই আমাদের বুযুর্গরা আরেকটি তরিকা বাতলে দেন, যা নিয়ে অনেকের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। তাসাববুরে শায়খ (শায়খের কল্পনা) নামে একটি কথা আপনারা শুনে থাকবেন। এটি একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। মাশায়েখগণ মুরিদদেরকে এটি দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে থাকেন। তারা মুরিদদের বলেন, যখন তোমরা যিকির করবে তখন তোমার শায়খকে কল্পনা করবে। কোন গোনাহের চাহিদা অন্তরে এলে তখনও শায়খের কথা কল্পনা কর। এ কথায় অনেকে বলে ফেলেন, 'শায়খের কল্পনা' এটি 'শিরক'। এজন্য যে, যিকরুল্লাহ নিছক আল্লাহর উদ্দেশে হয়ে থাকে। কাজেই কল্পনাটিও আল্লাহর হওয়া চাই– শায়খের নয়।

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) এবং 'তাসাববুরে শায়খ'

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর শায়খ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) তাঁর এই মুরীদকে 'শায়খের কল্পনা' করতে বলেছিলেন। জবাবে শাহ ইসমাঈল বলেছিলেন, হযরত! যদি আপনি আমাকে গোনাহ করার অনুমতি দেন তো আমি এই খেয়ালে গোনাহ করতাম যে, পরে তাওবা করে নিব– কিন্তু এই আমল থেকে আমি 'শিরক'-এর গন্ধ পাচ্ছি। এজন্য আমি এ কাজ করতে পারব না। হযরত সাইয়েদ ছাহেব (রহ.) বলেন, যাও তোমার এটা করতে হবে না। দেখুন! এর মাঝে তিনি 'শিরকের' গন্ধ পেয়েছেন। অথচ এতে কোনই শিরক নাই। যেহেতু শাহ সাহেবের মধ্যে তাওহীদের প্রাবল্য ছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাওহীদের উপর ইস্পাত কঠিন দৃঢ় রেখেছিলেন, সে কারণেই তিনি একথা বলেছিলেন।

'শায়খের কল্পনা' এর উদ্দেশ্য একাগ্রতা অর্জন করা

কিন্তু কেউ কেউ 'শায়খের কল্পনা'কে 'শিরক' বলে দিয়েছেন। সত্যি বলতে কী, যারা তাসাওউফকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেন, তারা 'শায়খের কল্পনা'কে অবলম্বন করেই আপত্তি তোলেন। তারা বলেন, এই তাসাওউফ শিরকের তালীম দেয়। বাস্তবিক পক্ষে 'শায়খের কল্পনা' দ্বারা উদ্দেশ্য যিকিরে একাগ্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার খেয়াল এইজন্য অন্তরে জমে না যে, আল্লাহ পাকের সত্তা দেখা যায় না। মানুষ দেখা যায় এমন জিনিসের কল্পনার প্রতি একাগ্র হয়। নতুন মুরীদদের বেলায় তো বটেই। এজন্য সুফিয়ায়ে কেরাম একটি ব্যবস্থাপত্র দেন যে, তোমার শায়খের কল্পনা কর। পরবর্তীতে তাঁরা 'কল্পনা' দ্বারা একবার

একাগ্রতা হাসিল হয়ে গেলে সেটিকে আল্লাহ তাআলার দিকে ঘুরিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত যাকের আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়।

'মহিষের কল্পনা' দ্বারা চিকিৎসা

আমি আব্বা হুযুরের নিকট থেকে শুনেছি যে, জনৈক গ্রাম্য লোক কোন বুযুর্গের কাছে নিজ ইসলাহের জন্য গিয়েছিল, গ্রাম্য লোকটা তাঁকে বলেছিলো, হযরত! আমাকে মুরীদ করুন! বুযুর্গ তাঁকে মুরীদ করলেন। পরে সে বললো, আমার না যিকির মনে বদ্ধমূল হয়, আর না নামায। নামাযের নামে আমি কেবল ওঠাবসা করি। ঐ বুযুর্গ তাকে বললেন, দুনিয়ায় কোন বস্তুটি তোমার সর্বাধিক প্রিয়? গ্রাম্য লোকটি জবাব দিয়েছিল, আমার একটি মহিষ আছে। আমি একে খুব মুহাব্বত করি। বুযুর্গ বললেন, তাহলে দৈনিক রাতে কামরায় বসে এক ঘণ্টা পর্যন্ত ওই মহিষের কল্পনা কর। গ্রাম্য লোকটা বলল, আমি তো আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে এসেছিলাম। বুযুর্গ বললেন, যা বলছি তাই কর। সে পীর সাহেবের কথা মত কামরায় বসে গেলো এবং মহিষের কল্পনা করতে লাগলো। কিছু দিনের মধ্যেই তার দিল-দেমাগে মহিষ সওয়ার হয়ে গেল। মস্তিষ্কে মহিষ বাসা বাঁধল। তার কল্পনারমহিষ তাকে দুধ দিচ্ছিল, ঘোরাফেরা করছিল, গোসল করছিল। একবার পীর সাহেব তার কামরায় প্রবেশ করলেন। মুরীদ তার পীরকে বললেন, না না। এখন আপনি এখানে আসবেন না। এখানে মহিষ আছে। পীর সাহেব মুরিদের অবস্থা অবলোকন করে বললেন, ব্যাস! কাজ শেষ। মহিষের কল্পনাটি এবার আল্লাহ তাআলার দিকে ঘুরিয়ে দাও। এসব কিছু এজন্য করা হয়েছে, শুরুতেই মুরিদের পক্ষে আল্লাহর প্রতি ধ্যান আনা সম্ভব ছিল না। এজন্য যে, আল্লাহ পাক ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নন। এজন্য তার ধ্যানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি একাগ্র করে আল্লাহর দিকে ঘুরানো হয়েছে, যা তার জন্য খুব সহজও হয়েছে।

একাগ্রতার পরে মোড় ঘুরাও

এই 'শায়খের কল্পনা' যাবতীয় বস্তু থেকে ধ্যানকে একাগ্র ও একান্ত করার উদ্দেশ্যে করানো হয়। পরে আল্লাহ পাকের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আপত্তিকারীরা এই 'মহিষের কল্পনাকে'ও শিরক সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। 'শায়খের কল্পনা' তাদের মতে নিছক শিরকই। অথচ এটি মুরিদের ধ্যান-খেয়ালকে মুক্ত করার উদ্দেশে ছিল। উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা। যখন বিবেক একাগ্র ও একান্ত হয়ে গেল তখনই মোড় ঘুরানো হলো। এর মধ্যে এই বিষয়টি আদৌ নেই যে, মাখলূক ও খালেককে সমান্তরাল করা হচ্ছে। এটি নিছক একটি সাময়িক চিকিৎসা।

সূচিপত্র

কু-নজরের চিকিৎসা

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, যখনই অন্তরে কোন কু-নজরের খেয়াল চাপে তখন এই খেয়াল কর যে, এ সময় যদি আমার উস্তাদ আমার সামনে এসে যায়, বাবা এসে যান, সন্তান-সন্ততি এসে যায় এবং আমাকে এই অবস্থায় দেখে যে, আমি বেগানাকে দেখে স্বাদ অনুভব করছি তখন এরা আমাকে দেখে কী মনে করবে, এই কল্পনা করলে বদ নজরের রোগ উপশম হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহকে দেখার কল্পনা কেন করবে না

এক্ষণে প্রশ্ন হয়, গোনাহের কল্পনা আসার সময় উস্তাদের খেয়াল করবে, বাবা-সন্তানের খেয়াল করবে- কেন বললেন না যে, এই ভাববে যে, আল্লাহ দেখছেন? জবাব হলো, একথা আমরা জানি, আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেখছেন। তবে যেহেতু আল্লাহ তাআলার সত্ত্বা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নয়। এজন্য তাঁর কল্পনা দাঁড় করানো কঠিন। এজন্য এ পথের নয়া পথিকের জন্য সহজ হলো এমন কোন ব্যক্তির কল্পনা করানো যাকে দেখা যায়, ধরা যায়, ছোঁয়া যায় এবং যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এর মানে এই নয় যে, ওস্তাদ, বাবা ও সন্তান আল্লাহ তাআলার মোকাবেলায় সমান। এদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টির চেয়ে অনেক বেশি। এটি মতলব নয় কিছুতেই, বরং উদ্দেশ্য এই যে, এদের গোচরে এলে অপমান-অপদস্থতা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা। এরা কিছুতেই ব্যাপারটি ক্ষমা করবে না। বরং আল্লাহই ক্ষমা করতে পারেন এবং করেনও।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ও হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর সংলাপ

একবার হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) খাবার গ্রহণ করছিলেন। এ সময় হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাঁর কাছে এলেন। তিনি মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর বন্ধু ছিলেন। তাদের মাঝে খোশগল্পও হতো। তিনি এলে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) বললেন- ‘এসো খাবে?’

তিনি বললেন, ‘খানা খেয়েই তবে এসেছি।’

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) বললেন, ‘বড্ড লোভ-লালসার কথা যে, মানুষ যখন খানা খেয়ে ফেলে তখন এতটুকু অবকাশ রাখে না যে, অন্য কেউ খানা খাওয়াতে চাইলেও তার আবেদন কবুল করবে। আর এভাবে খাওয়া তো খুবই খারাপ কথা।’

তিনি উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাই তৎক্ষণাৎ বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি এমনটাই করেছি। আমি পেটভরে খাইনি, যে পেটে খালি জায়গা নেই। বরং পেটে যথেষ্ট জায়গা খালি আছে।'

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) বলেন, 'তুমি যে জায়গা ফাঁকা রেখেছ তা এমন কোন লোকের জন্য রেখেছো, যার আবদার রাখা আমীরুল মুমিনীনের আবদার রক্ষার তুলনায় অধিক জরুরী? অর্থাৎ, আমি তোমাকে যখন খানার আবেদন করেছি– তুমি অস্বীকার করেছ। এক্ষণে এই যে, 'পেট খালি আছে' বলছ– তা কার জন্য? এভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) তাঁকে আটকে দিলেন।

আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন, 'আমি জায়গা ঐ ব্যক্তির জন্য ফাঁক রেখেছি, যিনি আমীরুল মুমিনীনের মত ওজর কবুল করবেন না। বরং মাফও করবে না। মর্ম হলো, আপনি তা মাফ করে দেন এবং ওজরও কবুল করবেন। কিন্তু কিছু মানুষ এমন জেদী হয় যে, তারা ওজর কবুল করেন না। তাদের জন্য আমার এই পেট খালী রাখা। আপনার কারণে নয়।

সারকথা

মোটকথা, মানুষ কোন কোন সময় অপরকে এজন্য ভয় পায় যে, যদি সে জেনে ফেলে তাহলে আমাকে ক্ষমা করবে না। চাই দ্বিতীয় লোকটি প্রথম লোকের তুলনায় যতই বড় হোক না কেন। সে তাকে এজন্য ভয় পায় না যে, যদি সে জেনে ফেলে তাহলে মাফ চেয়ে নেব। তার সামনে কড়জোর নিবেদন করব এবং সে আমাকে মাফ করে দেবে। এর মানে এই নয় যে, যাকে ভয় পাওয়া হচ্ছে সে দ্বিতীয়জনের তুলনায় বড়। আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে তাঁর ভয়, ডর ও আশা ভরে দিন। উভয়টির মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চুরানব্বইতম মজলিস

আমলের পার্থিব ফলাফল

আমলের পার্থিব ফলাফল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

একটি বাণীতে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেন–

> "নেক আমলের মধ্যে নগদ উপকার রয়েছে– শুধু বাকী নয়। হ্যাঁ একটি বিষয়ই বাকী থাকে তাহলো, সওয়াব (প্রতিদান) এবং এর সাথে আরেকটি নগদ জিনিসও আছে। তা হলো, আশা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক। নেক আমল ছাড়া যা লাভ হতে পারে না। এমনিভাবে বদ আমলেরও একটি বিষয় বাকী থাকে, আরেকটি থাকে নগদ। বাকী বিষয়টি হলো জাহান্নামের আযাব। আর নগদ হলো, ভয়, ভীতি, অন্ধকার ও উদ্বিগ্নতা, যা গোনাহের অবশ্যম্ভাবী ফল।" (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ২০৫)

আমলের ফল নগদ-বাকী উভয় প্রকারই হয়ে থাকে

এই বাণীর উদ্দেশ্য একটি ভুল বুঝাবুঝির অবসান। তাহলো, সাধারণত: মানুষেরা মনে করে, আমরা দুনিয়াতে যে আমল করি– চাই তা নেক আমল হোক কিংবা বদ আমল হোক; এর ফলাফল ও প্রতিদান, লাভ-ক্ষতি সবই আখেরাতে প্রকাশ পাবে। যদি আমল ভাল হয় সওয়াব পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ। যদি আমল খারাপ হয় তাহলে আখেরাতে আযাব দেওয়া হবে। মোটকথা, যা কিছু হোক সওয়াব-আযাবের ব্যাপারটি পুরোই বাকী। দুনিয়াতে নগদ কিছু পাওয়া যাবে না। হযরত থানভী (রহ.) এই ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাচ্ছেন। বলছেন, আমলের সব ফলাফল এবং এর লাভ-ক্ষতি বাকী নয়, বরং কিছু বাকী কিছু নগদ। যা দুনিয়াতেই পাওয়া যাবে।

নেক আমলের প্রথম নগদ ফায়েদা

নগদ ফায়েদা কী? তিনি বলেন, নেক আমলের প্রথম ফল এই যে, নেক আমলের পরে মানুষের মনে এই আশা জাগে যে, খুব সম্ভব আল্লাহ পাক এই আমলের বদৌলতে স্বীয় ফযল ও করমে একে তাঁর দরবারে কবুল করে আমাকে ধন্য করেছেন। এর নাম 'আশা'। এটি নেক আমলের প্রথম ফায়েদা। নগদ ফায়েদা যা মানুষ অর্জন করে।

নিজের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত : আত্মশ্লাঘা

এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যে নেক আমলের তাওফীক দিয়েছেন। মানুষের দৃষ্টি যদি সে দিকে যায় এবং সে ভাবে যে, আমার দ্বারা বড় একটি ভাল কাজ হয়েছে, এর দ্বারা মানুষ আত্মশ্লাঘায় (عجب) নিপতিত হবে। কিংবা মনে করে যে, আমার এই নেক আমল আমাকে নাজাত দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে– সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় একে আত্মশ্লাঘা এবং খোদপসন্দি বা আত্মতুষ্টি বলে। যেমন এক লোক নামায পড়ে মনে করলো যে, আমি খুব ভাল নামায পড়েছি। যেহেতু ভাল নামায পড়েছি সেহেতু কাজটা ভাল করেছি। এই নামাযই আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই ভাবনাটি খুবই মারাত্মক। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমলের নগদ ফল এই যে, আমল দ্বারা 'আশা' সৃষ্টি হয়। অপর দিকে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, নিজের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে 'আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত হওয়া নাজায়েয। কারো মতে–

ہزار نکتہ باریک تر ز مو ایں جاست

نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند

"এ বড় মারাত্মক ও ভয়াবহ উপত্যকা, যা মানুষকে অতিক্রম করতে হয়।"

'আত্মশ্লাঘা' ও 'আশা'-এর মধ্যে পার্থক্য

এক্ষণে প্রশ্ন হলো, দুটির মাঝে পার্থক্য কীভাবে করা যাবে? এই চিন্তা-ভাবনা কী আত্মশ্লাঘার পর্যায়ভুক্ত, নাকি 'আশা' এর পর্যায়ভুক্ত? উভয়ের মাঝে পার্থক্য এভাবে করা যাবে যে, কোনো আমলের পরে মানব প্রকৃতিতে যদি হাসি-আনন্দ ও প্রফুল্লতা পয়দা হয় এবং প্রফুল্লতার পরিণতিতে শোকর আদায়পূর্বক বলা হয়, আলহামদু লিল্লাহ নেক আমলের তাওফীক হয়েছে এবং 'আশা'ও জাগে যে, আল্লাহ পাক যখন আমলের তাওফীক এনায়েতই করেছেন, তখন তিনি তাঁর ফযল ও করমে আমাকে সিক্ত করবেনই– এর নাম 'আশা'। একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

সূচিপত্র

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَائَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

"তোমার নেক আমল যখন তোমাকে খুশি করে এবং বদ আমল ব্যথিত ও বিমর্ষ করে তখন এটি তোমার ঈমানের প্রতীক।"

জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করেন, অনেক সময় কোন নেক আমল করি এবং এই আমল আমাকে আনন্দ দেয় যে, আলহামদু লিল্লাহ একটি নেক কাজ করেছি, এটি আত্মশ্লাঘা বা অহংকার নয় তো? জবাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

অর্থাৎ, নেক আমল করে তোমার যে খুশি হাসিল হয়েছে এটি মুমিনের জন্য নগদ সুসংবাদ। সুতরাং এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

জান্নাত প্রাপ্তি করুণায়, আমলে নয়

সুফিয়ায়ে কেরাম যে আত্মশ্লাঘার কথা বলেন তা হলো, মানুষের নেক আমল শেষে যখন এই রকম আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয় যে, এমন ভাল কাজ করেছি যে, এটি অবশ্যই আমাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। আর আমার জান্নাতে যাওয়াটা আল্লাহ তাআলার করুণার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং আমার আমলই আমাকে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য করে তুলবে। এই ধারণা খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ। আরে বাবা! যোগ্যতা বলে কোন বিষয়ই নেই। আপনি যত বড় আমলই করেন না কেন তা কোনদিনও আপনাকে জান্নাতে পৌঁছাবে না। কেননা নিয়ামত অশেষ। এর মোকাবেলায় আপনার আমল কী? আপনি এক মিনিট বা পাঁচ মিনিটে এক/দুইটি আমল করলেন পরে বলতে শুরু করলেন, ঐ আমলের বদলে আমাকে জান্নাত দেওয়া চাই। জান্নাত এক অনি:শেষ ব্যাপার। এর নিয়ামত চিরন্তন। এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। চার রাকাতের বিনিময়ে এটি চাচ্ছেন? অতএব আমল যতই বেশি হোক না কেন তা জান্নাতের যোগ্য নয়। ধরুন! আপনি ৮০ বছর ইবাদত করেছেন, সারা জীবনই সিজদায় কাটিয়েছেন। এর দ্বারা এতটুকু হয়েছে যে, ৮০ বছরের পুরোটাই আপনার ইবাদত-সর্বস্ব। আর ওদিকে জান্নাতের নিয়ামত? একশ' বছরের, হাজার বছরের, লাখ বছরের? না এর কোনটিই না। চিরন্তন ও অনন্ত কালের। সুতরাং মানুষ সারা জীবন ইবাদত করলেও তা জান্নাতযোগ্য নয়। এটি নিশ্চয় তাঁর করুণা। কোন কোন সময় তিনি বলে দেন, হে বান্দা! তুমি এই আমল করেছ যদ্দরুণ তোমাকে আমি এই জান্নাতের যোগ্য করে দিয়েছি। কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত এই যোগ্যতার

প্রতি ইশারা করেছে। তবে সেই ইশারাও তাঁর করুণা মাত্র। নতুবা আমলের মধ্যে এই যোগ্যতা নাই যে, তাকে জান্নাতের যোগ্য করে তোলে। গোটা জীবন রোযায় শেষ করলে, ইবাদত, যিকির-আযকারে শেষ করলেও নয়।

হুযূর (সা.)-এর আমল ও জান্নাত

এজন্য হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মানুষের কোন আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আপনার আমলও কি আপনাকে জান্নাতে নিতে পারবে না? তিনি জবাবে বলেন–

لَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ

'না। আমার আমলও আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমতে ঢেকে না নিবেন। এক্ষণে দেখুন! সারা জাহানে কারো আমলই সংখ্যাগত ও গুণগত দৃষ্টিকোণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবর তো দূরের কথা তার ধারে কাছেরও হবে না অথচ তিনি বলছেন, আল্লাহর করুণা আমাকে ঢেকে না নিলে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমল দ্বারা জান্নাতের যোগ্য হওয়া যায় না।

নেক আমল করুণার প্রতীক

অবশ্য আল্লাহ পাক নেক আমলকে করুণা ও দয়ার প্রতীক সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, যদি কেউ নেক আমল করে তাহলে সে আল্লাহর করুণা ও দয়ার যোগ্য হবে এবং সেই নেক আমল করার পর খুশির কথা এই যে, যখন আল্লাহ আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দিয়েছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমার ভেতরে সেই আলামত পাওয়া গেছে। এর দ্বারা এও বুঝা গেল, আল্লাহ পাকের দয়া ও করুণা আমার অর্জন হয়েছে। সুতরাং এ আনন্দ, আলামত প্রাপ্তির আনন্দ। এ আনন্দ এজন্য নয় যে, একখান বিরাট কাজ করেছি, যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছাচ্ছে। এ সূক্ষ্ম কথাটি মাথায় রাখতে হবে।

আমল দ্বারা জান্নাতের যোগ্য হয় না

আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধান এই যে, যখন কোন বান্দা নেক আমল করে তখন তিনি ধন্য করেন। তাকে করুণা ও দয়ার পাত্র করেন। আমল ছাড়া সাধারণত দয়া ও করুণা আসে না। এক্ষণে যদি কেউ এই ভাবে যে, আমার আমল যখন আমাকে জান্নাতে পৌঁছাবে না। তাহলে আমল করে কী লাভ? কারণ আমল দ্বারা জান্নাতের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। ব্যাস! আল্লাহর কাছে বসে বসে

কেবল চাইতেই থাকো। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার দয়া ও করুণার যোগ্য বানাও। মনে রাখতে হবে যে, তাঁর করুণার যোগ্যতা ও জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের তার শাশ্বত নিয়ম হলো যখন কোন ব্যক্তি আমল করবে তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি করুণা করবেন। সুতরাং আমল জরুরী কিন্তু জান্নাতপ্রাপ্তির পূর্ণ উপকরণও নয় এবং জান্নাতযোগ্য হওয়ারও পূর্ণ উপকরণ নয়। বরং আমল আল্লাহর করুণা একটি চিহ্নমাত্র।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বেশ প্রজ্ঞা ও হেকমতপূর্ণ কথা বলেছেন, 'যে লোক আমল করে এবং এই আমলের উপর ভিত্তি করে আশা করে যে, এই আমল তাকে জান্নাতে নিবেই। তাহলে লোকটা খামাখা এই মেহনত করছে। পক্ষান্তরে যে লোক এই আশা করে যে, আমি আমল ছাড়াই জান্নাতে যাব তাহলে সে আত্মপ্রবঞ্চিত হচ্ছে। দুটি চিন্তাই ভুল। কেননা কেউই আমল ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে না। অপর দিকে শুধু আমলই তাকে জান্নাতে নেবে না। যতক্ষণ না আমলের সাথে আল্লাহর ফযল ও করমের পাশাপাশি তাঁর রহমত শামিল না হবে। সুতরাং আমলও করতে হবে এবং আমলের পাশাপাশি একে নাজাতের উসিলাও মনে করতে হবে। তবে এই আমলকে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার কারণ মনে করা উচিত নয়। সুতরাং যখন নেক আমলের তাওফীক হবে তখন এর ওপর আল্লাহর শোকর আদায় করুন। বলুন, হে আল্লাহ! আপনার কৃপা ও দয়ার দ্বারা আপনি আমাকে এই আমল করার শক্তি দান করেছেন এবং আশা করুন! নেক আমলের তাওফীক যখন দান করেছেন তাহলে আমাকে তিনি সম্মানিতও করবেন। যদি সম্মানিত করার ব্যাপারটি না থাকত তাহলে নেক কাজের তাওফীকই দিতেন না।

নেক আমলের তাওফীক তাঁর পক্ষ থেকে জবাব

মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন, কখনো মানুষের মনে এমন খেয়াল পয়দা হয় যে, আমি আল্লাহ তাআলাকে এত ডাকি, কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে সেই ডাকের কোন সাড়া আসে না। জবাব এলে আমরা আরো ডাকতাম। কিন্তু কখনোই তো কোন জবাব আসে না। ব্যাপারটি একতরফা হয়ে গেল না? এই নির্বুদ্ধিতামূলক খেয়াল কখনো চিন্তার জগতে চেপে বসে। মাওলানা রুমী (রহ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছেন :

گفت اے اللہ تو لبیک ماست

অর্থাৎ, আমার নাম নেয়ার যে তাওফীক তোমাদের হয়েছে, এটিই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য জবাব। তুমি যখন আমার নাম একবার নাও এরপর দ্বিতীয় বার আমার নাম নেয়ার যে শক্তি তোমার হয়– এটিই আমার পক্ষ থেকে জবাবতুল্য এবং লাব্বাইক (ডাকে সাড়া দান)। এই জবাব না হলে দ্বিতীয় বার আমার নাম নেয়ার শক্তি তোমার হত না। তোমার আল্লাহ বলাই আমার পক্ষ থেকে লাব্বাইক বলা। আর তোমার 'যিকির'ই গ্রহণযোগ্যতার প্রতীক।

একটি নেক আমলের পর দ্বিতীয় নেক আমলের তাওফীক

এজন্য হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলতেন, একটি নেক আমল করার পর যখন ঐ নেক আমলই দ্বিতীয় বার করার তাওফীক হয়েছে, তখন বুঝে নাও যে, পয়লা আমল কবুল হয়েছে। যদি পয়লা আমলটি কবুল না হত তাহলে দ্বিতীয়বার ঐ আমলটির তাওফীক হত না। যেমন আপনি যোহরের নামায পড়েছেন, পরে আসরের নামায পড়ার তাওফীক হয়েছে– এতে বুঝে নিন, আপনার যোহরের নামায কবুল হয়েছে। যদি যোহরের নামায কবুল না হত তাহলে আপনি আসরের নামায পড়ার তাওফীক পেতেন না। গতকাল আপনি রোযা রেখেছেন– আজ আবারও রেখেছেন। এতে বুঝে নিন আপনার গতকালের রোযাটি কবুল হয়েছে। যদি গতকালের রোযাটি কবুল না হত তাহলে আজ রোযা রাখার তাওফীক হত না। মোটকথা, মানুষ আমল করতে থাকবে। আমল করা ছাড়বে না। আমল করে এই কথা মনে করে সন্তুষ্ট হবে যে, আমার একটি নেক আমল করার তাওফীক হয়েছে। তাওফীক যখন হয়েছে তখন এর মধ্যে আল্লাহ পাকের আমাকে সম্মানিত করার ইচ্ছাও নিহিত আছে। এর চেয়ে আগে বেড়ো না। মনে করোনা যে, আমার দ্বারা বড় একটি কাজ হয়ে গেছে। আমি মোক্ষম তীর মেরেছি। জান্নাতের যোগ্য হয়েছি। কেননা এমনটি ভাবা 'আত্মশ্লাঘা' ও 'আত্মতৃপ্তি' বা 'আত্মম্ভরিতা'র নামান্তর। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে এ থেকে হেফাযত করুন। মোটকথা, নেক আমলের একটি নগদ ফায়দা এই যে, আল্লাহ তাআলার থেকে 'আশা'র আস্থা রাখা যায়।

নেক আমলের দ্বিতীয় নগদ ফায়দা

নেক আমলের দ্বিতীয় নগদ ফায়দা এই যে, 'আল্লাহর সাথে সম্পর্ক' সৃষ্টি হয়। আপনি যে নেক আমলটি করবেন তাতে আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক কায়েম হবে এবং আল্লাহ তাআলার মহব্বত বাড়বে। সকল সফলতার মূলে রয়েছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হওয়া। যেমন: আপনি ফজরের নামায পড়লেন। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক কায়েম হয়ে গেল। পরে যোহরের নামায পড়লেন। এতে সম্পর্কটিতে প্রবৃদ্ধি এল। পরে আসরের নামায পড়লেন,

পড়লেন মাগরিব ও ইশার নামায– প্রতি বারেই আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কটি বেড়েই চলছে। মানুষের ব্যাপারটি এমন যে, যদি একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে তো একটা সীমা পর্যন্ত সম্পর্কটি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু একটা সীমায় গিয়ে এই সাক্ষাতের প্রতি সে বিরাগভাজন হয় এবং মনে করে যে, এ লোক তো সর্বদা সম্মুখেই থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে বকুনি দেবে যে, তোমার জ্বালাতন আর সইতে পারছি না। সুতরাং অধিক সাক্ষাৎ বিরক্তের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে বিরাগভাজন হতে হয়। মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। এজন্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا

দেরীতে সাক্ষাৎ কর, বন্ধুত্ব গাঢ় হবে।

তুমিই বিরক্ত হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলার ব্যাপার এই যে, তাঁর সাথে যত সাক্ষাৎ করা হবে ততটা সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوا

তোমাদের বার বার মুলাকাতে আল্লাহ পাক বিরক্তবোধ করেন না। যতক্ষণ না তোমরাই বিরক্ত হয়ে পড়। সুতরাং যত ইবাদত করতে চাও করো। যত পার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়। এই সম্পর্ক বেড়ে চলবে। এতে বিরক্তের ব্যাপারটি আসবে না। সুতরাং প্রতিটি নেক আমল দ্বারা সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়। আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যত বাড়বে তত বেশি আনন্দ ও প্রফুল্লতা আসবে। তত বেশি প্রশান্তি হাসিল হবে এবং সেই পরিমাণে গোনাহ থেকে বাঁচার সুযোগ ও শক্তি পয়দা হবে। ততটাই শয়তানের হামলা থেকে হেফাযতে থাকা যাবে। নফস ও শয়তান ঠিক তখনই হামলা করে যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কে ঘাটতি দেখা দেয়। এ সময় নফস পদস্খলিত করে, পদস্খলিত করে শয়তানও। কিন্তু যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুতভাবে কায়েম হয়ে যায় তখন শয়তান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হামলাপ্রবণ হতে পারে না। সুতরাং প্রতিটি নেক আমলের দ্বিতীয় নগদ ফায়দা এই যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কে প্রবৃদ্ধি আসে।

নেক আমলের তৃতীয় নগদ ফায়দা

তৃতীয় নগদ ফায়দা হযরত থানভী (রহ.) এখানে উল্লেখ করেননি, কিন্তু অপর এক স্থানে এর উল্লেখ করেছেন। খোদ কুরআনুল কারীমে এর উল্লেখ আছে। এই নেক আমল দ্বারা মানুষের মনে প্রশান্তি আসে।

সূচিপত্র

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ, আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি অর্জন হয়। আর প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা এমন এক সম্পদ, যা লাখো কোটি টাকা খরচ করলেও হাসিল হয় না। কোন মার্কেটে এটি বিক্রি হয় না। অবশ্য নেক আমলের বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা আনয়ন করে। প্রশান্তি এমন এক সম্পদ যে, দুনিয়ায় এর মত আর কোন সম্পদ নাই। এক লোকের কাছে মাল-দৌলত আছে, কুঠি ও বাংলো আছে, চাকর-নকর আছে, কিন্তু অন্তরে প্রশান্তি নেই, তার এসব দৌলত বেকার। পক্ষান্তরে অপর এক লোকের মাটির ঘর, ঝুপড়ি ঘর এর পাশাপাশি অন্তরে প্রশান্তি আছে, তো এই লোক পূর্বের লোকের চেয়ে অনেক উত্তম। মোটকথা, আল্লাহ পাক তাঁর যিকিরের মধ্যে শান্তি ও তৃপ্তির বৈশিষ্ট্য রেখেছেন এটা নেক আমলে নগদ ফায়দা, যা এই দুনিয়াতেই অর্জিত হয়।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর কথা

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, যদি দুনিয়ার বাদশাহদের কাছে এই খবর আসে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কি পরিমাণ স্বাদ ও প্রশান্তিময় জীবন দান করেছেন তাহলে তারা খোলা তরবারী নিয়ে আমাদের সম্পদ ছিনতাই করতে ছুটে আসবে। বলবে, আমাদের ওটা দিয়ে দাও। কিন্তু এই বেকুফেরা জানে না যে, এই সম্পদ তলোয়ার দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং এ সম্পদ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে হাসিল হয়। এটি তাঁর সাথে সম্পর্ক অর্জন করার দ্বারা হয়। এই প্রশান্তি অর্জন নেক আমলের নগদ ফায়দা। যা দুনিয়াতেই অর্জিত হয়।

নেক আমলের চতুর্থ ফায়দা

নেক আমলের চতুর্থ ফায়দা এই যে, একটি নেক আমল আরেকটি নেক আমলের মাধ্যম হয়। আপনি একটি নেক আমল করলে আরেকটি নেক আমল করার সুযোগ পাবেন। গোনাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, একটি গোনাহ আরেকটি গোনাহকে টানে। এমনিভাবে আপনি একটি নেক আমল করলে আরেকটি নেক আমলের তাওফীক হয়ে যাবে। মোটকথা, নেক আমল দ্বারা চারটি নগদ ফায়দা হয়। যা এই দুনিয়াতেই পাওয়া যাবে।

গোনাহের প্রথম ক্ষতি

এমনিভাবে তিনি বলেন, বদ আমলেরও একটি ফল বাকী আরেকটি নগদ। অর্থাৎ, গোনাহের একটি ফল হলো বাকী, যা আখেরাতে পাওয়া যাবে– তা হল

জাহান্নামের আযাব। আল্লাহ তাআলা সকলকে এর থেকে হেফাযত করুন। আমীন। আর গোনাহের নগদ ফল, ভয়, অন্ধকার ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা– যা গোনাহের জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ, গোনাহের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অন্ধকার আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছেন। কারো যদি রুচি, অনুভূতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার খবর থাকে না যে, এটি এক ধরণের অন্ধকার ও উৎকণ্ঠার বিষয়, উল্টো সে একে মজাদার মনে করে। কিন্তু বাস্তবে এটি অন্ধকার ও উৎকণ্ঠা মাত্র। এর ফলাফল অবশ্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

গোনাহের স্বাদের উপমা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, গোনাহর স্বাদের একটি উপমা এই যে, গোনাহের স্বাদ এমন যে, কারো খুঁজলি-চুলকানি হল, সে চুলকানিতে মজা পায়। সে লোকদের বলল, দুনিয়াতে দুটি জিনিসের মধ্যে মজা আছে– প্রথমত: চুলকানিতে, দ্বিতীয়ত: রাজনীতিতে। অর্থাৎ, চুলকানির মজা এবং রাজনীতি করার মজা। চুলকানিতে এত মজা যে, একে রাজনীতির মজার সাথে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। সত্যিই চুলকানি হলে চুলকাতে যে মজা লাগে তার সাথে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। তুলনা হয় না। এ থেকে বাঁচাও মুশকিল। কিন্তু যখন চুলকানি ছেড়ে দিবেন, তখন দেখবেন মরিচের গুড়া পড়ার মত জ্বলছে। চর্মরোগটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার চুলকালে দেখবেন পুরানো মজাটা ফিরে এসেছে। এভাবে চুলকানির দ্বারা অসুখ ক্রমশ: বেড়েই চলে। গোনাহের ব্যাপারটি ঠিক এমন। গোনাহ করতে স্বাদ লাগে। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত টেনশন, অন্ধকার ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রূপ নেয়।

রুচি বিকৃত হয়ে গেলে

কারো যদি রুচি বিগড়ে যায় তো গোনাহের পরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অন্ধকার অনুভূত হয় না। যেমন: কারো যদি দুর্গন্ধ অনুভূতিই খতম হয়ে যায় তখন দুর্গন্ধের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতেই সে মজা পায়। আমি দেখেছি, একবার বৃহৎ একটি ময়লাস্তুপ থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। সেখানে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। কাছে যাওয়া রীতিমত মুশকিল। কিন্তু এক পাগল ছিল। সে ওই স্তুপের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল। একটি কুকুর একটি থলে ওঠাল। পাগল কুকুর থেকে থলেটি কেড়ে নিল। সে বিজয়ীর হাসি হাসল। ভাবল, আমি সফল। ঐ অবস্থায় অট্টহাসি দিল। তার কাছে কোন দুর্গন্ধের অনুভূতি নেই। কেন? কেননা তার অনুভূতি শক্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য মুর্দা, লাশ, দুর্গন্ধকে সে সম্পদ মনে করছে।

যখন তাকওয়ার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়

এভাবে যখন মানুষের মাঝে ঈমান ও তাকওয়ার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়, তখন রুচি বিকৃতি ঘটে। তখন মানুষ গোনাহ করে মজা পায়। পরে সে গোনাহের মাঝে না অন্ধকার অনুভব করে, আর না ভয়-ভীতি। আল্লাহ হেফাযত করুন এটি খুব ভয়াবহ অবস্থা। এজন্য যে, গোনাহের মধ্যে অন্ধকার ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা রয়েছে। রয়েছে ভয়। সুতরাং গোনাহের নগদ ফল এই যে, গোনাহ করার পর অন্তরে প্রশান্তি আসে না। সুতরাং ঐ লোকদের দেখুন! যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, ইজ্জত-খ্যাতি ও বিলাস-ব্যসন অর্জন করেছে– এরপরও তারা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু কেন? যদি পয়সা না থাকার দরুণ আত্মহত্যা করত তাহলে ভিন্ন কথা। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করছে। এজন্য যে, মনে শান্তি নেই।

গোনাহের দ্বিতীয় নগদ ক্ষতি

গোনাহের দ্বিতীয় নগদ লোকসান এই যে, গোনাহ জ্ঞান-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। গোনাহ ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল করে উপস্থাপন করে। এটিও এক ধরণের অন্ধকার। এটিও গোনাহের নগদ লোকসান। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকে গোনাহের লোকসান থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর নির্বাচিত
এগারখানা কিতাবের সমষ্টি
ইসলাহী নেসাব
মুমতায লাইব্রেরী
মুমতায লাইব্রেরী
মাকতাবাতুল আশরাফ-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০